কর্নেল সমগ্র

৭

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

CORNEL SAMAGRA 7
A Collection of Detective Stories & Novels
By Sayed Mustafa Siraj
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৮, বৈশাখ ১৪০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : ১০০ টাকা

ISBN-81-7612-200-4

কর্নেলের গুণমুগ্ধ পাঠকদের
করকমলে—

সূচি

পাতাল গুহার বুদ্ধমূর্তি ... ২০৩৭

প্লাবন ... ২০৮১

বেড়ালের চোখ ... ২১৯৫

মৃতেরা কথা বলে না ... ২২০৬

এই লেখকের অন্যান্য বই

অলীক মানুষ
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
শ্রেষ্ঠগল্প
বেদবতী
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
বসন্ত তৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
হাওয়াসাপ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
কালো বাক্সের রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
ভয়ভুতুড়ে
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
রহস্য-রোমাঞ্চ
হাট্টিম রহস্য
ডমরুডিহির ভূত
জিরো জিরো নাইন
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোডসাহেব ও পুনর্বাসন
ইন্সপেক্টর ব্রহ্ম

কর্নেল সমগ্র ৭

পাতাল গুহার বুদ্ধমূর্তি

কর্নেলের জার্নাল থেকে

হোটেল দ্য লেক ভিউ-এর ব্যালকনি থেকে বাইনোকুলারে সেই সেক্রেটারি বার্ডটিকে খুঁজছিলাম। সারস জাতীয় এই দুর্লভ পাখিকে বাংলায় বলা হয় কেরানি পাখি। কারণ, সহসা দেখলে মনে হয়, তার কানে যেন কলম গোঁজা আছে।

কাল বিকেলে হ্রদের তীর থেকে পাখিটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম। বিস্তীর্ণ এই প্রাকৃতিক জলাশয়ের মধ্যিখানে একটা জলটুঙ্গি আছে। সেখানে ঘন জঙ্গল। পাখিটা একলা, নাকি তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী আছে জানি না। তবে সে অতিশয় ধূর্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন একটা দুর্গম জঙ্গলে সে তার ডেরা বেছে নিয়েছে।

এই হ্রদের নাম বৃটিশ আমলে ছিল 'মুন লেক'। পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছে 'চন্দ্র সরোবর'। আসলে এটি প্রাগৈতিহাসিককালের মৃত এক আগ্নেয়গিরির বিশাল ক্রেটার। চারদিকে ঘেরা উঁচু-নিচু পাহাড়। পর্যটন মন্ত্রকের তদারকে সম্প্রতি উত্তর এবং পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে অনেক বাংলো, কটেজ, হোটেল, দোকানপাট—এমন কি একটি টাউনশিপও গড়ে উঠেছে। তবে সেই টাউনশিপটি ধনবানদের। অধিকাংশ সময় সেখানকার সুরম্য বাড়িগুলি খাঁ-খাঁ করে।

'লেক ভিউ' হোটেল হ্রদের পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে এবং তীর থেকে তার উচ্চতা অন্তত ষাট ফুট। এখান থেকে হ্রদের তীরে নেমে যাওয়ার জন্য একটি ঘোরালো এবং ঢালু পায়েচলা পথ আছে। বয়স্করা সে পথে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নেন না। উঠে আসার প্রশ্ন তো তোলাই যায় না। তবে আমার কথা আলাদা। আমার অতীত সামরিক জীবনের সব শিক্ষা এই এই বৃদ্ধ বয়সে চমৎকার কাজে লাগছে। দেখে নিজেই বিস্মিত হই।

তো বয়স্কদের জন্য পায়ে হেঁটে বা গাড়ি চেপে চন্দ্র সরোবরের বেলাভূমিতে যাওয়ার পথটি আছে এই হোটেলের পূর্ব দিকে। ওই দিকটায় পাহাড় অতি ধীরে ঢালু হতে হতে সমতলে নেমে গেছে। বাঁক নিতে নিতে সেই পথ তাই পশ্চিমে হ্রদসীমান্তে পৌঁছেছে।

যে কাহিনীটি এখানে বলতে বসেছি, তা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই পটভূমি ও পরিবেশের চিত্রটি ঈষৎ বিস্তৃতভাবে আঁকার প্রয়োজন হল। আর একটা কথা।

নিজের সামরিক জীবনের স্মৃতির খাতিরেই চন্দ্র সরোবরের বদলে 'মুন লেক' নামটি আমার পছন্দ। আমার তরুণ বয়সে এই দুর্গম পার্বত্যহ্রদের তীরে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল এবং সেই ঘাঁটিতে আমি কিছুদিন ছিলাম। শরৎকালের শুক্লপক্ষের রাতে যে বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে দেখেছিলাম, তা অবিস্মরণীয়। তৎকালেই বুঝেছিলাম এই হ্রদের নাম কেন 'মুন লেক' দেওয়া হয়েছে।

মুন লেকের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডের খবর সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে বেরিয়েছিল। খবরটি পড়ে এখানে চলে এসেছি। নভেম্বরে পর্যটন মরশুম শুরু। হঠাৎ করে চলে আসার জন্য অগত্যা এই দোতলা হোটেলে উঠতে হয়েছে। নতুবা সরকারি বাংলো বা কটেজই আমার পছন্দ। সেখানে ভিড় ভাট্টা কম হয়।

ভোরে কুয়াশা ছিল। মুন লেকের তীরে সাড়ে আটটা অব্দি ঘোরাঘুরি করে পাখিটাকে দেখা এবং ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে তার ছবি তোলার আশা ছেড়ে দিয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম। তারপর দোতলার ব্যালকনিতে বসে কফি খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলাম, কুয়াশা সরে গিয়ে রোদ ছড়িয়েছে। তাই বাইনোকুলারে জলটুঙ্গিটা দেখছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে বোকা বানিয়ে পাখটা জলটুঙ্গির জঙ্গল থেকে সহসা উড়ে গেল। তার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে একটু চমকে উঠলাম। মুন লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি ঝুলে থাকা একটা চাতালের প্রায় শেষপ্রান্তে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে এবং এক যুবক ক্যামেরায় তার ছবি তোলার জন্য তাকে আরও পিছনে হটে যেতে ইশারা করছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম, আর এক পা পিছিয়ে গেলেই যুবতীটি নীচের গভীর খাদে পড়ে প্রাণ হারাবে। একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে চলেছে। অথচ এত দূর থেকে আমার কিছু করার নেই। ওরা এত নির্বোধ কেন বুঝি না।

সহসা যুবতীটি পিছু ফিরে দেখেই দ্রুত সরে গেল। আমার আশঙ্কার অবসান ঘটল। এবার দেখলাম, যুবতীটি হাত নেড়ে তার সঙ্গীকে কিছু বলতে বলতে চাতালের পেছনের ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করেছে। বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তার মুখে রাগের আভাস। যুবকটি অবশ্য হাসতে হাসতে তাকে অনুসরণ করছিল। পাথরের ধাপগুলির নীচে পাহাড়টা ক্রমে ঢালু হয়ে সমতলে নেমেছে। ঢালু অংশটা ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে হ্রদের তীরে তাদের আবার দেখতে পেলাম। এতক্ষণে তাদের চিনতে পারলাম। এই হোটেলেই কাল রাতে তাদের দেখেছি। নববিবাহিত বাঙালি দম্পতি বলেই মনে হয়েছিল তাদের। সম্ভবত বিয়ের পর হনিমুনে এসেছে।

boiRboi.blogspot.com

কিন্তু যে দৃশ্যটা একটু আগে দেখলাম, তা নিছক নির্বুদ্ধিতা, নাকি অন্য কিছু, এই খটকাটা আমার মনে থেকে গেল।

দশটায় নীচের ডাইনিং হলে নেমে গেলাম। মুন লেকের দিকের টেবিলগুলি ততক্ষণে আর খালি নেই। অগত্যা কোণের দিকে একটা খালি টেবিলে বসলাম। তারপর ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ডাইনিং হলের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। আসলে আমি সেই দম্পতিকে খুঁজছিলাম।

একটু পরে দেখি, আমার উল্টো দিকে তিনটে টেবিলের পর জানালার ধারে ওরা বসে আছে। যুবতীর মুখে এখন অনুচিত ধরনের একটা গাম্ভীর্য। সে চুপচাপ খাচ্ছে। যুবকটি চাপা গলায় কথা বলে সম্ভবত তার মানভঞ্জনের চেষ্টা করছে। যুবকটির চেহারা অবশ্য তত স্মার্ট নয়। একটু বোকা বোকা ছাপ আছে। যদিও চুলের কেতা আর পোশাকে সে প্রচণ্ডভাবে একালীন।

ব্রেকফাস্টের পর কফির পেয়ালায় সবে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় যুবকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর তার সঙ্গিনীকে কিছু বলে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে গেল। এখান থেকে হোটেলের লাউঞ্জ চোখে পড়ে। তাকে লাউঞ্জ পেরিয়ে যেতে দেখে বুঝলাম, সে বাইরে কোথাও চলে গেল।

যুবতীটি ঘড়ি দেখে নিয়ে জানালার দিকে মুখ ঘোরাল। তার হাতে চায়ের কাপ। খুব দেরি করে সে কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ডাইনিং হল ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রকৃতি প্রেমিকরাই এখানে পর্যটনে আসে। নভেম্বরের পাহাড়ি শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে এখন রোদের উষ্ণতা দরকার। তাই এখন মুন লেকের তীরে ভিড় হওয়ার কথা। আমিও শিগগির বেরিয়ে পড়তে চাইছিলাম। সেক্রেটারি বার্ডটি যদি দৈবাৎ ফিরে আসে, আকাশপথে তাকে ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ পেতেও পারি।

কিন্তু মনে খটকা থেকে গেছে। তাই কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে সোজা যুবতীটির কাছে চলে গেলাম এবং মুখে উল্লাস ফুটিয়ে বলে উঠলাম, হাই ডার্লিং! তুমি এখানে?

যুবতীটি দ্রুত ঘুরে আমার দিকে তাকাল। সে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে সহাস্যে বললাম, ও ডার্লিং। এখনও তুমি ছোটবেলাকার মতোই দুষ্টু মেয়েটি হয়ে আছ। ওঃ! একবছর পরে তোমার সঙ্গে এখানে হঠাৎ এমন করে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাও করিনি। হুঁ—বিয়ে করে ফেলেছ দেখছি। তারপর হনিমুনে আসা হয়েছে, তাই না?

সে বিরক্ত মনে বলল—দেখুন, আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাকে মোটেও চিনি না।

অনুরাধা। তুমি নিশ্চয় বাবা-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছ! তাই—

আমি অনুরাধা নয়। আপনি ভুল করছেন।

ভুল করছি? সে কি! অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, অনুরাধাকে চিনতে ভুল করব আমি—এ তো ভারি অদ্ভুত। বুড়ো হয়েছি। দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় টাক পড়েছে। সবই ঠিক। কিন্তু এখনও আমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। চশমা পরার দরকার হয় না। আমি আমার ভাগনিকে চিনতে ভুল করব? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা। এমনকি কণ্ঠস্বরও এক এ কি করে হয়? না—তুমিই অনুরাধা।

আহ! বলছি আমি অনুরাধা নই।

তাহলে আমারই ভুল। কিন্তু—

আপনি বাঙালি?

বিলক্ষণ। একেবারে ভেতো বাঙালি।

কাল রাতে আপনাকে এখানে দেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি বিদেশি ট্যুরিস্ট।

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ। এই ভুলটা অবশ্য অনেকে করে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, দুটি মেয়ের চেহারা আর কণ্ঠস্বর কিভাবে এক হয়!

আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতায়। বলে পকেট থেকে আমার নেমকার্ডটা বের করে তাকে দিলাম।

সে কার্ডটা পড়ে বলল, আপনি মিলিটারি অফিসার?

ছিলাম। এখন রিটায়ার্ড।

সে কার্ডটাকে আবার চোখ বুলিয়ে উচ্চারণ করল, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট। নেচারিস্ট মানে?

প্রকৃতি প্রেমিক বলতে পারেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ আমার একটা হবি। মুখটা একটু কাঁচুমাচু করে ফের বললাম, আই অ্যাম ভেরি সরি মিসেস—

আমার নাম রাপ্তী সেন। আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন।

বলব। কারণ সত্যিই আমি অবাক হয়েছি। আমার ভাগনির সমবয়সী এবং অবিকল তার মতো দেখতে কোন মেয়েকে আপনি বলতে আমার বাধবে। যাই হোক, অনুরাধা যেমন আমাকে আঙ্কেল বলে ডাকত, তুমিও স্বচ্ছন্দে আঙ্কেল বলতে পারো।

রাপ্তী আমার নেমকার্ড আবার দেখতে দেখতে বলল, এটা আমি রাখতে পারি?

অবশ্যই পারো। তো রাপ্তী, তোমরা নিশ্চয় হনিমুনে এসেছ?

রাপ্তী তার হ্যান্ডব্যাগে কার্ডটা চালান করে দিয়ে আস্তে মাথা দোলাল।

কলকাতা থেকে? নাকি—

bengalidownload.com

কলকাতা থেকে।

হাসতে হাসতে বললাম, আমার এই দ্বিতীয় ভাগনির বরের প্রশংসা করা উচিত। তার রুচি আছে। হনিমুনের উপযুক্ত স্থান সে বেছে নিয়েছে। কারণ এই পাহাড়ি লেকের পুরনো নাম কি জানো? মুন লেক। তো তোমার বর ভদ্রলোককে দেখছি না? আলাপ হলে ভালো লাগত।

ও ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফিরতে একটু দেরি হবে বলে গেল।

তোমরা কত নম্বরে উঠেছ?

দোতলায় ২২ নম্বর স্যুইটে। আপনি?

আমি ১৯ নম্বরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তা তুমি কি ওর জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে? আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্যুইট থেকে মুন লেক সরাসরি চোখে পড়ে। অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে এদিকের করিডর দিয়ে নেমে লেকের ধারে পৌঁছতে পারো। এখন রোদটা আরামদায়ক।

রাপ্তী উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, অচেনা জায়গায় একা ঘুরতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া তমাল ফিরে এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে বেরুবে।

তমাল? বাহ। বেশ সুন্দর নাম। তোমার নামটাও চমৎকার।

রাপ্তী ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে করিডরে গেল। তারপর দোতলার সিঁড়িতে উঠতে থাকল। তাকে অনুসরণ করছি আঁচ করে সে একবার ঘুরে আমার দিকে তাকাল। বললাম, লেকের ধারে বড্ড বেশি ভিড়। আমি আমার সিঙ্গল স্যুইটের ব্যালকনি থেকে মুন লেকের সৌন্দর্য দেখব। সেজন্য এই বাইনোকুলারই যথেষ্ট।

দোতলার করিডরে গিয়ে রাপ্তী একটু দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে হল। কিন্তু বলল না। তাদের স্যুইটের দিকে পা বাড়াল।

একটু কেশে আস্তে ডাকলাম, রাপ্তী।

রাপ্তী পিছু ফিরে বলল, কিছু বলবেন?

আস্তে বললাম, প্রায় এক ঘণ্টা আগে বাইনোকুলারে তোমাদের দেখছিলাম। না—ঠিক তোমাদের দেখছিলাম বললে আবার ভুল হবে। লেকের জলটুঙ্গিতে একটা পাখি দেখছিলাম। পাখিটা হঠাৎ উড়ে গিয়েছিল। তার গতিপথ লক্ষ করার সময় হঠাৎ দেখি, তুমি একটা বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো এবং তমাল তোমার ছবি তোলার চেষ্টা করছে। দৈবাৎ তুমি পেছনে না তাকালে কি ঘটত ভেবে শিউরে উঠেছিলাম।

রাপ্তী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হনহন করে চলে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের স্যুইটে ফিরলাম। যখন ওকে কথাগুলি বলছিলাম, তখন ওর মুখের রেখায় কি একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, স্মরণ করার

চেষ্টা করলাম। আতঙ্ক মিশ্রিত ক্ষোভ, নাকি নিছক ক্ষোভ? অথবা আতঙ্ক এবং বিস্ময়? অবশ্য আমার ভুল হতেও পারে। কিন্তু খটকাটা থেকে গেল।

ব্যালকনিতে এখন জোরালো হিম বাতাসের উপদ্রব। টুপি আঁটো করে পরে অন্য একটা পুরু জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম। বাইনোকুলারে জলটুঙ্গির জঙ্গল খুঁটিয়ে দেখার পর উত্তরে পাহাড়ের গায়ে কটেজ এরিয়া দেখতে থাকলাম। দেখার কোন কারণ যদি থাকে, তাহলে সেটাকে বলব একটা কটেজ না পাওয়ার দুঃখ। কটেজগুলি সত্যিই অসাধারণ। ওই দিকটায় প্রচুর গাছপালা আছে। প্রতি কটেজের সামনে একটা করে ফুলবাগান। তার ফলে ওখানে নানা প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে পাওয়া সম্ভব। মুন লেকের দক্ষিণ তীরে কিছু জঙ্গল আর ঝোপঝাড় আছে। কাল বিকেলে সেখানে একজোড়া প্রজাপতি দেখেছিলাম। সাধারণ নাম 'অ্যাপোলো'। প্রজাতির নাম 'পারনাশিউস অ্যাপেলো'। শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে এদের ডেরা। সেক্রেটারি বার্ডের দিকে মন পড়ে থাকায় ওদের ছবি তোলার চেষ্টা করিনি।

কটেজ এরিয়াটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল দুটি লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন ঝগড়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। বাইনোকুলারের দূরত্বনির্ণায়ক নবটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় আনতেই লেন্সে দু'জন স্পষ্ট হয়ে উঠল। একজন মধ্যবয়সী, টাই-স্যুট পরা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং চোখে সানগ্লাস—সিনেমার ভিলেন টাইপ চেহারা। অন্যজন—হ্যাঁ, রাপ্তীর স্বামী তমাল সেন।

তবে নাহ্। ওরা তর্ক করছে না। দু'জনের মুখেই হাসি আছে। সম্ভবত কোন বিষয়ে উপভোগ্য আলোচনা চলেছে। অতএব খটকা লাগার মতো কিছু নয়। কলকাতার কোন নববিবাহিত তমাল সেনের কোন পরিচিত লোক এখানে বেড়াতে আসতেই পারে। তমাল সেন তার সাথে দেখা করতে যেতেই পারে।

ঠিক এই সময় কানে এল আমার স্যুইটের দরজায় কেউ জোরে নক করছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি রাপ্তী সেন।...

রাপ্তীকে আমার স্যুইটের দরজায় দেখে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম তা ঠিক। কিন্তু তন্মুহূর্তে সংযত হয়ে সহাস্যে বললাম, এস রাপ্তী। আমি জানতাম তুমি এই অচেনা-অজানা জায়গায় একলা বোধ করবে এবং সময় কাটানোর জন্য বৃদ্ধ আঙ্কেলের সঙ্গে গল্প করতে আসবে।

রাপ্তী ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে দেখে মনে সাহস পেয়েছি। তাই একটা কথা বলতে চাই।

বেশ তো। বলো। বসে বলো কি বলবে?

বসব না। যে কোন সময় তমাল এসে পড়তে পারে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

banglaboi.com

কি কথা?

আপনি ঠিকই বলছিলেন। তমাল আমার ফটো তোলার জন্য একটা বিপজ্জনক জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

কথাটা বলে সে একটু থামল। তার মুখে চাপা উত্তেজনা ছিল। তারপর আস্তে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, আমার বড্ড ভয় করছে। আর এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তমাল আমাকে হয় তো...

বলো।

রাপ্তীর মুখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। চাপাস্বরে বলল, ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছি না। তমালের হাবভাব এখানে এসে যেন বদলে গেছে। কাল রাতে কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দেখি, তমাল বিছানায় নেই। ভাবলাম সে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে দেখলাম সে ওখানে নেই। তাছাড়া প্রচণ্ড শীত। বিছানায় আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভাণ করে জেগেই ছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে বাইরের দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকলো। আপনি জানেন, দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। বাইরে থেকে ঢুকতে হলে চাবি দরকার।

তার মানে, সে চাবি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

তুমি ওকে জিজ্ঞেস করোনি কিছু?

না। বলে রাপ্তী করুণ মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি খুব ভুল করেছি। তমাল সম্পর্কে আমার এক বন্ধু পারমিতা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তমালের হাবভাব আচরণে তেমন কিছু পাইনি যে ওকে খারাপ ভাবব। এখন মনে হচ্ছে, পারমিতা ওকে যতটা চেনে, আমি ততটা চিনি না। তমাল হয়তো সত্যিই খারাপ।

কোন অর্থে খারাপ?

রাপ্তী ব্যস্তভাবে বলল, পরে সময়মতো আপনাকে সব বলব। দরকার হলে আপনি প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য করবেন যেন।

ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিশ্চিন্তে থেকো। আমি তমালকে ওয়াচ করব। বাই দা বাই, তুমি এমন কোন লোককে কি চেনো, যার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স?

ট্রেনে ওইরকম চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর নামটা কি যেন—হ্যাঁ, বিনয় শর্মা। নন-বেঙ্গলি হলেও ভাল বাংলা জানেন। কলকাতায় কি একটা ব্যবসা করেন। উনি ছিলেন ওপরের বার্থে। তমালের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?

বিনয় শর্মাকে উত্তরের পাহাড়ে কটেজ এরিয়ায় এখনই দেখছিলাম। তোমার

বর তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গেছে। বলে একটু হেসে বাইনোকুলারটি দেখালাম। রাপ্তী, এই যন্ত্রটি দূরকে নিকট করে। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি দেখছি। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে তুমি নিজেই সাবধান হতে শেখো।

রাপ্তী দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার খটকা লাগার পেছনে সঙ্গত কারণ ছিল। বরাবর আমি লক্ষ্য করেছি, আমার মধ্যে যেন কি একটা অতিরিক্ত বোধ ক্রিয়াশীল। ইনট্যুইশন বলা হোক, কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়জাত বোধ বলা হোক, সামরিক জীবনেই এটা অর্জন করেছিলাম। বিশেষ করে জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেওয়ার পর থেকে আমার ভেতরকার একটা সুপ্ত শক্তি সম্ভবত জেগে উঠেছিল। প্রাণীদের মধ্যে এটা আছে। সভ্যতা মানুষের অবচেতনার গভীরে একে নির্বাসিত করে রেখেছে বলেই আমার ধারণা।

এদিন দুপুরে হোটেলের পশ্চিম দিকের ঘোরালো পায়ে চলা পথটা দিয়ে মুন লেকের তীরে গেলাম। হ্রদে রোয়িংয়ের ব্যবস্থা আছে। একটা রোয়িং বোট পেলে জলটুঙ্গিটার কাছে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এই মরশুমে রোয়িং বোট পেতে হলে অন্তত সাতদিন আগে পর্যটন বিভাগের স্থানীয় অফিসকে জানাতে হবে।

শেষে দক্ষিণের জঙ্গলে অ্যাপোলো প্রজাপতির খোঁজে গেলাম। জঙ্গলের ভেতরে অজস্র ছোট-বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সহসা পাথরের ফাঁকে একটা ফুলেভরা অর্কিড চোখে পড়ল। পাহাড়ি অর্কিড দেখতে পেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। পাথরের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে অর্কিডটার কাছে পৌঁছেছি। সেই সময় ওপরের দিকে ঘন পাইনবনের ভেতর থেকে সেই বিনয় শর্মা বেরিয়ে এল। সে আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ইচ্ছে করেই একটু কাশলাম। তখনই সে চমকে উঠে নীচের দিকে তাকাল। তারপর আমাকে দেখতে পেল।

banglainternet.com

আমি অর্কিডটার ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তাক করলাম। কিন্তু চোখের কোনা দিয়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখলাম। সে আমাকে দেখছিল। একটু পরে সে আমার কাছে নেমে এসে ইংরেজিতে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব? এদিকটায় শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব আছে।

একটু হেসে ইংরেজিতেই বললাম, আপনি শঙ্খচূড় সাপ সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিলেন, সেজন্য ধন্যবাদ।

আপনাকে বিদেশি পর্যটক মনে হচ্ছে। আপনি কি জানেন শঙ্খচূড় সাপ ঘণ্টায় পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার বেগে দৌড়তে পারে?

হয়তো পারে। তবে এই শীতে নাকি শঙ্খচূড় সাপ বেরোয় না। আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে ফের বললাম, আপনি কি স্থানীয় বাসিন্দা, নাকি আমার মতোই বেড়াতে এসেছেন?

বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আপনি—

তার চোখে চোখ রেখে বললাম, বলুন।

হঠাৎ আপনাকে দেখে বিদেশি মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে আপনি বিদেশি নন।

একটু হেসে বললাম, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করছি। আমি বাঙালি।

বিনয় শর্মা চমকে উঠে বলল, অসম্ভব। বাঙালিদের সঙ্গেই আমার চেনাজানা বেশি। কারণ আমি কলকাতায় ব্যবসা করি। আপনার চেহারায় একটু বিশেষত্ব আছে।

থাকতেই পারে।

কিছু মনে করবেন না। আপনার মতো এমন লম্বা-চওড়া মানুষ সচরাচর বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায় না।

দেখা যায়। আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেননি। তাছাড়া বাঙালিরা মিশ্র জাতির মানুষ।

বিনয় শর্মা এবার বাংলায় বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। আপনার পরিচয় পেলে খুশি হব।

আরও জোরে হেসে উঠলাম। বললাম, বুঝতে পারছি আপনি আমার কথা শুনে আমার বাঙালিত্ব যাচাই করতে চান। তো আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অবশ্য বহুবছর আগে সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু আপনার বাংলা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি বাঙালি নন। ঠিক ধরেছি, তাই না?

বিনয় শর্মা অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, অন্য বাঙালিরা ধরতে পারে না। কলকাতায় আমার জন্ম। সেখানেই বাস করি। হ্যাঁ, আমি বাঙালি নই। তার মানে, আমার মাতৃভাষা বাংলা নয়। আমার বাবা-মা এই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। আমার নাম বিনয়কুমার শর্মা। যাই হোক, আপনি এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। বাবার কাছে শুনেছি, শঙ্খচূড় সাপ শীতকালে অন্য সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে না।

কিন্তু মিঃ শর্মা, আপনার তো দেখছি শঙ্খচূড়ের ভয় নেই।

ভয় আছে। তবে আমি সঙ্গে লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস্ রাখি। বিনয় শর্মা ওপরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল, সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়েছিলাম, ওখানে কোন পাহাড়ের গায়ে নাকি প্রাচীন যুগের শিলালিপি খোদাই করা আছে। বুঝতেই পারছেন, আমি কারবারি লোক। নানা ধরনের কারবার করি। তাই ইচ্ছে ছিল শিলালিপির একটা ফটো তুলে তা থেকে কপি তৈরি করে বিদেশে কোন মিউজিয়ামকে বিক্রি করব। কিন্তু ওটা খুঁজে পেলাম না।

উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, বলেন কি! কাগজে যখন খবর বেরিয়েছে,

তখন ওটা সত্যিই কোথাও আছে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রেরও সেটা জানার কথা।

ওঁরা জানেন না। বিনয় শর্মা গম্ভীর মুখে বলল, উড়ো খবর। আজকাল কাগজওয়ালারা মিথ্যা চটকদার খবর ছাপে। অকারণে আমি হয়রান হলাম। লাইফ রিস্ক নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। ফিরে গিয়ে ওই কাগজে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখব।

বিনয় শর্মা পা বাড়িয়ে ফের বলল, আপনি বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না। বাবার কাছে শুনেছি দুপুরে শঙ্খচূড় সাপেরা জল খেতে নেমে আসে। বাবা একবার এই সাংঘাতিক সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন।

সে আমায় পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। হ্রদের তীরবর্তী সমভূমিতে গিয়ে সে একবার ঘুরে আমাকে দেখল। তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকল। আমার হাসি পাচ্ছিল। কিছু লোক থাকে, যারা সবসময় অন্যদের নির্বোধ ভাবে। এই লোকটি সেই গোত্রের।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। বেলা দুটোর পর লেকভিউয়ে আর লাঞ্চ মেলে না শুনেছি। সময় হিসেব করে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। কিছুটা ওঠার পর বাইনোকুলারে দেখলাম, বিনয় শর্মা লেকভিউ হোটেলের দিকে পায়ে চলা পথ ধরেছে। সে তা হলে তমাল সেনের কাছেই যাচ্ছে।

পাইনবনে ঢুকে সতর্কভাবে চারদিকে লক্ষ্য রেখে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। একটু পরে সহসা মাথায় এল, এভাবে আমি কিসের খোঁজে যাচ্ছি? বিনয় শর্মার গতিবিধির কোনো সূত্রই তো আমার চোখে পড়ছে না। নাহ্! মাঝে মাঝে আজকাল যেন আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। এতদিনে সত্যিই আমার বাহাত্তুরে দশা ঘটেছে দেখছি।

banglaboi.com.bd

ঢালের ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে চুরুট ধরালাম। তারপর বাইনোকুলারে ফুটবিশেক নীচে পাইনবনটা খুঁটিয়ে একবার দেখে নিলাম। সেই সময় একটা মোটাসোটা পাইনগাছের তলায় কয়েকটা সিগারেটের টাটকা ফিল্টারটিপ চোখে পড়ল। বিনয় শর্মা তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।

তখনই নেমে গিয়ে জায়গাটা দেখলাম। পাঁচটা সিগারেট খেয়েছে বিনয় শর্মা। সে কি এখানে কারও জন্য অপেক্ষা করছিল? মাটিটা নগ্ন এবং এবড়ো-খেবড়ো, জুতোর ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে পাঁচটা সিগারেট খেতে যতটা সময় লাগে, এক্ষেত্রে তার চেয়ে দ্রুত সিগারেট খাওয়া হয়েছে। বিনয় শর্মাকে বেলা এগারোটায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরে উত্তরের কটেজে তমালের সঙ্গে দেখেছি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তাকে এই পাইনবন থেকে বেরুতে দেখলাম। তার মানে, সে বেশিক্ষণ আগে এখানে আসেনি। সম্ভবত আমি অর্কিডটার কাছে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগেই সে এখানে

উঠে এসেছিল। অন্য কোন দিক থেকে আমার অজ্ঞাতসারে সে দুর্গম এই জঙ্গলে উঠে আসতে পারে না। তবে এটা স্পষ্ট যে, সে খুব কম সময় এখানে ছিল এবং সেই সময়ের মধ্যে পাঁচটা সিগারেট খাওয়া তার তীব্র উদ্বেগকেই জানিয়ে দিচ্ছে।

অবশ্য এর উল্টোটাও হতে পারে। কেউ বিনয় শর্মার জন্যই কি উদ্বিগ্ন ভাবে এখানে অপেক্ষা করছিল? শর্মা এখানে আসার পর সে চলে গেছে কি?

কিন্তু তা হলে সে গেল কোন পথে? যেখানে অর্কিডটা দেখেছি এবং আমিও যেখান দিয়ে উঠে এসেছি, সেটা ছাড়া এই পাইনবনে পৌঁছনো যায় না। কারণ পাইনবনের নীচে খাড়া পাথরের পাঁচিল। কোথাও প্রকাণ্ড সব পাথর এলোমেলো পড়ে আছে একটার পর একটা। মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং এবং সরঞ্জাম ছাড়া এই সব পাঁচিল আর পাথর বেয়ে এখানে ওঠা সম্ভব নয়। ওই একটামাত্র ওঠার পথ।

বাইনোকুলারে আবার চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। সেই সময় হঠাৎ পাইনবনের ভেতরে একটা পাথরের পাশে একটা হাত নড়তে দেখলাম। শুধুই হাত। অর্থাৎ কব্জি থেকে আঙুল পর্যন্ত অংশটা।

বাইনোকুলার নামিয়ে খালি চোখে দেখলাম, হাতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পাথরটা আছে প্রায় কুড়ি মিটার দূরে একটু নিচু জায়গায়। দ্রুত সেখানে নেমে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম।

পাথরের পেছনে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়িবাঁধা অবস্থায় কেউ কাত হয়ে পড়ে আছে এবং বাঁধনমুক্ত হওয়ার চেষ্টায় মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। হাঁটু দুমড়ে বসে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে দেখি, সে তমাল সেন।

তার মুখে টেপ সাঁটা আছে। আমাকে দেখা মাত্র সে গোঁ-গোঁ করে উঠল।

আমার সঙ্গে সবসময় নানাধরনের দরকারি জিনিস থাকে। জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বের করে দড়িটা কাটতে শুরু করলাম। নাইলনের মোটা দড়ি কাটতে একটু সময় লাগল। কাঁধে ঝোলানো জলের বোতল থেকে তার মুখে জলের ঝাপটা দিলাম। তারপর তার মুখের টেপ খুলে ফেললাম। সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল, জল।

জল খাইয়ে তাকে একটু সুস্থ করে টেনে ওঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে পাথরে হেলান দিয়ে বসে হাতের ইশারায় আমাকে নিবৃত্ত করল। দেখলাম দড়ির বাঁধন ছাড়াও তাকে চড়-কিল-ঘুষি মারা হয়েছে। চোয়ালে এবং চোখের নীচে লালচে দাগ বেশ স্পষ্ট। একটু পরে সে ভাঙা গলায় ইংরেজিতে বলল, শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। ও যে কোন সময় এসে পড়বে।

বাংলায় বললাম, তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে ওঠার চেষ্টা করো। দেখতেই পাচ্ছ আমি একজন বুড়ো মানুষ। তোমাকে কাঁধে বওয়ার শক্তি আমার নেই। বিশেষ করে এটা পাহাড়ি জঙ্গল।

সে চমকে উঠে তাকাল। তারপর আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে উঠল। কি ভাবে তাকে নীচের সমভূমিতে নিয়ে এলাম, সে বর্ণনা এখানে অবান্তর। তবে শুধু এটুকুই বলা উচিত, সামরিক জীবনে আহত সঙ্গীকে বয়ে আনার যেসব কৌশল শিখেছিলাম, সেগুলি আবার কাজে লাগল।

নীচে নেমে তমাল বলল, আপনাকে আমি লেক ভিউ হোটেলে দেখেছি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। আপনি যে বাঙালি, তা বুঝতে পারিনি।

হ্যাঁ। আমি বাঙালি। আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তো তুমি কি এখন হাঁটতে পারবে? নাকি ট্যুরিস্ট সেন্টারে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করব?

প্লিজ কর্নেল সাহেব। তমাল করজোড়ে বলল, আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে চলে যাবেন না। আর একটু বিশ্রাম নিলেই আমি হেঁটে যেতে পারব।

তুমি কি বিনয় শর্মাকে ভয় পাচ্ছ?

আপনি চেনেন ওকে? তমাল অবাক হয়ে বলল, কি করে ওকে চিনলেন?

চিনি। কি সূত্রে চিনি, পরে বলব। আর এও জানি, তোমার নাম তমাল সেন।

কে আপনি?

না— তোমার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি থাকতে বিনয় শর্মা আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আপাতত লেকের ওপর চল। রোদে কিছুক্ষণ বসলে তুমি ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

bengalidownload.com

তমালকে নিয়ে হোটেলে ফেরার পথে বাইনোকুলারে লক্ষ্য রেখেছিলাম, বিনয় শর্মা আসছে কি না। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পাইনি। ব্যালকনিতে রাপ্তীকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে আমাদের দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। একটু পরে যখন আমার কাঁধে ভর করে তমাল হোটেলের পথে চড়াইয়ে উঠছে, তখন রাপ্তী দৌড়ে এসেছিল। তাকে বলেছিলাম, এখন কোন কথা নয়। আপাতত বেচারাকে একটু সাহায্য কর।

দোতলায় ওদের স্যুইটে তমাল বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তখন দুটো বেজে গেছে। কিন্তু আমার কপালগুণে ডাইনিং হলে ঢুকে খাদ্য পেয়েছিলাম। ম্যানেজার ভদ্রলোক অতিশয় সজ্জন মানুষ। গত রাতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার সাদা দাড়ি এবং নেমকার্ডের জোরে তাঁর খাতির পেয়েছিলাম। তিনি আমার টেবিলে এসে এবেলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না। সুযোগ পেয়ে তাঁকে বলেছিলাম, সম্ভব হলে ২২ নম্বর স্যুইটে আমার ভাগনি এবং তার বরের জন্য যেন খাবার পাঠিয়ে দেন। ম্যানেজার সহাস্যে বলেছিলেন, কোন অসুবিধে নেই। আসলে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ম শিথিল না করে তাঁদের

উপায় থাকে না। দৈবাৎ কোন হোমরা-চোমরা অর্থাৎ ভি আই পি দুটোর পর এসে পড়লে তো তাঁদের জন্য যেকোন ভাবে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। কাজেই আড়াইটে অব্দি তাঁরা কিচেন খোলা রাখেন।

গোগ্রাসে লাঞ্চ সেরে ওপরে গিয়ে ২২ নম্বরে নক করেছিলাম। রাপ্তী দরজা খুলে বলেছিল, খাবার দিয়ে গেল। আপনিই পাঠিয়েছেন বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তমাল খাচ্ছে। তবে ওর চোয়াল নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে কোন পেইনকিলার আনি নি যে ওকে খাইয়ে দেব।

বলেছিলাম, পেইনকিলার খাওয়া ঠিক নয়। ওকে বিশ্রাম করতে দাও। আর একটা কথা। তোমরা দু'জনেই যেন আমাকে না জানিয়ে হোটলে থেকে বেরিয়ো না। তুমি তিনটের মধ্যে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো।

নিজের স্যুইটে ঢুকে ও পোশাক বদলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম। জলটুঙ্গির ওপর সূর্য কাত হয়ে ঝুলে পড়ছে। বাইনোকুলারের লেন্সে সোজা রোদ পড়লে আমার চোখের ক্ষতি হবে। তাই সেক্রেটারি বার্ডের আশা আপাতত ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বরং কিছুক্ষণ পরে হ্রদের ধারে গিয়ে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এদিন আমি ক্লান্তও বটে। একটু বিশ্রাম করা দরকার।

রাপ্তীর প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনটে বেজে গেল। সে এল না। ভাবলাম, তমালের মুখে বিনয় শর্মার হাতে তার দুরবস্থার বিবরণ পেয়ে গেছে বলেই আসছে না।

সেক্রেটারি বার্ড, না তমাল-রাপ্তী, কোন বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেব, ঠিক করতে পারছিলাম না। তাই একটা কয়েন টস করলাম। সেক্রেটারি বার্ড টসে জিতল।

হ্রদের তীরে এখন দ্রুত ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কারণ সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়েছে। সেক্রেটারি বার্ড বাইনোকুলারে ধরা পড়ল না। জলটুঙ্গির জঙ্গল ঘিরে হালকা কুয়াশা জমেছে। রোয়িং বোটগুলি একে একে তীরে ভিড়ছে। আজ ঠাণ্ডাটা কালকের চেয়ে বেশি। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের পাহাড়তলিতে গেলাম। পর্যটন অফিসে সবে আলো জ্বলে উঠল। কাউন্টারে একজন কর্মী বসে চা খেতে খেতে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। আপনাকে কোন কটেজ দিতে পারছি না। বাংলো দুটি তো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বুক হয়ে গেছে। আপনাকে গতকাল তা জানিয়েছি।

বললাম, না। আমি আর কটেজ বা বাংলোর জন্য আসিনি। একজন চেনা লোকের খোঁজে এসেছি। তিনি কটেজে উঠেছেন। কিন্তু কটেজ নম্বর জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তার নাম বিনয় শর্মা।

কর্মী ভদ্রলোক রেজিস্টার্ড খুলে তন্নতন্ন খুঁজে বললেন, না। বিনয় শর্মাকে পাচ্ছি না। তিনি কবে এসেছেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, তার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। সবসময় চোখে সানগ্লাস পরে থাকে। চোখের অসুখ আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ও। আপনি তাহলে ডঃ রঘুবীর প্রসাদের কথা বলছেন? আপনি যে বর্ণনা দিলেন, তা ডঃ প্রসাদের। উনি একজন বিখ্যাত লোক। প্রায়ই এখানে আসেন।

বিস্ময় চেপে বললাম, দুঃখিত। আসলে বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রংশ। বিনয় শর্মার সঙ্গে ডঃ প্রসাদকে গুলিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ। ডঃ রঘুবীর প্রসাদকেই আমি খুঁজছি।

ডঃ প্রসাদ উঠেছেন ১২৭ নম্বর কটেজে। পর্যটন কর্মী কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে কটেজে পৌঁছনোর পথটাও বলে দিলেন।

সেই সময় অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো বললাম, আসলে উনি চন্দ্র সরোবর এলাকার কোন পাহাড়ে প্রাচীন শিলালিপির খোঁজ পেয়েছেন। আমিও এ বিষয়ে একটু কৌতূহলী।

পর্যটন কর্মী মন্তব্য করলেন, ডঃ প্রসাদ একজন ঐতিহাসিক।

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ১২৭ নম্বর কটেজ খুঁজে বের করতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। এখনই কটেজ এলাকায় সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে। কটেজগুলি একই গড়নের ছোট্ট বাড়ি এবং রঙিন টালির চাল। সামনে সুদৃশ্য লন এবং ফুলবাগান আছে। গেটের কাছে উঁকি মেরেই পিছিয়ে এলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘরের পর্দা তুলে এইমাত্র যে বারান্দায় এল, তাকে বারান্দার আলোয় চিনতে দেরি হয়নি। সে রাপ্তী সেন।

কটেজের নিচু পাঁচিলের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে রাস্তার মোড়ে একটা উঁচু আইল্যান্ডের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কেউ আমাকে দেখল কি না লক্ষ্য করার সুযোগ ছিল না।

একটু পরে দেখলাম, রাপ্তী এবং বিনয় শর্মা চাপা গলায় কথা বলতে বলতে লেকের দিকের উৎরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর এক মিনিট দেরি করলে ওরা আমাকে দেখে ফেলত। তার ফলে অন্য কি ঘটত জানি না। কিন্তু ওরা যে খুবই সতর্ক হয়ে যেত তাতে ভুল নেই।

টুপিটা কপালের ওপর নামিয়ে মাফলারে দাড়ি ঢেকে এবং একটু কুঁজো হয়ে ওদের অনুসরণ করলাম। পর্যটন অফিসের কাছে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। তারপর রাপ্তী চলে গেল। আমি দ্রুত সামনের একটা কটেজের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডঃ রঘুবীর প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মা কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে নিজের কটেজের দিকে ফিরে চলল।

এবার আমি পর্যটন অফিসের কাছে গিয়ে ওদের ক্যান্টিনে ঢুকলাম। এই উত্তেজনার সময় এক পেয়ালা কফির দরকার ছিল। তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল।

ক্যান্টিনে লাইন দিয়ে লোকেরা কফির কুপন কিনছে এবং লাইন দিয়ে সেই কুপন দেখিয়ে পেপারকাপে কফি নিচ্ছে। বসার জায়গা খালি নেই। কিন্তু কি আর করা যাবে?

কিছুক্ষণ পরে এক কোণে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছি, সেইসময় এক যুবতীকে কফির লাইনে দেখতে পেলাম। তার পরনে জিনস্ আর ব্যাগি সোয়েটার। মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ানো। মুখে উদ্ধত লাবণ্য আছে। যুবক-যুবতীদের প্রতি আমি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি এবং আমার সমবয়সীদের চেয়ে তাদের সঙ্গেই আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ নিয়ে আমার চেনা মহলে অনেক রসিকতা চালু আছে। আসলে নিজের যৌবনের স্মৃতিই যে আমার এই স্বভাবের মূল কারণ, সেটা কাকেও বোঝাতে পারি না। যুবক-যুবতীদের যৌবনের উষ্ণতায় নিজের অতীতকে আমি ফিরে পাই যেন। যুবক-যুবতী নির্বিশেষে আমি যে ডার্লিং বলে সম্ভাষণ করি, তার কারণও এই।

যুবতীটির কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নেই। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে বাঁকামুখে স্বগতোক্তি করল, ইশ! কি বিচ্ছিরি কফি।

বুঝলাম যে বাঙালি মেয়ে। একটু এগিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, এখানকার ঠাণ্ডাটাও বিচ্ছিরি কি না। এরকম বিচ্ছিরি কফি ছাড়া এই বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা জব্দ হবে না।

সে নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই বুড়ো বয়সে আমি যদি মুন লেকে বেড়াতে আসতে পারি, কমবয়সীদের না পারার কারণ দেখি না। তবে মুন লেকে রোয়িং করতে বললে আমি কিন্তু পারব না।

এবার সে আস্তে বলল, আপনি কে জানতে পারি?

অবশ্যই। বলে জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে তাকে দিলাম।

কার্ডটা পড়ে সে বলল, আপনার নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন পড়েছি। ঠিক মনে করতে পারছি না। আপনি কোথায় উঠেছেন?

হোটেল দ্য লেক ভিউ-তে। তুমি? তুমি বলছি, কিছু মনে করো না। তুমি আমার মেয়ের বয়সী। বলে হেসে উঠলাম। অবশ্য কোন ছেলেমেয়ে নেই। কারণ আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি।

সে হাসল না। বলল, বিয়ে-টিয়ে বলছেন কেন? বিয়ে ব্যাপারটা জানি। টিয়ে কি জানি না।

বিয়ে যেমন আছে, তেমনি টিয়েও আছে। যাই হোক, তুমি কোথায় উঠেছ?

ইস্টার্ন লজে।

তোমার বন্ধুরা কোথায়?

আমার কোন বন্ধু নেই।

সে কি! তুমি একলা এসেছ?

এতে অবাক হওয়ার কি আছে?

হুঁ। নেই। তো—

তবে কি?

তোমার বয়সী যারা, তাদের বন্ধু না থাকাটা অস্বাভাবিক।

আমি একটু অস্বাভাবিক।

বাহ। এই ঠাণ্ডায় তোমার কথাবার্তা আরাম দিচ্ছে।

তার মানে? কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই, তোমার কথাবার্তায় যথেষ্ট উত্তাপ আছে।

সে কার্ডটা আবার দেখতে দেখতে কফিতে চুমুক দিল। আমি কফির কাপ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে চুরুট বের করলাম। তারপর যেই চুরুটটা লাইটার জ্বেলে ধরিয়েছি, সে অমনই আস্তে বলে উঠল, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় আপনার কথা আমি পড়েছি। আপনি কফি এবং চুরুটের ভক্ত, তাও জানি। আপনি কেই বিখ্যাত—

তাকে থামিয়ে দিলাম। মিটিমিটি হেসে বললাম, চেপে যাও। কথায় বলে দেওয়ালের কান আছে।

এতক্ষণে সে একটু হাসল। নিষ্প্রাণ হাসি। তারপর বলল, আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক কোথায়?

তুমি নিশ্চয় সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর কথা বলছ। তাকে সঙ্গে আনিনি। কারণ আমি এখানে এসেছি একটি দুর্লভ প্রজাতির পাখির খোঁজে।

তাকে সঙ্গে আনলে ভাল করতেন। রহস্যটা জমে উঠেছে।

রহস্য? বলো কি? কিসের রহস্য?

সে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, চলুন। আমাকে ইস্টার্ন লজে পৌঁছে দেবেন? আমি কল্পনাও করিনি এসময়ে আপনাকে এখানে পেয়ে যাব। আমার সাহস বেড়ে গেল।

রাস্তায় নেমে গিয়ে বললাম, তোমার নামটা এখনও বলছ না।

রাপ্তী সেন।

থমকে দাঁড়ালাম। কি বললে?

রাপ্তী সেন।

bengalidownload.com

এটা কোন ফাঁদ কি না কে জানে। একটু সতর্ক হয়ে বললাম, দেখ রাপ্তী, এখানে কোন রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি আসিনি। এই লেকের জলটুঙ্গিতে একটা সেক্রেটারি বার্ডের খোঁজ পেয়েছি। তাই—

বিশ্বাস করছি না কর্নেল সরকার।

তোমার ইচ্ছা।

সে আমার পাশ ঘেঁষে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল। তারপর বলল, আপনি যে হোটেলে উঠেছেন, সেখানে প্রবীর সেন নামে একজন আছে। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

প্রবীর সেনের কথা জানি না। তবে তমাল সেন নামে একজন আছে।

হ্যাঁ। ওর ডাকনাম তমাল। ও আমার হাজব্যান্ড।

বলো কি। তা তুমি একখানে, তোমার হাজব্যান্ড অন্যখানে— ব্যাপারটা কি?

সেটাই তো রহস্য। আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে দেখেছেন নিশ্চয়?

দেখেছি।

ওর নাম পারমিতা রায়। পারমিতা আমার হাজব্যান্ডকে ট্র্যাপ করে এনেছে। রীতিমতো ব্ল্যাকমেল।

বুঝলাম না।

সি ইজ ডেঞ্জারস। তমাল বোকার মতো ওর ফাঁদে পড়েছে। ও তমালকে ওর হাজব্যান্ড সাজতে বাধ্য করেছে। এমন কি আমার নামটাও আত্মসাৎ করেছে পারমিতা। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কর্নেল সরকার?

লেকের ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে কুয়াশা মাখানো যেটুকু আলো ছড়াচ্ছিল, সেই বিবর্ণ আলোয় তার চোখে জল দেখতে পেলাম। মাথায় জড়ানো স্কার্ফের কোনা দিয়ে চোখের জল মুখে সে শ্বাস ছাড়ল। বললাম, আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। তমাল তোমার স্বামী। তাকে একটি মেয়ে ব্ল্যাকমেল করছে এবং ফাঁদে ফেলেছে বলছ। কিন্তু তা হলে তুমি কেন পুলিশের কাছে যাওনি?

পুলিশের কাছে যাওয়ার প্রব্লেম আছে।

কি প্রব্লেম?

তমাল মিউজিয়াম থেকে পারমিতার সাহায্যে একটা সিল চুরি করেছিল। পারমিতা মিউজিয়ামে চাকরি করত। সিল চুরির পর ওর চাকরি যায়। সেই সিলে নাকি এই লেকের ধারে কোন পাহাড়ের গুহায় প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ আছে। বাকিটা শুনতে হলে আপনাকে একটু সময় দিতে হবে। ইস্টার্ন লজে নয়, অন্য কোথাও। আপনিই বলুন কোথায় এবং কাল কখন আপনার সঙ্গে দেখা করব?

একটু ভেবে নিলাম। এটা ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার কোন ফাঁদ কি না

ঝতে পারছি না। তাই বললাম, ঠিক আছে। কাল সকাল আটটায় তুমি বরং টাউনশিপ এরিয়ায় মহামায়া পার্কে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তুমি টাউনশিপ যাতে সাইকেল রিক্‌শা পেয়ে যাবে। মহামায়া পার্ক সবাই চেনে।

লেক ভিউয়ে ফিরে ম্যানেজারকে বলেছিলাম, এবার থেকে আমার স্যুইটে যেন খাদ্য বা পানীয় সার্ভ করা হয়। আমি বারবার কফি খাই। বারবার সেজন্য ডাইনিং হলে নেমে আসতে হয়। এটা আমার বয়সী মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনক।

ম্যানেজার সতীশ কুমার বলেছিলেন, সে ব্যবস্থা তো আছেই। আপনি লক্ষ্য করবেন, স্যুইটের ভেতরে দরজার পাশে একট সাদা বটম্ আছে। ওটা টিপলেই লোক যাবে। দুঃখের বিষয়, আমরাও এখনও কোন স্যুইটে টেলিফোনের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে শিগগির সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা বাজে। হোটেলবয় ট্রেতে কফি পৌঁছে দিয়ে গেল। আমার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। ঘরের ঠাণ্ডা দূর করার জন্য একটা হিটার আছে। সুইচ অন করে সেটা পায়ের কাছাকাছি রেখে আরাম করে বসলাম। তারপর পট থেকে কফি ঢেলে লিকারে চুমুক দিলাম। দুধ-চিনি ছাড়া কফি আমি কদাচিৎ খাই। এখন এর দরকার ছিল।

তমাল-রাপ্তী-পারমিতা-ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মা, মিউজিয়ামের সিল-প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি এইসব ব্যাপার মাথার ভেতর মাছির মতো ক্রমাগত ভন ভন করছিল। কার কথা বিশ্বাস করব বুঝতে পারছিলাম না। তমাল, রাপ্তী এবং পারমিতা প্রত্যেকেই বলেছে, পরে বলব। পরে কেন? ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার হতে তমাল মার খেয়েছে এবং তাকে পাইনবনে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় দেখেছি, এই ঘটনাটি অবশ্য সত্য। কিন্তু তমালও বলেছে, সব কথা পরে জানাবে। এখন কথা হচ্ছে, ইস্টার্ন লজের মেয়েটি যদি সত্যিকার রাপ্তী এবং তমালের সত্যিকার স্ত্রী হয়, তাহলে তমালের দুর্দশার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। চোরাই সিলটি তমাল ডঃ প্রসাদকে দিচ্ছে না বলেই সম্ভবত তার এই দুর্দশা ঘটেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। ২২ নম্বর স্যুইটের দরজায় গিয়ে নক করলাম। রাপ্তী দরজা খুলে আমাকে দেখে করুণ মুখে বলল, বিকেলে একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, আমার স্বামী পাহাড় থেকে পড়ে প্রচণ্ড আছাড় খেয়েছে। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই এলেন না। বললেন, ট্যুরিস্ট সেন্টারের হসপিটালে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে পাত্তা পেলাম না। এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত। তখন আবার সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ওষুধ দিলেন। মনে হচ্ছে সেডেটিভ দিয়েছিলেন। তমাল ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুতেই ওকে জাগাতে পারছি না।

boighar.com

বললাম, আমি ওকে একটু দেখতে চাই। আপত্তি আছে?

রাপ্তী ব্যস্তভাবে বলল, কেন আপত্তি থাকবে? আপনি আমার আঙ্কেল হয়েছেন। আসুন, ওকে দেখুন।

ঘরে ঢুকে তমালকে জাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম, সত্যিই ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলো ছিল। আলোটা নিষ্প্রভ হলেও দ্রুত চোখ বুলিয়ে মনে হলো ঘরের ভেতরটা অগোছাল অবস্থায় আছে। একটা বড় স্যুটকেসের ডালার ফাঁকে কাপড়-চোপড়ের একটা অংশ বেরিয়ে আছে। এর একটাই অর্থ হয় রাপ্তী ঘরের সবখানে কিছু খুঁজছিল, অথবা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল, এবং আমি এসে পড়ায় তাতে ব্যাঘাত ঘটেছে।

বললাম, তুমি বলছিলে সব কথা পরে বলবে। এখন বলতে কি অসুবিধা আছে?

রাপ্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু চুপ করে থাকল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, তমাল এখানে হনিমুনের ছলে এসেছে। বিনয় শর্মার সঙ্গে স্মাগলিং কারবার করে সে। আমি তা জানতে পেরে তাকে থ্রেট করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি জানি তুমি কেন এসেছ। আমি আর এখানে থাকতে চাই না। এই নিয়ে কাল রাতে ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তাই সে আমাকে সকালে পাহাড়ের ওপর ফটো তোলার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বুঝুন আঙ্কেল। আমি খাদে পড়ে গিয়ে মরে যেতাম। আর তমাল এটা অ্যাকসিডেন্ট বলে চালিয়ে দিত।

ঠিক বলেছ। কিন্তু কিসের স্মাগলিং?

নার্কোটিক্সের।

তুমি কি করে জানতে পারলে?

তমালের কাছে একটা প্যাকেট ছিল। সেই প্যাকেটটা সকালে আর দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ, দরে পোষাচ্ছে না বলেই তমাল ওটা বিনয় শর্মাকে দেয়নি। তাই বিনয় শর্মা ওকে পাইনবনে মারধর করে দড়িতে বেঁধে ফেলে রেখেছিল। ভাগ্যিস আপনি সেখানে গিয়ে ওকে উদ্ধার করেছিলেন।

হুঁ। নার্কোটিক্স তমাল কলকাতায় বসেই বিনয় শর্মাকে বেচতে পারত বা তা নিয়ে নিরাপদে দরাদরি করতে পারত। সে এখানে তা বেচতে এল কেন?

রাপ্তী খুব চাপাস্বরে বলল, পরশু বিকেলে এখানে আসার পর তমাল কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর ও সেই প্যাকেটটা নিয়ে ফিরে এল। জেরা করলে শুধু বলল, এতে কিছু লাইফসেভিং ড্রাগ আছে। এখানে আমার কোনো এক ভদ্রলোক এই প্যাকেটটা কলকাতায় তাঁর অসুস্থ আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছেন।

সকালে যখন প্যাকেটটা দেখতে পেলে না, তখন ওকে কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। দুপুরে যখন ওকে আহত অবস্থায় আপনি নিয়ে এলেন, তখন ওটার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে তমালের চেনা কোন স্মাগলার আছে। তমাল তার কাছেই নার্কোটিক্স কিনেছে। তারপর বিনয় শর্মাকে ওটা বিক্রির প্রোপোজাল দিয়েছে।

তোমার সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত। বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

রাপ্তী দরজার কাছে এসে বলল, দরে পোষাচ্ছে না বলে তমাল প্যাকেটটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে আঙ্কেল।

ঠিক বলেছ। তুমি কি তমালকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?

ওর শরীরের যা অবস্থা, কি করে এখন নিয়ে যাবো? তাছাড়া আমাদের ট্রেনের রিজার্ভেশন রিটার্ন টিকিটের তারিখ ১৪ নভেম্বর। আজ ১১ নভেম্বর।

সাবধানে থেকো। বলে বেরিয়ে এলাম।

নিজের স্যুইটে ফিরে রাপ্তীর বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝলাম আপাতদৃষ্টে একটা যুক্তিসঙ্গত বিবরণ সে দিয়েছে। ওদিকে ইস্টার্ন লজের রাপ্তীর বিবরণও যুক্তিসঙ্গত। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ইস্টার্ন লজের রাপ্তী আমার পরিচয় জানে। এবার আমার প্রথম কাজ হল, কে প্রকৃত রাপ্তী সেটা খুঁজে বার করা। দ্বিতীয় কাজ হল, তমালের সঙ্গে প্রকৃত রাপ্তীর দাম্পত্য সম্পর্কের সত্যতা যাচাই। তারপরের কাজটি হল, এটা নার্কোটিক্স সংক্রান্ত ঘটনা, নাকি মিউজিয়ামের চোরাই সিল সংক্রান্ত ঘটনা, সেটা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া।

পর্যটন কেন্দ্রের কর্মীটি বিনয় শর্মাকে জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলে জানেন। তাঁর এই জানাতে ভুল থাকতেই পারে।

তবে এমন অদ্ভুত রহস্যে এর আগে কখনও জড়িয়ে পড়িনি। এ একটা আসল-নকল নিয়ে জমজমাট খেলা। তমালের ঘরে রাপ্তীকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, সে কোথায় কি চাকরি করত। একটা জবাব নিশ্চয় পেতাম। কিন্তু মিউজিয়ামে চাকরি করত কি না জিজ্ঞেস করলে (যদি ইস্টার্ন লজের রাপ্তীর কথা সত্য হয়) সে সতর্ক হয়ে যেত। কাজেই ধীরেসুস্থে এগোনোই ভাল। তবে এখনই গিয়ে ম্যানেজারকে গোপনে জানাতে হবে, ২২ নম্বর স্যুইটের তমাল সেনকে কেউ চিকিৎসার ছলে স্ট্রেচারে চাপিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি যেন বাধা দেন এবং পুলিশকে জানান।

পরদিন ভোরে অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এদিনও ঘন কুয়াশা ছিল। কিন্তু সতর্কতার দরুন হ্রদের তীরে না গিয়ে উল্টো দিকে লেকভিউ হোটেলের পূর্বের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঢালু একটা উপত্যকায় নেমে গেলাম।

banglaboi.org

উপত্যকাটি ছোট-বড় নানা গড়নের পাথর আর ঝোপঝাড়ে দুর্গম হয়ে আছে। দুর্গম স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবল। কুয়াশা এত ঘন যে দু-তিন মিটারের দূরে কি আছে, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। একসময় হঠাৎ মনে হল, এভাবে কুয়াশার মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত হয়নি আমার। তমালকে যে আমিই উদ্ধার করেছি বিনয় শর্মা তা জানতে পেরেছে। সে যদি আমাকে এখন অনুসরণ করে থাকে, যে কোনও মুহূর্তে আমি আক্রান্ত হব।

ডাইনে-বাঁয়ে এদিকে-ওদিকে আমার এভাবে হেঁটে যাওয়া কেউ দেখলে অবশ্যই পাগল ভাবত। কিন্তু একটু পরেই যা ঘটে গেল, তাতে বুঝলাম যে, আমার সেই ইনট্যুইশনই আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

সামরিক জীবনের আরেকটা শিক্ষাও চমৎকার কাজে লেগে গেল। জঙ্গলে গেরিলাযুদ্ধের তালিম নেওয়ার সময় এটা আয়ত্ত করেছিলাম। কোথাও একটু শব্দ হলেই সেই শব্দটা কিসের এবং আমার কাছ থেকে তার দূরত্ব কত, শব্দটার উৎসস্থল এইসব কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি জেনে ফেলি।

একটা বড় পাথরের পাশে ঘন ঝোপের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় পেছনে আবছা একটা শব্দ কানে এসেছিল। পথরগুলির ফাঁকে শীতে ঝরে পড়া গুল্মলতার পাতার স্তূপ রাতের শিশিরে ভিজে গেছে। শুকনো পাতার ওপর কোন মানুষ বা জন্তু যত সাবধানেই পা ফেলুক, পতার শব্দ হবেই। কিন্তু ভিজে পাতার ওপর চুপিচুপি পা ফেলার শব্দ অন্যরকম। যে শব্দটা শুনেছিলাম, তা হঠাৎ থেমে যেতেই প্রথমে মনে হয়েছিল কোন চতুষ্পদ প্রাণীর— তা বাঘ-ভালুকেরও হতে পারে। মুন লেক অঞ্চলে এখনও বাঘ-ভালুক থাকা সম্ভব।

কিন্তু শব্দটা আবার শুনতে পেলাম এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, ওটা কোন দ্বিপদ প্রাণীরই পায়ের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে রিভলভার বের করে তৈরি হলাম। আগেই বলেছি, কুয়াশা এত ঘন যে দু-তিন মিটার দূরেও কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। শব্দটার উৎস আমার হিসাবে আন্দাজ তিরিশ ফুট দূরে এবং আমার ডানদিকে। আমার পেছনে ঘন ঝোপ। তখনই গুঁড়ি মেরে বসে ডানদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ্য রাখলাম। শব্দটা থেমে গিয়েছিল। তারপর আমার দু'পাশে একটা করে ঢিল পড়তে থাকল।

মানুষই ঢিল ছোড়ে। যে ঢিল ছুড়ছিল, এটা তার শিকারি স্বভাবের পরিচয়। কারণ আমি দেখেছি, ধূর্ত শিকারিরা এভাবে ঝোপঝাড়ে আন্দাজে ঢিল ছুড়ে লুকিয়ে থাকা প্রাণীকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। রাগ হল। আবার হাসিও পেল। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে কি ভেবেছে?

আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। যেদিক থেকে ঢিল আসছিল, সেইদিকে রিভলভারের নল ঈষৎ উঁচু করে একটা গুলি ছুড়তেই হল। নরহত্যার দায় এ বয়সে আর বইতে চাই না। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

স্তব্ধ ঠাণ্ডাহিম কুয়াশা ঢাকা উপত্যকায় গুলির শব্দটা যথেষ্ট জোরালো ছিল।

তারপরই আবার পায়ের শব্দ ক্রমাগত। এবার শব্দটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে। সে এত সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভবত কল্পনাও করেনি। এও বোঝা যায়, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। থাকলে তখনই সে পাল্টা গুলি ছুড়ত।

জোরে শ্বাস ফেলে পা ছড়িয়ে বসে চুরুট ধরালাম। তখন প্রায় সওয়া সাতটা বাজে। আটটায় আমাকে মুন লেকের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত টাউনশিপে মহামায়া পার্কে পৌঁছতেই হবে। কয়েক মিনিট চুরুট টানার পর উত্তেজনাটা চলে গেল। তখন উঠে পড়লাম।

কুয়াশার মধ্যে শর্টকাট চলা কঠিন। তবু আমার লক্ষ্য ছিল মুন লেকে যাওয়ার বড় রাস্তায় পৌঁছনো। ল্যাম্প পোস্টের বাতিগুলি জ্বলজ্বল করছিল। পনের মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা পেয়ে গেলাম। পর্যটনের মুরসুমে এই রাস্তায় যানবাহনের অভাব নেই। কুয়াশার জন্য স্কুটার, অটোরিক্শা, ট্যাক্সি আলো জ্বেলে চলাচল করছে। তবে এখন সংখ্যায় কম। একটা অটোরিক্শা আমাকে দেখেই থেমে গিয়েছিল। তাতে দু'জন যাত্রী ছিলেন। ঠাসাঠাসি করে তাঁদের সঙ্গে যেতে হল।

মহামায়া পার্কে আটটার আগেই পৌঁছে গেলাম। এখনও পার্ক নিঝুম হয়ে আছে। কুয়াশায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা এক লাবণ্যময়ী যুবতীর উপমা মাথায় আসছিল। লেকের দিক থেকে যে গেট পার্কে ঢুকতে হয়, সে গেটের পাশে ইস্টার্ন লজের রাপ্তী অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে সে বলে উঠল, কি বিচ্ছিরি ফগ।

হাসতে হাসতে বললাম, বিচ্ছিরি ফগের জন্য তুমি কিন্তু একটা বিচ্ছিরি পোশাক পরেছ।

বিচ্ছিরি পোশাক কেন বলছেন? এই টুপি আর জ্যাকেট মাউন্টেনিয়াররা পরে।

তা পরে। তবে তুমি কেন পরেছ তা বুঝতে পারছি।

কেন?

তোমাকে বিচ্ছিরি মোটা দেখাবে এবং সহজে চেনা যাবে না।

আপনি তো চিনতে পারলেন।

তোমার চোখ দুটি দেখে।

আমার চোখে কি আছে?

হোটেল দ্য লেক ভিউয়ের রাপ্তীর চোখে যা নেই।

সে থমকে দাঁড়াল। পারমিতার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?

হয়েছে।

তাকে আপনি চার্জ করেননি যে, সে রাপ্তী নয়, পারমিতা এবং আপনি তা জানেন?

bengalidownload.com

তাকে চার্জ করার আগে আমার সব কথা জানার দরকার আছে। যাই হোক, পার্কের পরিবেশ এখন শোচনীয়। তাছাড়া আমার এখনই এক পেয়ালা কড়া কফি চাই। চলো। পার্কের উত্তরে একটা রেস্তোরাঁ আছে দেখেছি। একটু কস্টলি। কিন্তু কি করা যাবে?

বিত্তবানদের রেস্তোরাঁ 'ব্লু মুনে' এখনও তত ভিড় নেই। যারা ইতিমধ্যে লেকের ধারে জগিং করে এসেছে, তারা দাঁড়িয়ে কফি বা চা খাচ্ছে। কোণের দিকে গিয়ে মুখোমুখি বসলাম। কফি আর এক প্লেট গরম পকৌড়ার অর্ডার দিলাম।

ইস্টার্ন লজের রাপ্তী জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে বলল, আপনাকে দেখানোর জন্য এনেছি। এর মধ্যে তমাল এবং আমার বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আমার অফিসের আইডেন্টিটি কার্ড আছে।

খাম খুলে সেগুলি দেখে নিলাম। তারপর বললাম, হ্যাঁ। তুমিই আসল রাপ্তী।

তার মানে, কাল সন্ধ্যায় আপনি কি আমাকে—

সে রুষ্টমুখে কথা থামিয়ে দিল। একটু হেসে বললাম, তুমি বুদ্ধিমতী। এই কেসটা একটু জটিল। কারণ আসল এবং নকল মিলেমিশে আছে। যেমন ধরো এর সঙ্গে বিনয় শর্মা নামে একজন জড়িত। কিন্তু সে নাকি আসলে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রঘুবীর প্রসাদ।

রাপ্তী শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, ডঃ প্রসাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তমাল ইউনিভার্সিটিতে ওঁর ছাত্র ছিল। সেই সূত্রে আলাপ। খুব অমায়িক ভদ্র মানুষ। রাপ্তী জোর দেবার জন্য ফের বলল, হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্টলম্যান।

তাঁর বয়স অনুমান করতে পেরেছিলে?

এখন ষাটের বেশি তো বটেই। তবে ওঁকে ভীষণ রোগা দেখায়। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

তাহলে আমার দেখা লোকটি নকল ডঃ প্রসাদ। তমাল কি করে বল?

এইসময় কফি পকৌড়া এসে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে রাপ্তীর দিকে তাকালাম। সে একটা পকৌড়া আলতোভাবে তুলে নিয়ে কামড় দিল। তারপর বলল, তমালের একটা কিউরিও শপ আছে। অ্যান্টিক জিনিসপত্র বেচাকেনা করে। পারমিতা কলেজে আমার সঙ্গে পড়াশুনা করত। পরে মিউজিয়ামে চাকরি পেয়েছিল। সত্যি বলতে কি, পারমিতার সূত্রেই তমালের সঙ্গে আমার আলাপ এবং তারপর বিয়ে। বাট সি ইজ সো জেলাস্—

সে আত্মসম্বরণ করল। বললাম, তুমি তোমার স্বামীকে তাহলে ফলো করে এখানে এসেছ?

হ্যাঁ। তমাল বলেছিল সেই চোরাই সিলের সাহায্যে বুদ্ধমূর্তি উদ্ধারে যাচ্ছে। আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। কারণ এখানে আসার ক'দিন আগে সে টেলিফোনে পারমিতার সঙ্গে কথা বলছিল।

এই সময় বিনয় শর্মা এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। তারপর আমাকে দেখেও না দেখার ভাণ করে অন্যদিকের একটা টেবিলে বসল। ইশারায় রাপ্তীকে চুপ করতে বলে লোকটার দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

বিনয় শর্মা কিন্তু একমিনিট বসেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে গেল। রাপ্তীকে বসতে বলে আমি উঠে দরজায় গেলাম। কুয়াশা একটু কমে গেছে। দেখলাম, বিনয় শর্মা পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে জোরে হেঁটে চলেছে। বাঁকের মুখে তার ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। তার এই নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থানের কারণ কি বুঝতে পারলাম না।

রাপ্তীর কাছে ফিরে এলাম। রাপ্তীর চোখে প্রশ্ন ছিল। আস্তে বললাম, ওই লোকটাই সেই নকল ডঃ প্রসাদ। আমাকে বিনয় শর্মা বলে পরিচয় দিয়েছিল। পারমিতা আমাকে বলেছে, বিনয় শর্মা নামে একটা লোকের সঙ্গে ট্রেনে তাদের আলাপ হয়েছিল। সে নাকি বিজনেসম্যান।

রাপ্তী একটু পরে বলল, লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক মনে পড়ছে না।

মনে পড়তে পারে। চেষ্টা করো। তুমি তো আমাকেও—

রাপ্তী আমার কথার ওপর বলল, দেখেছি তা ঠিক। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে নেই।

বললাম, কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যাক। এখনই আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে।

আপনি আমার সব কথা শুনলেন না।

আর কি কথা আছে?

রাপ্তী আস্তে বলল, আমি এখানে তমালকে ফলো করে এসেছি, গত পরশু বিকেলেই তমাল তা টের পেয়েছিল।

কি ভাবে?

লেকের ধারে আমাকে দূর থেকে দেখেছিল। তখন পারমিতা ওর সঙ্গে ছিল। তাই শুধু একবার হাত নেড়েছিল। তমাল জানে, আই অ্যাম নট সো জেলাস।

তুমি গিয়ে ওকে এবং পারমিতাকে চার্জ করোনি কেন?

bengalidownload.com

সি ইজ ডেঞ্জারাস। ওর কাছে একটা ফায়ার আর্মস আছে। আমাকে দেখিয়েছিল।

হুঁ। আর কিছু?

চলুন। যেতে যেতে বলছি।

দু'পেয়ালা কফি এবং এক প্লেট পকৌড়ার জন্য পঁচিশ টাকা বিল মেটাতে হ'ল। কিন্তু এই বাজে খরচের ফলে একটা লাভ হ'ল। বিনয় শর্মার নাটকীয় প্রবেশ এবং প্রস্থান দেখলাম। এতক্ষণে মনে হ'ল, সম্ভবত ব্লু মুনে কারো সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমি থাকার দরুন ওর অসুবিধা হবে ভেবেই হয় তো চলে গেল।

পর্যটন কেন্দ্রের সেই অত্যুৎসাহী কর্মী কি তাঁর পরিচিত ডঃ রঘুবীর প্রসাদকে বলেছেন যে, জনৈক সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ তার কটেজের খোঁজে এসেছিলেন এবং সেইজন্যই কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য সে ব্লু মুনকে রেঁদেভ্যু করেছিল?

এটাই যুক্তিসঙ্গত পয়েন্ট। পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে লেক রোডে পৌঁছনো যাবে। পার্কে ঢুকে বললাম, কি বলবে এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারো রাপ্তী।

রাপ্তী বলল, আমি ওদের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। ওরা কিছুক্ষণ পরে লেক ভিউ হোটেলে ঢুকল। আমি তখন পূর্বদিকের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওই হোটেলে গেলাম। কাউন্টারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তমাল সেন এবং রাপ্তী সেন দোতলার ২২ নং স্যুইটে উঠেছে।

রাপ্তীর কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাচ্ছিল। সে জোরে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, একজন হোটেলবয়কে ডেকে তাকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, এই কাগজটা ২২ নং স্যুইটের তমাল সেনের হাতে গোপনে পৌঁছে দিতে হবে। যেন তাঁর স্ত্রী দেখতে না পায়। হোটেলবয়কে একটা স্লিপে লিখে দিলাম, 'ইস্টার্ন লজ'।

বাহ্। তারপর?

ইস্টার্ন লজ একটা সাধারণ হোটেল। আর কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে ওখানেই উঠেছিলাম। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সঙ্গে জিনস্, ব্যাগি শার্ট, শোয়েটার এসব এনেছিলাম। এদেশে মেমসাহেব সেজে ইংরেজি বললে, স্মার্ট দেখায়। লোকে একটু ভয়-টয় পায়— ইউ নো দ্যাট ওয়েল।

ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট।

রাপ্তী দম নিয়ে বলল, আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম ও আসবেই। কারণ একটা কৈফিয়তের দায় ওর থেকে যাচ্ছে। হি লাভস মি কর্নেল সরকার।

হুঁ। তারপর কি হল বল?

[illegible] একটা সিঙ্গল রুমে আমি আছি। একটা জানালা বইরের রাস্তার দিকে আছে। সেটা খুলে সেখানেই বসেছিলাম। কি বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ দেখি, তমাল আসছে। হাত নেড়ে ওকে ডাকলাম। লজের গেট তখন বন্ধ। আমার রুমের জানালার দিকে গাছের ছায়া ছিল। সে চুপি চুপি এসে বলল, বুদ্ধমূর্তি উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য পারমিতাকে সঙ্গে এনেছে। কিন্তু পারমিতা এখানে এসেই একটা লোকের সাহায্যে তাকে ব্ল্যাকমেল করছে। স্বামী-স্ত্রী সেজে একই ঘরে থাকতে বাধ্য করছে। ওর মূল উদ্দেশ্য তাকে সবসময় চোখের সামনে রাখা, যাতে সে গোপনে মূর্তি হাতিয়ে কেটে পড়তে না পারে। তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, পারমিতা নাকি তার সেই চেনা লোকটাকেই মূর্তিটা দশ লাখ টাকায় বেচতে চায়। আধাআধি শেয়ার। যাই হোক, আমি বললাম, এসব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তখন তমাল পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে আমাকে দিল। বলল, এর মধ্যে সেই চোরাই সিলটা আছে। খুলে আমি দেখতে পারি।

সিলটা তুমি দেখেছিলে আগে?

হ্যাঁ। আমাকেই তমাল ওটা একসময় লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল।

একই সিল?

একই সিল। তমাল বলল, সে খুব বিপদে পড়ে গেছে। পারমিতা ওকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে। তাই সিলটা আমার কাছে থাকলে তমাল নিরাপদ।

তাহলে সিলটা তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ। বলে রাপ্তী জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলল, সি ইজ ডেঞ্জারাস। এটা আপনার কাছে রাখুন। আমিও নিরাপদে থাকতে চাই।

প্যাকেটটা জ্যাকেটের ভেতর চালান করে দিয়ে বললাম, বিনয় শর্মা আমার সঙ্গে তোমাকে দেখে গেল। কাজেই তোমার নিরাপত্তার প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

কুয়াশা আরও কমে গিয়ে এখন নরম রোদ ফুটেছে। কথাটা বলে বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। মনে পড়ল, নকল রাপ্তী রাতদুপুরে তমালের চুপিচুপি বাইরে যাওয়ার কথা আমাকে বলেছিল।

রাপ্তী বলল, তা হলে আমার কি করা উচিত বলুন?

ওর প্রশ্নের জবাব দিতে যাচ্ছি, (তখনও বাইনোকুলারে আমি খুঁটিয়ে লেকের পূর্ব তীর দেখছি) এমন সময় নকল রাপ্তী অর্থাৎ পারমিতাকে দেখতে পেলাম। সে হনহন করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে।

রাপ্তী বলল, কি? কোন কথা বলছেন না যে?

বললাম, সঙ্গে এস। এখন কোন কথা নয়।

একটু পরে দেখি, পাইনবনের নীচে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে

বিনয় শর্মা এবং একটা ষণ্ডামার্কা লোক। রাপ্তী তাদের কাছে পৌঁছলে তিনজন মিলে ওপরে উঠতে থাকল। তারপর আর তাদের দেখতে পেলাম না। ওই ষণ্ডামার্কা লোকটাই কি তাহলে পূর্বের উপত্যকায় আমার পিছু নিয়েছিল?

অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। হোটেলের ম্যানেজার সতীশ কুমারকে সতর্ক করে দিয়েছি, কেউ যেন অসুস্থ তমাল সেনকে স্ট্রেচারে [illegible] বা অন্য কোনভাবে চিকিৎসার ছলে বাইরে নিয়ে যেতে না পারে। জোর [illegible] তিনি যেন তখনই পুলিশে খবর দেন এবং আমার নেমকার্ড দেখিয়ে আমার নির্দেশের কথা জানান। আমার বিশ্বাস পুলিশ কর্নেল শব্দটি দেখলে একটু [illegible] করবে।

রাপ্তীকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে আমার হোটেলে এস।

রাপ্তী চমকে উঠল। সে কি! ওখানে গেলেই তো পারমিতার চোখে পড়ে যাব।

তুমি তার চোখে না পড়লেও সে তোমার কথা সম্ভবত এতক্ষণে জেনে গেছে। তবে এখন সে হোটেলে নেই। ওই দেখছ পাহাড়ের ওপর পাইনবন। রাপ্তী ওখানে আছে।

আপনি কি বাইনোকুলারে তাকে দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে এস।

লেক ভিউয়ে ফিরেই প্রথমে গেলাম ম্যানেজার সতীশ কুমারের কাছে। আমাকে দেখামাত্র তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ২২ নম্বর স্যুইটের দিকে আমাদের একজন গার্ডকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলাম। মিসেস সেন বেরিয়ে যান সকাল সাতটা নাগাদ। আধঘণ্টা পরে তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসেন। আমাকে তিনি অনুরোধ করেন, আমি যেন দু'জন লোক দিয়ে ওঁর অসুস্থ স্বামীকে দোতলা থেকে নামিয়ে এনে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে সাহায্য করি। স্বামীকে উনি হাসপাতালে নিয়ে যবেন। আমি তখনই ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে দিলাম, আমাদের হোটেলে কিছু বিধিনিষেধ আছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরাই ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করি। আমাদের নিজস্ব ডাক্তার আছেন। তিনি সার্টিফাই করলে তবেই আপনার স্বামীকে আপনি বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

সতীশ কুমার একটু হাসলেন। মিসেস সেনের সঙ্গে তর্কাতর্কি হল। উনি রাগ করলেন। তখন আমি পাল্টা থ্রেট করে ওঁকে বললাম, ঠিক আছে। আমি আমাদের ডাক্তারকে ফোন করছি এবং সেই সঙ্গে থানায় জানাচ্ছি। আমাদের ডাক্তার এবং পুলিশ এলে তবেই আপনি মিঃ সেনকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের হোটেলে যাঁরা ওঠেন, তাঁদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই বিধিনিষেধ চালু আছে। কারণ এর আগে একবার আমরা এ ধরনের একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, মিসেস সেন রাগ করে আমাকে শাসিয়ে সেই ট্যাক্সিতে চলে গেলেন। তারপর আমি ২২ নং স্যুইটের ডুপ্লিকেট

চাবি নিয়ে ওপরে গেলাম। স্যুইটে ঢুকে দেখলাম, মিঃ সেন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে বিব্রত করলাম না।

সতীশ কুমারকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, সত্যিই কি আপনাদের নিজস্ব ডাক্তার আছেন?

অবশ্যই আছেন কর্নেল সরকার। আপনি যদি বলেন, তাঁকে খবর দিই।

তাই দিন। আর একটা কথা। ডাক্তার এলে আমি যেন জানতে পারি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবেন আমাকে?

বলব। তবে এখন নয়। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন প্লিজ।

সতীশ কুমার দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, দেখবেন স্যার, যেন আমাদের হোটেলের সুনাম নষ্ট না হয়।

ওঁকে আশ্বস্ত করে আমার স্যুইটে গেলাম। রাপ্তী উদ্বিগ্ন মুখে বলল, তমাল অসুস্থ। অথচ আপনি আমাকে তা বলেননি। কি হয়েছে ওর?

বলছি। তুমি বস। ততক্ষণে আমি সিলটা দেখে নিই।

রাপ্তী অস্থির হয়ে বলল, আমি তমালকে দেখতে চাই।

ডাক্তার এলেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর কাছে যাব। বলে ওর দেওয়া প্যাকেটটা বের করলাম। তারপর প্যাকেট খুলে দেখি, কালো কাগজে মোড়া একটা গোলাকার শক্ত জিনিস, রঙিন কাগজকুচির মধ্যে ঠাসা আছে। মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ব্রোঞ্জের চাকতি। চাকতিটা কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। মধ্যিখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব এবং চারদিকে কারুকার্যের মতো খোদাই করা লিপি।

banglaboi.blogspot.com

আতস কাচ দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেই চোখে পড়ল, পদ্মাসনের উপরে ও নীচে আঁকাবাঁকা কিছু রেখা। এক কোণে চন্দ্রকলাও আছে। চমকে উঠলাম। তাহলে 'চন্দ্র সরোবর' নামটিই কি মুন লেকের প্রাচীন নাম? পর্যটন বিভাগ সম্ভবত 'মুন লেক' কথাটির নিছক অনুবাদ করেননি। কোন গবেষকের কাছে জানতে পেরেই হয়তো লুপ্ত নামটি ফিরিয়ে এনেছেন। আঁকাবাঁকা রেখাগুলি জলের ঢেউয়ের প্রতীক, তাতে ভুল নেই।

আমি প্রাচীন লিপি নিয়ে একসময় কিছু পড়াশুনো করেছিলাম। আপাতদৃষ্টে এই লিপি কুষাণ যুগের ব্রাহ্মীলিপি মনে হল।

উত্তেজনা দমন করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখনই যেভাবে হোক, তমাল ও রাপ্তীকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর ট্রাঙ্ককলে দিল্লিতে সেন্ট্রাল আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কলকাতার জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া সিল কি করে আমার হাতে এল। সেই জবাবদিহির দায়িত্ব আমার কাঁধেই পড়বে। অবশ্য সিল চুরি যাওয়ার পর সম্ভবত দায়িত্বহীনতার অভিযোগেই পারমিতার চাকরি গিয়েছিল।

কাজেই তার কাঁধে দায়টা চালান করা যায় এবং আমাকে একটা মিথ্যা গল্প ফাঁদতে হয়।

তো পরের কথা পরে। সিলটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে রাখলাম। তারপর দেখলাম, রাপ্তী আমার দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। একটু হেসে বললাম, তুমি কি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে আগ্রহী?

সে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, না। আমি তমালকে দেখতে চাই।

দেখতে পাবে। ডাক্তার আসুক। তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

বলুন।

তোমাদের দু'জনকে যেভাবে হোক, যদি নিরাপদে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই?

রাপ্তী নড়ে বসল। প্লিজ কর্নেল সরকার। আমি সেটাই চাইছি। সেই কথাটাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আর আপনি পারমিতাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। সি ইজ ডেঞ্জারাস। কলকাতা ফিরে গিয়ে সে তমালের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে।

ঠিক আছে। তুমি একটু বসো। ডাক্তার আসুক। তারপর সব ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাক্তার এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। সতীশ কুমার, আমি এবং রাপ্তী ডাক্তারের সঙ্গে ২২ নং স্যুইটে গেলাম। ডুপ্লিকেট চাবিতে সতীশ কুমার দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

তারপর ডাক্তার বলে উঠলেন, হোয়্যার ইজ ইওর পেস্যান্ট মিঃ সতীশ কুমার?

বিছানা খালি। তমাল সেন নেই। সতীশ কুমার বাথরুমের দরজা খুললেন। সেখানে তমাল নেই। ব্যালকনির দরজা খুলে দেখলেন। সেখানেও কেউ নেই। সতীশ কুমার খাপ্পা হয়ে গার্ডকে ডাকলেন। বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে বলেছিলাম এই স্যুইটের দিকে লক্ষ্য রাখতে। কেউ ঢুকলে বা বেরুলে যেন আমি খবর পাই।

গার্ড কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমি পাঁচ মিনিটের জন্য বাথরুমে গিয়েছিলাম স্যার।

ডাক্তার অবাক হয়ে বেরিয়ে গেলেন। সতীশ কুমার বললেন, পুলিশকে জানাতে হবে কর্নেল সাহেব।

আমি সায় দিলাম। সতীশ কুমার বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম রাপ্তী পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

আমার পক্ষে অবশ্য এ ছিল অভাবিত সুযোগ। স্যুইটের ভেতরটা খোঁজাখুঁজি করে জানা গেল ডঃ রঘুবীর প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার প্রকৃত পরিচয়ের সূত্র যদি

মেলে, তাহলে তাকে মিসপার্সোনিফিকেশনের দায়েই আপাতত পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। তার বিরুদ্ধে তমালের অভিযোগ নিশ্চয় আইনের ধোপে টেকে। কারণ তমালকে সে মারধর করে দড়ি বেঁধে পাইনবনে ফেলে রেখেছিল এবং আমি তার সাক্ষী। কিন্তু তমাল নিপাত্তা হয়ে গেছে।

কালরাতে টেবিলল্যাম্পের আলোয় যে স্যুটকেসটা দেখেছিলাম, এখন সেটা গোছানো মনে হল। আমার সঙ্গে সবসময় দরকারি ছোটখাটো জিনিস থাকে। তা আগেই বলেছি। একটা খুদে স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে স্যুটকেসটা খুলে ফেলতে দেরি হল না। পারমিতার পোশাকে স্যুটকেসটা ভর্তি। কাজেই এটা পারমিতার বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ রাপ্তীর পাথরের মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার লক্ষ্য করলাম। সে মৃদুস্বরে বলল, তমাল তার স্যুটকেসে পারমিতার পোশাক পর্যন্ত রাখতে দিয়েছে? কর্নেল সরকার। এখন আমার মনে হচ্ছে, তমাল আমার সঙ্গে হয়তো প্রতারণা করেছে।

স্যুটকেসটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে বললাম, তাহলে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কেন?

সিলটা লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল। তাই গিয়েছিল।

কেন মন্তব্য করলাম না। এই স্যুটকেসে পুরুষ মানুষের কোন পোশাক নেই। চেনগুলো টেনে খুলে ভেতরে এমন কিছু পেলাম না যা বিনয় শর্মার কোন সূত্র জোগাতে পারে। এবার ওয়ার্ড্রোব খুলে দেখলাম, সেটা ফাঁকা। এতক্ষণে মনে হল, পারমিতা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য সব গুছিয়ে রেখেছে।

বিছানা উল্টেপাল্টেও কিছু দেখতে পেলাম না। টেবিলের ড্রয়ার ফাঁকা। নেহাত খেয়ালবশে নিচু খাটের তলায় উঁকি দিলাম। একটা কাগজের প্যাকেট দেখে খুব আশা করলাম, এর মধ্যে কিছু গোপনীয় জিনিস পেয়ে যাব। কিন্তু খুলেই হতাশ হলাম। পারমিতারই দুপাটি জুতো মাত্র।

জুতো খাওয়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং আমার মুখটা নিশ্চয় তুম্বো দেখাচ্ছিল, সেই সময় রাপ্তী টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বার করল। বুঝলাম, সেও এই তল্লাশিতে যোগ দিতে চায়।

সে বাস্কেট থেকে দলাপাকানো ছেঁড়া কয়েকটা খবরের কাগজ বের করল। তারপর নির্বিকার মুখে বলল, আপনি যদি চিঠিপত্র দেখতে চান, দেখাতে পারি।

সে ছেঁড়া এবং দলাপাকানো দুটো ইনল্যান্ড লেটার তুলে আমার হাতে দিল। তা পকেটে চালান করে বললাম, এই যথেষ্ট। এবার যেকোন সময় পুলিশ এসে যাবে। আমাদের এখনই বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে বিনা চাবিতে খোলা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না। ২২ নং স্যুইট থেকে বেরুলে সেই হোটেল গার্ড কেন কে জানে আমাকে সেলাম ঠুকল। তার মুখ কাঁচুমাচু

banglaboi.blogspot.com

ভাব লক্ষ্য করলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার সময় ছিল না। নিজের স্যুইটে ফিরে চিঠি দুটো নিয়ে বসলাম।

ডটপেনে লেখা ইংরেজি চিঠি। দুটো চিঠিই পারমিতাকে লেখা। অনেক পরিশ্রমে জোড়াতালি দিয়ে আতস কাচের সাহায্যে পড়ে বোঝা গেল, প্রথম চিঠিতে পারমিতাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলা হয়েছে। তলায় নামসই আছে। কিন্তু তা ছেঁড়াখোঁড়া এবং অস্পষ্ট। দ্বিতীয় চিঠিটাও একই হাতের লেখা। কাটাছেঁড়া শব্দ এবং বাক্যাংশ থেকে বোঝা গেল, ট্রেন সংক্রান্ত খবর দেওয়া হয়েছে। তলায় সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর 'এস এল'।

রাপ্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপচাপ বসে ছিল। ঘড়ি দেখে বললাম, তুমি এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে পারো। পুলিশ আসার আগেই আমি ব্রেকফাস্টে বসতে চাই।

রাপ্তী উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাই।

সে কি! কোথায় যাবে তুমি?

ইস্টার্ন লজে। তারপর বাস ধরে সরডিহা যাব। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা।

সরডিহায় কেন?

ওখানে আমার এক মামা থাকেন।

একটু হেসে বললাম, তুমি তমাল বেচারাকে ফেলে রেখে চলে যাবে?

রাপ্তী ফুঁসে উঠল। তমালের ওপর আর আমার এতটুকু আস্থা নেই।

তমাল তার স্যুটকেস পারমিতাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। তাই কি তোমার আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে?

কর্নেল সরকার। তমাল তার সঙ্গে একই ঘরে ছিল।

দরজায় কেউ নক করছিল। তাই সে থেমে গেল। মুহূর্তেই বুঝলাম, ওই ঘরে রাপ্তীকে নিয়ে গিয়ে ভুল করেছি। কোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর এই আচরণ সহ্য করা সম্ভব নয়। রাপ্তী যে ঘটনাটা একভাবে ভেবে রেখেছিল, প্রত্যক্ষ বাস্তব সেই ঘটনাটা বদলে দিয়েছে।

দরজা একটু ফাঁক করে দেখলাম সতীশ কুমার এবং একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সতীশ কুমার বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীরমেশ সিংহ। রমেশজী, ইনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

রমেশ সিংহ আমাকে সোজাসুজি চার্জ করলেন। এই হোটেলের ২২ নং স্যুইটের জনৈক তমাল সেন সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কি?

গম্ভীর মুখে বললাম, তমাল সেন আমার ভাগনি রাপ্তীর স্বামী। এখানে বেড়াতে এসে ওরা গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিল।

এখানে কোন গুণ্ডা নেই। আমরা গুণ্ডাদের শায়েস্তা করেছি।

তারা শায়েস্তা হয়নি। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে তমাল একটু আহত হয়েছিল। আমাকে জানিয়েছিল যে গুণ্ডারা পাল্টা মার দেওয়ার জন্য এই হোটেলে হানা দিতে পারে। তাই মিঃ সতীশ কুমারকে সতর্ক করে রেখেছিলাম। এখন তমালের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আমার ভাগনিও নিখোঁজ। আপনারা তাদের খুঁজে বের করুন।

রমেশ সিংহ আরও চটে গেলেন। ওঁরা থানায় জানাননি কেন?

অচেনা জায়গা বলে সাহস পয়নি। আপনাদের জানালে গুণ্ডারা আরও খাপ্পা হয়ে যেত। তাই চেপে গিয়েছিল।

আপনি কর্নেল?

হ্যাঁ। তবে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। কিন্তু আমি বৃদ্ধ মানুষ, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল। রমেশ সিংহ আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে সত্যি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল, তার প্রমাণ? আপনার পরিচয়পত্র দেখতে চাই।

নেমকার্ড বের করে দিলাম। সতীশ কুমার বিব্রত বোধ করেছিলেন। বললেন, রমেশজী, আমাদের হোটেলের সুনাম আছে। দয়া করে মিঃ সেন এবং মিসেস সেন সম্পর্কে একটু মনোযোগ দিলে বাধিত হব।

রমেশ সিংহ নেমকার্ড পড়ছিলেন। যথারীতি বললেন, নেচারিস্ট মানে?

যে প্রকৃতিকে ভালবাসে।

আপনার পরিচয়পত্র এটা নয়। এটা যে কেউ ছাপিয়ে নিতে পারে।

হাসতে হাসতে বললাম, আপনি কি ভাবছেন আমিই আমার ভাগনি আর তার স্বামীকে নিপাত্তা করে দিয়েছি?

সতীশ কুমার বললেন, রমেশজী, অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে।

রমেশ সিংহ আমার নেমকার্ড পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, আপনি পুলিশের অনুমতি ছাড়া হোটেল ছেড়ে যাবেন না।

কথাটা বলে উনি সতীশ কুমারের সঙ্গে ২২ নং সুইটের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক আমার ওপর কেন খাপ্পা হলেন, বুঝতে পারলাম না। রাপ্তীকে আমার ঘরে দেখলে উনি নির্ঘাত বিভ্রাট বাধাবেন। দ্রুত দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বললাম, রাপ্তী! চলো, আমরা বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট সেরে নেব। তাছাড়া শিগগির আমাকে একটা ট্রাঙ্ককল করতে হবে।

বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। করিডর থেকে নেমে লেকের দিকের রাস্তায় পৌঁছে বললাম, তোমার ইস্টার্ন লজে কি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা আছে?

amarboi.com

রাপ্তী শুধু বলল, কি বিচ্ছিরি।

সবকিছুই এখন সত্যি বড্ড বিচ্ছিরি রাপ্তী। কিন্তু কি আর করা যাবে?

লেকের ধারে গিয়ে বাইনোকুলারে পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড়ের গায়ে পাইনবনটা একবার খুঁটিয়ে দেখলাম। কাকেও দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে ইস্টার্ন লজের কাছাকাছি গেছি, হঠাৎ রাপ্তী বলে উঠল, তমাল ওখানে কি করছে?

রাস্তার ধারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় তমালকে বসে থাকতে দেখলাম। তার পাশে একটা সুটকেস এবং কোলের ওপর একটা ছোট ব্রিফকেস। চোখে সানগ্লাস। বটগাছটা ইস্টার্ন লজের উল্টোদিকে।

আমাদের দেখতে পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। রাপ্তী তার সঙ্গে কথা বলল না। সোজা লজের ভেতর ঢুকে গেল। তমালের কাছে গিয়ে বললাম, তুমি কি রাপ্তীর জন্য এখানে অপেক্ষা করছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আর একমুহূর্ত এখানে থাকতে চাইনে। পারমিতা আমার সঙ্গে এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমি চিন্তাও করিনি।

একটু হেসে বললাম, তুমি তার সঙ্গে একই ঘরে ছিলে। এতে রাপ্তী রেগে আগুন হয়ে গেছে। তবে তার রাগটা স্বাভাবিক।

তমাল মাথা নেড়ে বলল, একঘরে ছিলাম। তাতে কি হয়েছে? রাপ্তীকে তো আমি গত পরশু রাতে এসে সব বলে গেছি। রাপ্তী আধুনিক মনের মেয়ে। আমার ওপর তার আস্থা রাখা উচিত।

যাই হোক। তুমি নিখোঁজ হওয়ায় হোটেল থেকে পুলিশ ডাকা হয়েছে।

আপনি প্লিজ রাপ্তীকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আই ওয়াজ রিয়্যালি ট্রাপড বাই পারমিতা। বিনয় শর্মার সঙ্গে সেই যোগাযোগ করে এসেছিল। তমাল উত্তেজিত ভাবে ফের বলল, বিনয় শর্মাও কি সাংঘাতিক লোক তা আমি জানতাম না।

তুমি দশ লাখ টাকার লোভে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিলে। তমাল, টাকার লোভ সাংঘাতিক লোভ। আর এও সত্যি যে, তুমি পারমিতাকে ফটো তোলার ছলে পাহাড়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে পাহাড় থেকে নীচের খাদে ফেলে দেওয়া।

অমনি তমাল আমার একটা হাত চেপে ধরল। আমার মাথার ঠিক ছিল না কর্নেল সরকার। হ্যাঁ, আমি ওই মেয়েটার হাত থেকে বাঁচতে চাইছিলাম। ও যে কি সাংঘাতিক চরিত্রের মেয়ে আপনি জানেন না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।

বললাম, রাপ্তীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা তুমি কলকাতায় গিয়ে করবে। এখন চল, আমার খিদে পেয়েছে। রাপ্তী বলছিল, ইস্টার্ন লজের খাবার বিচ্ছিরি। কিন্তু কি আর করা যাবে?

আমরা ইস্টার্ন লজে ঢোকার আগেই রাপ্তী কাঁধে প্রকাণ্ড ব্যাগ ঝুলিয়ে এবং হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, কর্নেল সরকার। আমি বাস স্ট্যান্ডের ওখানে খেয়ে নেব। চলি।

সে তমালকে কোন কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে চলল। তমাল তাকে ব্যস্তভাবে অনুসরণ করল। এটা দাম্পত্য সমস্যা। আমি ভেবে দেখলাম, আমার বরাতে ইস্টার্ন লজের বিচ্ছিরি ব্রেকফাস্ট নেই। কারণ আর এখানে থাকার মানে হয় না।

একটা সাইকেল রিক্শা ডেকে আবার হোটেল দ্য লেক ভিউয়ে ফিরে এলাম। ডাইনিং হলে ঢুকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম। একটু পরে সতীশ কুমার এসে বললেন, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? রমেশজী খুব রেগে চলে গেলেন। আপনাকে গ্রেফতার করবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন।

বললাম, সতীশজী! আপনি অনুগ্রহ করে আমার নামে লখনউতে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করুন। নাম্বার আমি লিখে দিচ্ছি। খুব জরুরি কিন্তু।

সতীশ কুমার চিরকুটটা নিয়ে চলে গেলেন। ব্রেকফাস্টের পর কফিতে চুমুক দিয়েছি, তখন একজন হোটেলবয় এসে খবর দিল, ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।

টেলিফোনে সাড়া দিতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্নেল সরকার। আমি কিন্তু মোটেও অবাক হইনি যে আপনি চন্দ্র সরোবরে পাড়ি জমিয়েছেন। তবে যতটা জানি, ওখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গত ডিসেম্বরে বরফ পড়ার খবরও শুনেছিলাম।

এটা নভেম্বর মাস মিঃ সিংহ। যাই হোক, আমি আপনাকে মুন লেকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জরুরি আমন্ত্রণ।

ওঃ কর্নেল সরকার। আপনি কি ওখানেও খুনোখুনি বাধিয়ে ফেলেছেন?

না, না মিঃ সিংহ। একটা বুদ্ধমূর্তির ব্যাপার।

বুদ্ধমূর্তি! প্লিজ, একটু আভাস দিন।

বুদ্ধমূর্তির আড়ালে কি আছে এখনও জানি না। তবে আপনার সদলবলে আসা জরুরি। এখানে এক সিংহের পাল্লায় পড়েছি। মনে হচ্ছে তিনি আপনার চেয়ে পরাক্রমশালী। তবে সেটা কোনও সমস্যা নয়। আপনাকে আজ বিকেল নাগাদ দেখতে পাব কি?

ঠিক আছে। আপনি যখন ডাকছেন, তখন বুঝতে পারছি—

রাখছি মিঃ সিংহ। হোটেল দ্য লেক ভিউ। স্যুইট নাম্বার উনিশ।

ফোন রেখে সতীশ কুমারকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস সেন কি ফিরেছেন?

সতীশ কুমার উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, না। ওঁদের স্যুইটের দরজায় অন্য একজন গার্ড বহাল করেছি। ওঁদের কেউ দৈবাৎ ফিরে এলে যেন আমায় খবর

bengalidownload.com

দেয়। কারণ পশ্চিমের করিডর হয়ে ওঁরা কেউ ঢুকলে আমি দেখতে পাব না। কিন্তু কর্নেলসাহেব, আপনি রমেশজীকে বললেন, মিসেস সেন আপনার ভাগনি এবং তিনিও নাকি নিখোঁজ। অথচ মিসেস সেন তাঁর স্বামীকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে চাইলে আমাকে আপনার কথামতো বাধা দিতে হল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সময়মতো সবই বুঝতে পারবেন। বলে দোতলায় নিজের স্যুইটে ফিরে গেলাম। তারপর ব্যালকনিতে বসে হ্রদের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডের সন্ধানে সবে বাইনোকুলার তুলেছি, সেইসময় দেখলাম লেকের তীরে বিনয় শর্মা, পারমিতা এবং ষণ্ডামার্কা সেই লোকটা হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে চলেছে। তারা হোটেলের দিকে তাকালে আমাকে দেখতে পেত। কিন্তু তারা তাকাল না। কিছুক্ষণ পরে কটেজ এরিয়ার চড়াইপথে তাদের যেতে দেখলাম। তাদের এই ব্যস্ততার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

এই ষণ্ডামার্কা লোকটাই যে আজ ভোরে পূর্ব উপত্যকায় আমাকে অনুসরণ করেছিল এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিনয় শর্মা হলে সম্ভবত পাল্টা গুলি ছুড়ত। সে কাল দুপুরে পাইনবনের নীচে অর্কিডের ফুলটার কাছে আমাকে বলেছিল, তার কাছে ফায়ার আর্মস আছে। তখন ভেবেছিলাম মিথ্যা বলছে। এখন মনে হচ্ছে, আসলে পরোক্ষে সে আমাকে হুমকিই দিয়েছিল।

এদিকে রাপ্তী বলে গেছে, পারমিতার কাছে নাকি ফায়ার আর্মস আছে।

অতএব লখনউ থেকে পুলিশ সুপার রণধীর সিংহ এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। স্থানীয় পুলিশ আমাকে পাত্তা দেবে না। এ ধরনের দুষ্টচক্রের মোকাবিলা করতে হলে পুলিশের সাহায্য দরকার। শর্টকাট করতে হলে রণধীর সিংহকে সরডিহা হয়ে আসতে হবে এবং ঘণ্টা তিনেক সময় তো লাগবেই।

বাইনোকুলার তুলে আবার হ্রদের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডটিকে খুঁজতে থাকলাম। আমাকে চমকে দিয়ে পাখিটা জঙ্গল থেকে কালকের মতোই উড়ল এবং আজ তার গতি পূর্ব-দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে। একটু পরেই পাখিটা পাইনবনের শীর্ষে গিয়ে বসল।

তখনই বেরিয়ে পড়লাম। হ্রদের তীরে এখন ভিড় জমেছে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বিনয় শর্মা বা কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে কি না গ্রাহ্য করিনি। অবশ্য ওদের উত্তরের পাহাড়ে কটেজ এরিয়ায় যেতে দেখেছি। এদিকে আর আসতে দেখিনি।

অর্কিডের ফুলটিকে কেউ নির্মমভাবে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছে দেখে ব্যথিত হলাম। গুড়ি মেরে সতর্কভাবে পা ফেলে পাইনবনের কাছে পৌঁছলাম।

তারপর বাইনোকুলারে পাখিটাকে খুঁজতে থাকলাম। খুঁজতে খুঁজতে সেই পাথরটার কাছে গেলাম, যেখানে তমাল আহত অবস্থায় বন্দি হয়ে পড়েছিল।

এবার পাখিটা চোখে পড়ল। কিছুটা ওপরে একটা পাইনগাছের শীর্ষে বসে লম্বা ঠোঁট দিয়ে সে পাখনা চুলকোচ্ছিল। দ্রুত ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। হঠাৎ সে উড়ে পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা বেঁটে পাইনগাছের শীর্ষে গিয়ে বসল। চূড়ার নীচে ঢালু অংশটা ফাঁকা এবং ঘন ঘাসে ঢাকা। সেখানে অজস্র পাথরের চাঁই পড়ে আছে। কিন্তু যেভাবেই কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, তার চোখে পড়ে যাব। ক্যামেরার টেলিলেন্সের আওতা থেকে তার অবস্থান বেশ দূরে। আরও বাধা সামনাসামনি সূর্য।

তাই বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম। চূড়ার উত্তর দিকে ঘুরে যদি ওঠা যায়, পাখিটাকে নাগালে পেতেও পারি। কিন্তু কিছুটা গিয়ে দেখি, ওদিকে খাড়া পাথরের পাঁচিল। নীচে গভীর খাদ। বইনোকুলারে খাদটা দেখছিলাম। দেখার কোন কারণ ছিল না। আসলে এটা আমার নিছক অভ্যাস। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ মাত্র।

দেখতে দেখতে খাদের উত্তরে অনুরূপ খাড়া পাথরের পাঁচিলের গায়ে একটা চাতাল চোখে পড়ল। তার মানে, একটা পাহাড় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেন চিড় খেয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ উত্তরের পাঁচিল খাড়া হলেও স্থানে স্থানে ধাপবন্দি ছোট-বড় ব্যালকনির মতো চাতাল আছে। যে চাতালটা প্রথমে চোখে পড়েছিল সেটা সবচেয়ে প্রশস্ত। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, চাতালের শেষপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ফাটল এবং সেই ফাটলের কাছাকাছি খাড়া পাথরের গায়ে পদ্ম খোদাই করা আছে।

দেখামাত্র চমকে উঠলাম। বাইনোকুলার নামিয়ে খালি চোখে পদ্মটা আর দেখা গেল না। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তাহলে কি ওই ফাটলটা প্রাচীন যুগের কোন গুহা এবং সেই গুহার ভেতরই কি সেই বুদ্ধমূর্তি আছে?

সেক্রেটারি বার্ড আমাকে তার ছবি তুলতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু তাকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে, যদি সে আমাকে বুদ্ধমূর্তিটি আবিষ্কারের সুযোগ দিয়ে থাকে। সেই ছিন্নভিন্ন মৃত অর্কিডফুলের পাশ দিয়ে নেমে পাথর আর ঝোপঝাড়ে ভরা গিরিখাতে ঢুকলাম। এসব জায়গায় শঙ্খচূড় কেন, পাইথন সাপও থাকতে পারে। বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে সামনেটা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝেমাঝে পাহাড়ি অর্কিডের দেখাও পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন অর্কিডের চেয়ে সেই চাতালে পৌঁছনো জরুরি কাজ।

একটা দুর্গম গিরিখাতে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ প্রাণ গেলেও ঢুকতে চাইবে না, যদি না তার এ ধরনের অভিযানের কোন ট্রেনিং থাকে। কিছুক্ষণ পরে পাথরের কয়েকটা ধাপ এবং ছোট্ট চাতাল পাওয়া গেল। এরপর আর উঠে যেতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

banglaboi.blogspot.com

বড় চাতালটাতে উঠে ফাটলের পাশে খোদাই করা পদ্মটা আর খুঁজে পেলাম না। তখন বুঝলাম, এই পদ্ম দূর অতীতের কোন দক্ষ ভাস্কর এমন কৌশলে খোদাই করেছিল যে, নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকেই এটা চোখে পড়বে। দক্ষিণের পাইনবনের পাহাড় থেকে সম্ভবত প্রাচীন যুগের আগ্নেয়গিরির (মুন লেক তো প্রকৃতপক্ষে আগ্নেয়গিরিরই ক্রেটার বা জ্বালামুখ) শেষ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তার ফলে অনেকটা অংশ ফেটে চৌচির হয়ে খসে পড়েছিল এবং পাঁচিলের মতো একটাই খাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল। গিরিখাতে জমাট লাভার স্তর লক্ষ করেছি।

পদ্মটা দেখতে না পেলেও এখন আমি ফাটলের সামনে পৌঁছে গেছি। আগে বাইনোকুলারে তিনদিক দেখে নিলাম। তারপর ফাটলের ভেতরে টর্চের আলো ফেললাম। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখলাম, কুয়োর মতো একটা গহ্বর যেন পাতালে নেমে গেছে। তলা অব্দি আলো পৌঁছল না।

বুদ্ধমূর্তি এর ভেতর সত্যিই আছে না নেই, সেই কাজটা বরং কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক হবে। কিন্তু খোদাইকরা পদ্ম একটা আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকছে। যদি বিনয় শর্মা আমার মতোই বাইনোকুলার সংগ্রহ করে অভিযানে নামে?

পাহাড়ের গা বেজায় এবড়োখেবড়ো। মনে পড়ল, পদ্মটা দেখেছিলাম ফাটলের ডান পাশে আন্দাজ ফুট পাঁচ-ছয় দূরত্বে। বাইনোকুলারে দেখার হিসেবে দূরত্বটা অবশ্য বেড়ে যায়। পিঠে বাঁধা কিটব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি আর লোহার গোঁজ বের করলাম। পাহাড়ি এলাকায় গেলে এসব জিনিস এবং শক্ত দড়ি সঙ্গে নিই। ফাটলের ফুটখানেক তফাত থেকে হাতুড়ি দিয়ে গোঁজটা ক্রমাগত ঠুকে অনেক চাবড়া খসিয়ে ফেললাম। অতীতের এক দক্ষ ভাস্করের কীর্তি নষ্ট করার জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু একটা গোঁয়ার্তুমি আমাকে পেয়ে বসেছিল। হাতুড়ির ঘায়ে পাহাড়ের আর্তনাদ প্রচণ্ডভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বিনয় শর্মার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। যখন মনে হল, অনেকখানি অংশ এলোমেলো করে দিতে পেরেছি, তখন ক্ষান্ত হলাম। তারপর চাতাল থেকে চাবড়াগুলি পায়ে ঠেলে নীচে ফেলে দিলাম।

এবার ফের পাইনবনের অংশে গিয়ে দেখতে হবে, আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে কি না।

আর বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কালাপাহাড়ি কীর্তি করতে হয়েছিল এবং আমি সফল হয়েছিলাম।

হোটেলে ফিরলাম পৌনে দুটো নাগাদ। প্রচণ্ড পরিশ্রমে আমি তখন এতই ক্লান্ত যে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা কেন, একজন রোগাপটকা মানুষও আমাকে ধাক্কা দিলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম।

গরম জলে স্নান করার পর অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। বোতাম টিপে একজন হোটেলবয়কে ডেকে লাঞ্চ পাঠাতে নির্দেশ দিলাম।

রণধীর সিং-এর না এসে পৌঁছনো অব্দি কিছু করার ছিল না। লাঞ্চের পর ব্যালকনিতে বসে বাইনোকুলারে কটেজ এরিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। ১২৭ নম্বর কটেজ চোখে পড়ছিল। কিন্তু বারান্দা বা লনে কেউ নেই। বিনয় শর্মা কটেজ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠেছে কি? ওদের ব্যস্তভাবে ওদিকে যেতে দেখেছিলাম।

দরজায় কেউ নক করল। উঠে গিয়ে দরজা একটু ফাঁক করে যাকে দেখতে পেলাম, তার মুখে দাড়ি এবং চোখে সানগ্লাস ছিল। তখনই জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে রিভলভার বের করেছিলাম। অমনি সে ফিসফিসিয়ে উঠল, আমি তমাল! আমি তমাল!

তাকে চিনতে পারলাম। মুখে দাড়ি, চোখে সানগ্লাস, মাথায় টুপি এবং হাতে এখন শুধু সেই ব্রিফকেসটা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে বললাম, তোমার ছদ্মবেশে ত্রুটি আছে।

তমাল দাড়ি খুলতে যাচ্ছিল। বাধা দিলাম। সে বলল, আমার না এসে উপায় ছিল না।

সেই সিলটার জন্য তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাপ্তী তোমাকে সিলটা কোথায় আছে তা বলে দিয়েছে। তার মানে, তোমার সঙ্গে তার রীতিমত বোঝাপড়া হয়েছে।

তমালের চেহারায় যে বোকা-বোকা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, নকল দাড়ি-গোঁফের ফলে তা রাপ্তীর ভাষায় বিচ্ছিরি দেখাল। সে একটু হেসে বলল, পারমিতাকে আমি ফটো তোলার ছলে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম শুনে সে শান্ত হয়েছে। আপনি বাইনোকুলারে ঘটনাটা দেখেছিলেন। কাজেই আপনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। রাপ্তী আপনার কাছে এর সত্যতা যাচাই করলেই আমার সাতখুন মাফ।

গম্ভীর মুখে বললাম, তোমার মাফ হোক বা না হোক, একটা খুনের চেষ্টা আমি মাফ করতে পারছি না। নরহত্যা মহাপাপ।

তমাল নার্ভাস মুখে বলল, কিন্তু— কিন্তু আমি পারমিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ঝোঁকের মাথায়—

তুমি ওকে দিয়ে মিউজিয়ামের সিলটা চুরি করিয়েছ।

মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা। তমাল এবার জোর দিয়ে বলল, রাপ্তী রাগের চোটে কথাটা অন্যভাবে আপনাকে বলেছে। আসলে পারমিতার টাকার দরকার ছিল। তাই নিজেই চুরি করে [illegible] বেচেছিল। কারণ আমার কিউরিও শপ

আছে। তাছাড়া আমি অনেকদিন থেকে তার চেনাজানা। অচেনা কাকেও বেচতে সাহস পায়নি সে।

কিন্তু সে কেমন করে জানল ওতে চন্দ্র সরোবর এলাকায় প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির কথা আছে?

পারমিতা মিউজিয়ামে চাকরি করত। সব জিনিসের রেকর্ডের হিস্টরি মিউজিয়ামের ক্যাটলগে আছে। তমাল জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, আমি ওর কথার সত্যতা যাচাই করতে আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ রঘুবীর প্রসাদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি প্রাচীন লিপি পড়তে পারেন। তিনিই বললেন, চন্দ্র সরোবরের পূর্ব-দক্ষিণ তীরের পাহাড়ে গুহার মধ্যে বুদ্ধমূর্তি আছে এবং গুহার দ্বারে পাথর খোদাই করা আছে।

বিনয় শর্মার সঙ্গে কি করে তোমার যোগাযোগ হল?

পারমিতা এর আগেও মিউজিয়াম থেকে কয়েকটা জিনিস চুরি করে তাকে বেচেছিল। কিন্তু সিলটা চুরির সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। পারমিতা পরে আমাকে বলেছে, বিনয় শর্মা তখন হংকংয়ে ছিল।

তাহলে পারমিতাই বিনয় শর্মাকে তোমার কাছে—

তমাল ব্যস্তভাবে বলল, টাকার লোভ আমার নেই বলব না। পারমিতার লোভ কিন্তু আরও বেশি। সিলটা আমাকে মাত্র একশো টাকায় সে বেচতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে তার চাকরি গেছে। কিন্তু সে সিলটার দাম কত হওয়া উচিত, তা জানে। কারণ এর সঙ্গে কুষাণ যুগের একটা বুদ্ধমূর্তির সম্পর্ক আছে। তাই বিনয় শর্মা কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছিল। বিনয় শর্মা আমাকে বলল, মূর্তিটা পেলে সে দশ লাখ টাকা ক্যাশ দেবে। কিন্তু পারমিতা তার সঙ্গে চক্রান্ত করেছে তা জানতাম না।

একটা কথা। তুমি এখানে এসে কি সেই গুহা খুঁজে বের করতে পেরেছিলে?

আজ্ঞে না। আপনি বিশ্বাস করুন। তমাল করুণ মুখে বলল। যখন টের পেলাম ওরা দুজনে বুদ্ধমূর্তি নিজেরাই হাতাতে চায় এবং সেইজন্য সিলটাই ওদের দরকার, তখন আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার সৌভাগ্য, সেই সময় রাপ্তী আমাকে ফলো করে এখানে চলে এসেছিল।

এখন রাপ্তী কোথায়?

সরডিহায় তার মামার বাড়িতে আছে। ওর মামা ওখানকার ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার।

তাহলে তুমি সিলটা ফেরত চাইতে এসেছ তো?

সে তো আপনাকে বললাম।

সিলটা মিউজিয়ামেরই প্রাপ্য।

তমাল মুখ নামিয়ে বলল, আমার একশোটা টাকা গচ্চা গেছে। তাছাড়া শয়তান

বিনয় শর্মা আমাকে কিছু অ্যাডভান্স করার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন করে মারধর করল। আপনি গিয়ে না পড়লে সে আমার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার করত।

তোমার অপরাধের আক্কেল সেলামি। এভাবে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ তুমি বিদেশে পাচারে সাহায্য করেছ।

তমাল আমার পায়ে ধরতে এল। তার কাঁধ ধরে তুলে বসিয়ে দিলাম। সে মুখ নিচু করে বসে রইল।

চুরুট ধরিয়ে বললাম, তোমাকে একটুখানি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বলুন কী করব?

তোমাকে দাড়ি-টাড়ি খুলে কটেজ এরিয়ায় যেতে হবে। বিনয় শর্মা কোন্ কটেজে উঠেছে তুমি জানো। যদি তাকে কটেজে না পাও, লেকের ধারে ঘুরে বেড়াবে।

তমাল আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাবা। সে আমাকে গুলি করে মারবে।

না। সিলটা তার দরকার। কিন্তু সে কিংবা পারমিতা তোমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এলে তুমি তাকে বলবে, গুহাটা তুমি আবিষ্কার করেছ।

কিন্তু আমি তো—

চুপচাপ শোন। সে তোমাকে মেরে ফেলবে না। পারমিতাও তোমাকে গুলি করে মারবে না। কারণ ওদের দরকার শুধু বুদ্ধমূর্তি। এবার দেখ, আমি গুহাটা কোথায় তা এঁকে দেখাচ্ছি।

আপনি গুহাটা আবিষ্কার করেছেন?

করেছি। তুমি সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ওদের সেখানে নিয়ে যাবে। বলে হোটেলের প্যাডের একটা কাগজে গুহাটার ম্যাপ এঁকে তার হাতে দিলাম।

সে বলল, কিন্তু আমি এই হোটেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কি কৈফিয়ত ওদের দেব?

বলবে, সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো কর্নেল তোমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল। তাই তুমি গা-ঢাকা দিয়েছিলে। এও বলবে, কিভাবে যেন সেই বুড়ো কর্নেল তোমাদের উদ্দেশ্য পরে টের পেয়েছিল। তাই তোমাকে উদ্ধার করে আনলেও পরে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যাইহোক, তুমি এই পয়েন্ট থেকে একটা গল্প দাঁড় করাবে। পারমিতা জানে, হোটেলের ম্যানেজার ট্যাক্সি চাপিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। কাজেই তোমার কথায় ওরা আর সন্দেহ করতে পারবে না।

এইসময় দরজায় কেউ নক করল। চাপাস্বরে বললাম, কুইক। তুমি বাথরুমে ঢুকে যাও। যেই আসুক, আমি এখন বেরিয়ে যাব। তাতে তোমার বেরুতে অসুবিধে হবে না। তুমি ভালই জানো, ভেতর থেকে দরজা খোলা যায়। তুমি করিডর দিয়ে ছদ্মবেশেই নেমে যাবে কিন্তু। দাড়ি পরে খুলে ফেল।

pathagar.net

তমাল বাথরুমে ঢুকে গেল। আমি গিয়ে দরজা একটু ফাঁক করলাম। সাদা পোশাকে রণধীর সিংহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফিক্ করে হেসে সম্ভাষণ করলেন, গুড আফটারনুন কর্নেল সরকার।

উপসংহার

সেবার নভেম্বরে সেক্রেটারি বার্ডের খোঁজে মুন লেকে গিয়ে যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার মোটামুটি একটা বিবরণ দাঁড় করিয়েছি। এরপর কেউ যদি ভাবেন, বাকি কাজটুকু সহজে সমাধা হয়েছিল, তাহলে তিনি ভুল করবেন।

আসলে বিনয় শর্মা কত ধূর্ত এবং নৃশংস, তা ভাবতে পারিনি।

রণধীর সিংহকে হোটেলের পূর্বদিকের লনে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়েছিলাম। ওঁর জিপ অনুসরণ করে একটা পুলিশ ভ্যান এসেছিল সরডিহা থানা থেকে। ভ্যানে বেতারযন্ত্র ছিল এবং সেটা একটু দূরে বড় রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রণধীর সিংহ জানতেন, আমি তাঁকে আসতে বলা মানেই একটা নাটকীয় অভিযান। মুনলেক ফাঁড়ির সেই সাব-ইন্সপেক্টর রমেশ সিংহ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁকে বিব্রত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক করে ফেলেছিলাম।

এখানে সাড়ে চারটে বাজতেই সন্ধ্যা জাঁকিয়ে বসে। পাঁচটায় একজন দু'জন করে সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ গিয়ে পূর্বদক্ষিণের পাহাড়ি খাদে ঝোপঝাড় এবং পাথরের আড়ালে ওঁত পেতেছিল। আর একটি দল পূর্বের উপত্যকা দিয়ে ঘুরে খাদের পূর্ব দিকটা ঘিরে ফেলেছিল।

আমি, রণধীর সিংহ এবং কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল বড় চাতালটার কাছাকাছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওঁত পেতে ছিলাম।

ওদিকে কটেজ এরিয়ায় স্থানীয় ফাঁড়ির কিছু পুলিশ ১২৭ নম্বর কটেজের কানাচে-কানাচে থেকে লক্ষ্য রেখেছিল। ওদের কোন অ্যাকশান নিতে নিষেধ করা হয়েছিল। তবে ওরা কাকেও কটেজ থেকে বেরুতে দেখলে যেন তখনই একজনকে বেতার ভ্যানে খবর দিতে পাঠায়। বেতার ভ্যানের অফিসার খবর পেলেই তাকে শুধুমাত্র অনুসরণ করবেন।

এ ছিল একটা বড় ধরনের অপারেশন। কারণ জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ বিদেশে পাচারের কোন সুযোগ যেন কেউ না পায়, সরকারি নীতিটা ছিল যতকম কঠোর। এখনও অবশ্য তাই আছে। কিন্তু তখন পাচারের কারবার সর্বত্র ফুলিয়ে উঠেছিল। বাস্তবে যা হয়। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

সন্ধ্যা ছ'টা আর যেন বাজতেই চায় না। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে বসে আছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাহিম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়াটা মধ্যরাতের পর থেমে যায় এবং তারপর কুয়াশা জমতে শুরু করে।

একসময় ছ'টা বাজল। কিন্তু বিনয় শর্মাদের সাড়া নেই। প্রতিটি মুহূর্তে টর্চের আলো দেখার আশা করছি। কিন্তু একই নিবিড় অন্ধকার এবং হাওয়ার অদ্ভুত শনশন শব্দ।

সাড়ে ছ'টা বাজল। কেউ এল না। রণধীর সিংহ হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। চাপাস্বরে বললাম, আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক।

সাতটায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। উঠে দাঁড়ালাম। তারপর সাবধানে চাতালে উঠলাম। ওখান থেকে তিনটে দিক দেখা যায়। ভাবলাম, পাইনবনে বিনয় শর্মারা হয়তো অপেক্ষা করছে। সতর্কতার কারণে ওরা অপেক্ষা করতেই পারে।

কিন্তু পাইনবনে কোন আলো দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফাটলের দিকে পা বাড়াতেই কি একটা শুকনো খসখসে জিনিস জুতোয় ঠেকল। ওই মৃদু শব্দেই বুঝলাম জিনিসটা কাগজ জাতীয় কিছু। পেছন ফিরে বসে দু-হাঁটুর মাঝখান দিয়ে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলাম।

একটুকরো পাথর চাপা দেওয়া একটা কাগজ। তাতে আঁকাবাঁকা হরফে ইংরেজিতে যা লেখা তার সারমর্ম হল এই :

তোমার আদরের বাচ্চা এখন পাতাল গুহায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে খেলা করছে।

পড়ামাত্র শিউরে উঠলাম। আস্তে ডাকলাম, মিঃ সিংহ। সর্বনাশ হয়েছে।

রণধীর সিংহ উঠে এলেন। তারপর চিঠিটা পড়েই ফাটলে ঝুঁকে জোরালো টর্চের আলো ফেললেন। আমি বাইনোকুলারে সেই আলোয় পাতালগুহা দেখে নিলাম। তমাল কাত হয়ে নীচে পড়ে আছে। দেখামাত্র বললাম, মিঃ সিংহ। এখনই ওকে তুলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

রণধীর বললেন, ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার কথা নয়। তবে দেখছি কি করা যায়।

বললাম, আমার কাছে একটা দড়ি আছে। কিন্তু দড়িটা তত লম্বা নয়। আপনি শিগগির কাকেও টাউনশিপে পাঠান। ওখানে একটা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং সেন্টার দেখেছি। ওঁরা সাহায্য করতে পারেন। আর আপনার বাহিনীকে ফিরে যেতে বলুন। ওয়্যারলেস ভ্যান থেকে সরডিহা থানাকে ম্যাসেজ পাঠাতে হবে। সব রাস্তা আর রেলস্টেশন—

রণধীর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাকি সবকিছু আমার হাতে ছেড়ে দিন।

রণধীর সিংহের তুল্য দক্ষ পুলিশ অফিসার এ যাবৎ খুব কমই দেখেছি। তিনি তখনই একজন অফিসারকে সংক্ষেপে নির্দেশ দিয়ে টর্চের আলোর সংকেত করলেন। এদিকে ওদিকে কয়েকটা তীব্র সার্চলাইট জ্বলে উঠল। রণধীর চিৎকার করে বললেন, ডিসপার্স। ব্যাক টু দি আউটপোস্ট। অ্যান্ড ব্রিং হিয়ার টু সার্চলাইটস্।

সুশৃঙ্খলভাবে বাহিনীটি চলে গেল। দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল দুটি সার্চলাইট নিয়ে এল। সেই আলোয় পাতাল গুহার তলা বাইনোকুলারে দেখে আশান্বিত

amarboi.com

গেলাম। তলাটা বালিতে ভরতি এবং এক কোণ দিয়ে ঝিরঝিরে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল, ওটা একটা ভূগর্ভস্থ প্রস্রবন। পাহাড়ের তলায় ফাটল দিয়ে বেরিয়ে পূর্বের উপত্যকায় ঝরনা হয়ে বইছে।

তমালের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম না। বাইনোকুলারে যেটুকু লক্ষ্য করা সম্ভব হল, তাতে বলা চলে, ও এখনও বেঁচে আছে।

মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং সেন্টারের একদল তরুণ সদস্য এল প্রায় একঘণ্টা পরে। তারা সাহসী এবং উৎসাহী। তাদের সাহায্যে তমালকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে যখন লেকের তীরে পৌঁছলাম, তখনই একটি অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল।

রাত দশটা নাগাদ জ্ঞান ফেরার পর তমালের মুখে শুনলাম, বিনয় শর্মার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কটেজ এরিয়ায়। পারমিতাকে সে দেখতে পায়নি। শর্মা তাকে তখনই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গুহা দেখিয়ে দিতে বলে এবং তমালের কাঁধ ধরে ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটতে থাকে। তার ফায়ার আর্মসের নল তখন তমালের পাঁজরে ঠেকানো। এর ফলে তমাল তার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। তখন চারটে বেজে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে। কেউ টের পাচ্ছিল না ওভাবে একটা লোক আরেকটা লোককে কিডন্যাপ করার মতো নিয়ে যাচ্ছে। গুহার চাতালে উঠে তমাল কৌতূহলবশে একটু ঝুঁকেছে, তখনই বিনয় শর্মা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর তমালের আর কিছু মনে নেই।

আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তাহলে আজ যখন তাদের তিনজনকে ব্যস্তভাবে ফিরে যেতে দেখেছিলাম, তখন তারা নিশ্চয় গুহার খোঁজ পেয়ে বুদ্ধমূর্তি আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু পরদিন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে যোগাযোগ করে হাস্যাস্পদ হলাম। বহু বছর আগেই তাঁরা পাতাল গুহা থেকে বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। সেই মূর্তি দিল্লি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তবে তাঁরা এ সংক্রান্ত কোন সিলের কথা জানতেন না।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। কিন্তু বিনয় শর্মা, পারমিতা এবং সেই ষণ্ডামার্কা লোকটিকে পাকড়াও করা গেল না ভেবে আক্ষেপ থেকে গেল।

তমাল পরদিন বিকেলেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। হোটেল দ্য লেক ভিউয়ে আমার সুইটে ওকে নিয়ে এলাম। তারপর কফি খেতে খেতে পারমিতাকে লেখা চিঠিতে 'এস এল' স্বাক্ষরের কথা বললাম। শোনামাত্র সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে বলল, সুরেশ লাল। তাকে আমি চিনি। সে আমার কিউরিও শপ থেকে বহু অ্যান্টিক কেনাকাটা করে। অ্যান্টিক সংগ্রহ ওর হবি। কিন্তু বিনয় শর্মা অন্য লোক।

সুরেশ লালের চেহারা কেমন?

বেশ হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। গায়ের রঙ কালো। দেখলে গুণ্ডা গুণ্ডা মনে হয়।

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ। তাহলে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাই সুরেশ লাল।

তমাল বলল, কোথায় দেখলেন তাকে?

এখানেই দেখেছি।

এই সময় দরজায় কেউ নক করল। দরজা ফাঁক করে দেখি, একজন হোটেলবয় দাঁড়িয়ে আছে। সে সেলাম দিয়ে বলল, কর্নেল সায়েবের টেলিফোন আছে।

তমালকে বসিয়ে রেখে নীচে ম্যানেজার সতীশ শর্মার ঘরে টেলিফোন ধরতে গেলাম। সাড়া দিতেই রাপ্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্নেল সরকার। আমি রাপ্তী বলছি সরডিহা থেকে।

বলো ডার্লিং।

রাপ্তীর খুশিখুশি কথা ভেসে এল। বাহ্! তাহলে এবার আমিও আপনার জয়ন্ত চৌধুরীর পাশে ঠাঁই পেলাম। তো আপনি বিয়ে টিয়ে বলেছিলেন মনে আছে? এবার বলুন, আমার টিয়ে করা হাজব্যান্ডের খবর কি? ওকে নিখুঁত অবস্থায় ফেরত চাই।

পেয়ে যাবে। কাল মর্নিংয়ে তমালকে বাসে তুলে দেব।

শুনুন কর্নেল। জয়ন্তবাবুর মতো শুধু কর্নেলই বলছি কিন্তু।

বলো ডার্লিং।

ওনলি ফর ইওর ইনফরমেশন কিন্তু। তমালকে জানাবেন না। পারমিতার সঙ্গে আজ দুপুরে হঠাৎ এখানে আমার দেখা হয়ে গেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি এখানে কি করছ? ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। বলল এখনই ট্রেন ধরতে হবে। আমি কি করলাম জানেন?

বিচ্ছিরি কিছু করলে?

রাপ্তীর হাসি শোনা গেল। খুবই বিচ্ছিরি কর্নেল। চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে বললাম, এই মেয়েটা ডাকাত। আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর কাছে ফায়ার আর্মস আছে। বাজে লোকেরা ওকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল। সার্চ করে পুলিশ ওর হ্যান্ডব্যাগে সত্যিই একটা স্মল গান পেয়েছে। একটু আগে মামাবাবু খোঁজ নিয়ে এসে বলেছিলেন, ওই মেয়েটাকেই নাকি পুলিশ খুঁজছিল। মুন লেকের একটা হোটেলে ও স্যুটকেস ফেলে পালিয়ে এসেছিল। পুলিশ—

ট্রাঙ্ককলের লাইন কেটে গেল। সতীশ শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের স্যুইটে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালের বাসে তমালকে সরডিহা পাঠিয়ে হোটেল ফিরছি। পথিমধ্যে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রমেশ সিংহ মোটর বাইক থামিয়ে বললেন, আপনার খোঁজে বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছিলাম। পুলিশ সুপার সিংহসায়েব ওয়্যারলেসে আপনাকে জানাতে বললেন, বিনয় শর্মা এবং সুরেশ লাল নামে তার এক সঙ্গী সরডিহা রেলস্টেশনের রেস্টরুমে ধরা পড়েছে। বিনয় শর্মা একজন দাগি স্মাগলার। তার আসল নাম রাকেশ লাল। দুই লাল এখন কালো হয়ে গেছে....

pathagar.net

প্লাবন

ক্লারা ও প্রদোষ

ওরা যখন কলকাতা থেকে বেরোয়, তখন আকাশে ঘন মেঘ ছিল। ভোরবেলা থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কখনও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। বাতাস বইছিল এলোমেলো। আগের সন্ধ্যায় টিভিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে কী একটা আসতে পারে বলা হয়েছিল, গুরুদাস বুঝতে পারেননি। ভোরে যখন গ্যারেজ থেকে প্রদোষ গাড়ি বের করছিল, লাল টুকটুকে নতুন ফিয়াট মোটরগাড়ি, গুরুদাস বারান্দা থেকে বলেন, নর্থে জল জমতে পারে রাস্তায়। প্রদোষ কিছু বলল না দেখে ফের বলেন, বিটি রোডে পৌঁছুলে অবশ্যি অসুবিধে হবে না। পুত্রের মেমবউ ক্লারা, ক্লারা গ্যান্সলার রায়, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে অল্পস্বল্প লাগেজ গাড়ির ব্যাকসিটে বোঝাই করে। ক্লারার পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। সিঁথিতে বাড়াবাড়ি করা সিঁদুর। শ্বশুর-শাশুড়ির পায়ে গলবস্ত্রে প্রণাম করে এসে গাড়িতে ঢোকে। প্রদোষের গায়ে ফিকে লাল গেঞ্জি, পরনে জিনস, পায়ে বিদেশি কাউবয় জুতো। ক্লারা আস্তে প্রদোষকে বলে প্রণাম করে এলে না? প্রদোষ একবার ঘুরে শুধু বউয়ের দিকে তাকায়, মাছের চোখে। ক্লারা একটু হাসে। গাড়ি রাস্তায় পৌঁছুলে প্রদোষ বলে, সিগারেট। ক্লারা হাসিখুশি মুখে বলে, তুমি কি ভাবছ আমি সত্যিই সিগারেট ছাড়ি নি? তুমি এমন কথা কেন ভাবছ? প্রদোষ বলে, তুমি একটা—সে থামলে ক্লারা আহ্লাদী হয়ে বলে, বলো, বলো আমি একটা—প্রদোষ বলে না। মিটিমিটি হেসে নিজেই সিগারেট ধরায়। ক্লারা বৃষ্টির ছাঁট সত্ত্বেও জানালার কাচ নামিয়ে দেয় এবং নাকে আঁচল চাপা দেওয়ার ভঙ্গি করে।

এভাবেই গাড়িটা, টুকটুকে লাল রঙের ফিয়াট মোটর গাড়িটা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে কলকাতা পেরিয়ে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছুলে মেঘ ফুটে সূর্যের ছটা বেরিয়ে এল। রাস্তায় খানাখন্দ, পিচ উঠে ছত্রভঙ্গ স্টোনচিপস, মাঝে মাঝে বাম্প। তাই গাড়িটা সমান গতিতে ছুটতে পারছিল না। দুর্গাপুরনগর পৌঁছুতে ঘণ্টা চারেক, তারপর রাস্তাটা মোটামুটি ভালই, যদিও ট্রাক, বাস, টেম্পো যথেষ্ট। দু'জায়গায় যুবকরা গাড়ি আটকে পুজোর চাঁদা নিল—ক্লারা অকৃপণ এবং প্রদোষ ক্রুদ্ধ, একটা নদীর ব্রিজ পেরুনোর সময় বলল, দিস ইজ ইন্ডিয়া। ক্লারা বলল, আমার ভাল লাগছে। ওগুলো নিশ্চয় ধানক্ষেত?

প্রদোষ বলল, ধানক্ষেত না পাটক্ষেত আমি জানি না। ক্লারা বলল, একটু থামো। ওই লোকটাকে— লোকটার পাশ দিয়ে গাড়িটা জোরে বেরিয়ে গেলে ক্লারা বলল, তুমি একটা— প্রদোষ হাসতে লাগল।

আকাশ আবার ঘন মেঘে ঢেকে গেল। কিন্তু শরৎকালের মেঘের স্বাভাবিক গর্জন শোনা যাচ্ছিল না। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছিল না। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে গাড়িটা বহরমপুর পৌঁছুল কাঁটায় কাঁটায় একটায়। ক্লারা বলল, আমি ক্ষুধার্ত। প্রদোষ বলল, চলো, গঙ্গার ব্রিজে গিয়ে খাব। ক্লারা বলল, আঃ! আমি মাছ-ভাত খাব। দিদি বলছিল বহরমপুর হোটেলে মাছ-ভাত পাওয়া যায়। গাড়িটা তখন চলন্ত। প্রদোষ বলল, মৃণালদি একটা—। ব্রিজটা উঁচু, অত্যন্ত উঁচু। মাঝামাঝি গিয়ে গাড়ি থামাল প্রদোষ। ঘুরে হাত বাড়িয়ে কালো কিটব্যাগটা আনল। ক্লারা নদী দেখছিল। বলল, অবিকল মিসিসিপির মতো। প্রদোষ বলল, মোটেও না। লঞ্চ, স্টিমার, মোটরবোট দেখতে পাচ্ছ কি? ক্লারা বলল, তুমি মিসিসিপির খুব ভেতরটা দেখেছ কি? নিশ্চয় দেখনি! প্রদোষ লাঞ্চ-প্যাকেট বের করতে করতে বলল, ভেতরে মানে? ক্লারা যা বোঝাতে চাইছিল, পারল না। শুধু বলল, এদিকে পাহাড় দেখছি না। ভেবেছিলাম পাহাড় থাকবে। প্রদোষ বলল, কাম্‌ন্ বেবি! ক্লারা চটে গিয়ে বলল, তুমি অমন করে কথা বলবে না। প্রদোষ খাচ্ছিল। সেদ্ধ ডিম, সেদ্ধ আলু, মৃণালিনীর হ্যামবার্গার তৈরির চেষ্টা, মাছভাজাও ছিল। খান আষ্টেক ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ, দুটো মাংসের চপ প্রকাণ্ড, পেঁয়াজকুচি ও টমাটোসস, নুন-গোলমরিচ গুঁড়োর প্যাকেট। ক্লারা নাকের ডগা কুঁচকে বলল, দিদিকে কিছু বোঝানো যায় না। প্রদোষ বলল, মাছ তো আছে। খাও। অগত্যা ক্লারা একটা মাছভাজা আলতোভাবে চিবুতে থাকল। নিচে নদীর দিকে দৃষ্টি। তার মিসিসিপি নদীর কথা মনে পড়ছিল। এখন বৃষ্টিটা বন্ধ। মেঘ ভেঙে খানিকটা রোদ গড়িয়ে আসছিল। গাড়ি থেকে নেমে ক্লারা ভাল করে নদীটা দেখতে গেল। বুকসমান উঁচু রেলিঙে ভর করে ঝুঁকে রইল। কিন্তু রোদটা ঢেকে আবার বৃষ্টি এল ঝিরঝিরিয়ে। প্রদোষ ডাকল, ক্লারা! ক্লারা ভিজছে টের পেয়ে গরদের শাড়ি ভাল করে লেপটে জড়িয়ে হাসতে হাসতে গাড়িতে ফিরল। প্রদোষ ঘড়ি দেখে কিটব্যাগ থেকে বিদেশি বিয়ারক্যান বের করছিল। ক্লারা আগেই জানিয়ে দিল, সে শুধু বিশুদ্ধ জল খাবে। প্রদোষ হাসতে হাসতে বলল, তুমি একটা—

একটা রেললাইন পেরিয়ে যাওয়ার পর দুধারে বিশাল মাঠ, জল থইথই অবস্থা, ধানগাছের ডগাটুকু শুধু জেগে আছে। এই রাস্তাটা হাইওয়ে নয়। ঘুরে ঘুরে চলেছে কালো পিচের রাস্তা। মাঝে মাঝে কংক্রিট। কংক্রিটের ফাটলে জল। কোথাও গর্ত আর স্টোনচিপস্। তারপর জনহীন গ্রাম, অথবা রাস্তার ধারে টালি বা তেরপলের ঘরে জড়োসড়ো কিছু লোক, যাদের কয়েকবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। দুধারে ক্রমাগত ন্যাড়া উঁচু-উঁচু সব গাছ। ক্লারা জিগ্যেস করেছিল,

bengalkindle.blogspot.com

গাছগুলো এমন হল কেন? প্রদোষ বলেছিল, দেখতে পাচ্ছ না? ডাল কেটে নিয়েছে। ক্লারা বলেছিল, কেন? প্রদোষ বলেছিল, বুঝতে পারছি না। ক্লারা বলেছিল, তুমি ভুল পথে যাচ্ছ না তো? প্রদোষ বলেছিল, চেনা পথ। মামার বাড়ি এপথে অসংখ্যবার গেছি। চলো, তোমাকে দেখাচ্ছি, একবার মামার আমবাসাডার কোথায় অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। তখন দুপুর রাত্রি। পাশে একটা গাছ থাকায় গাড়িটা আটকে যায়। আসলে তখন রাস্তাটা নতুন। চাকা স্লিপ করেছিল। কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি— না, এমন নয়। রেইনিং ক্যাটস্ অ্যান্ড ডগস্, ইউ নো! ক্লারা হাসছিল। কেন হাসছিল প্রদোষ জানে না।

মামার অ্যাকসিডেন্টের জায়গাটা দেখাতে ভুলে গেল প্রদোষ। এবার অসমতল মাঠ। চড়াই ও উৎরাই। একটা বাঁকের পর রাস্তা ধীরে নেমেছে। দু-ধারে ধানক্ষেত উপচে জল রাস্তা ছুঁতে চেষ্টা করছে। নিচুতে সমতল কিছুদূর একধারের জল অন্যধারের ধানক্ষেতে গিয়ে পড়ছে। গাড়িটা পাতলা জলের স্রোত পেরুচ্ছিল সাবধানে। প্রদোষের মুখ একটু গম্ভীর। ক্লারার মুখে হাসি ঘন হয়ে লেগে আছে। খোঁপা থেকে আঁচল বার বার সরে যাচ্ছিল। মৃণালিনী খোঁপাটা যত্ন করে বেঁধে দিয়েছিল। জল পেরিয়ে যেতে হঠাৎ জোরালো ঝাঁকুনি খেল গাড়িটা। খোঁপাটা কীভাবে খসে গেল। ক্লারা গোছানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

রাস্তা আবার উৎরাইয়ে উঠতে লাগল। বৃষ্টিটা কমেছে। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। গতি বাড়িয়ে আবার একটা বাঁক, বাঁকের মুখে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন, হাসপাতাল, কিছু দোকানপাট, রাস্তার ওপর ভিড়। প্রদোষ তেতো মুখে বলল, আবার চাঁদা! ক্লারা পার্স খুলতে তৈরি হল। ভিড়টা একটা ট্রাকের সঙ্গে কথা বলছিল। ট্রাকটা চলে গেল। প্রদোষের গাড়ি এসে পৌঁছুলে ভিড়টা সামনে দাঁড়াল। প্রদোষ বলল, কী? চাঁদা চাই? ভিড়ের মুখপাত্র সে-কথায় কান না করে বলল, যাবেন না স্যার! তাদের কেউ কেউ গরদের শাড়ি পরা মেমসায়েবটিকে লক্ষ্য করছিল। তারা তত অবাক হয়েছে, মনে হচ্ছিল না। প্রদোষ বলল, কী ব্যাপার? মুখপাত্র বলল, তিলেডাঙ্গা ব্যারেজ থেকে জল ছেড়েছে। প্রদোষ বলল, তাতে কী হয়েছে? এক যুবক খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, ছেড়ে দাও নিবারণদা! গিয়ে দেখুন— ফিরে আসতে হবে। যুবকটি ক্লারাকে কেমন চোখে দেখছিল। তাই প্রদোষ, রাগী ও গোঁয়ার প্রদোষকুমার রায়, যাকে ভুল করে ক্লারা প্রথম প্রথম 'প্রদেশ' বলে ডাকত, বলল, সরুন। মুখপাত্র বলল, যাবেন কোথায় স্যার? প্রদোষ বলল, বাদলপুর। মোহিনীমোহন ত্রিবেদী আমার মামা। মুখপাত্র করজোড়ে বলল, নমস্কার স্যার! এম এল এ মশাইকে বলবেন, আমার নাম পাঁচুগোপাল মুখার্জি। তবে আমার মতে, রিস্ক আছে। মৌরীর ওপারে হোল এরিয়া ফ্লাডেড। মৌরী ব্রিজে উঠে যদি তেমন দেখেন, ফিরে আসবেন। আমার বাড়ি, ওই যে দেখছেন, ওই যে—

লাল টুকটুকে ফিয়াট গর্জে উঠে বেরিয়ে গেল। সেই কেমন-চোখ-করে ক্লারাকে-দেখা যুবকটি সম্ভবত 'শালা মেমওলা' বলে গাল দিল। ক্লারা হাসতে হাসতে বলল, প্রদোষ, অ্যাডভেঞ্চার বাংলায় কী? প্রদোষ কিছু বলল না। ক্লারা বলল, খুব ভাল লাগছে। লোকগুলি খুব ভাল। ওরা আমাদের সাহায্য করতে চাইল। প্রদোষ, তুমি ওদের কথা শুনলে না, সেটাও ভাল লাগছে। বলো না, অ্যাডভেঞ্চারের বাংলা কী।

প্রদোষকে ভালবেসে এবং ভারতকে ভালবেসে ক্লারা গ্যান্সলার এক বছর ধরে বাংলা শিখেছিল। ভালবাসা থেকে একটা ভাষা শেখা, তারপর বউ হওয়া— মোট তিনটে বছর লেগে গেছে। ক্লারা বিড়বিড় করে মুখস্থ করছিল, পাঁচুগোপাল মুখার্জি...পাঁচুগোপাল মুখার্জি...পাঁচুগোপাল মুখার্জি।

পাঁচ কিলোমিটার পরে মৌরী নদীর ব্রিজ। ব্রিজের উঁচু অংশে গাড়ি থামাল প্রদোষ। ক্লারা বেরুল। বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। প্রদোষ বেরিয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে দেখতে দেখতে বলল, রাস্তায় জল। কিন্তু ট্রাকটা তো যাচ্ছে। কী করব? তার প্রশ্নে ঈষৎ কাতরতা ছিল। ক্লারা বাইনোকুলারটা ওর হাত থেকে নিয়ে এক মিনিট দেখার পর বলল, ট্রাকটা চলে গেল। চলো, আমরা যাই। প্রদোষের ঠোঁট ফাঁক হল, কিছু বলার ইচ্ছা। কিন্তু সেই মুহূর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে এক ঝলক হলুদ আলো, তারপর ব্রিজের ডাইনে কাস্তে হাতে একটা প্রায়-ন্যাংটা লোক। লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ক্লারা ব্যস্তভাবে হাত নেড়ে তাকে ডাকতে লাগল, আপনি আসুন! আপনি শুনুন! প্রদোষও গলা চড়িয়ে লোকটাকে ডাকল, এই যে ভাই! শোনো, শোনো! লোকটা আসলে ভয় পায়নি। অবাক হয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল কী প্রশ্ন তাকে করা হবে। তাই সে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলতে লাগল, তিলেপাড়া বেরেজের জল ছেড়েছে। নাবালের গাঁগেরাম ভেসে গেছে। ওই যে বাঁধ দেখছেন, দেখে এলাম এক্ষুনি, বাঁধে ফাটল ধরেছে। আর দেরি করবেন না। যাবেন তো চলে যান। যান, যান! সে কাস্তে নাড়া দিতে দিতে কথা বলছিল। মেমসায়েব দেখছিল। গরদের শাড়ি পরা মেমসায়েব সে এই প্রথম দেখল। প্রদোষ বুঝতে পারছিল, লোকটি— এই প্রিমিটিভ, প্রায়-ন্যাংটা, যদিও অবাক, তাদের খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। সে গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিল এবং রেগে গিয়ে দেখল, ক্লারার হাতে ক্যামেরা এবং ক্লারা লোকটির ছবি তুলল। লোকটি হলুদ দাঁত বের করেছিল। ক্লারা গড়িতে ফিরে হাসিখুশি মুখে বলল, লোকটা ভাল। গাড়ি চলতে থাকার সময় সে লোকটার উদ্দেশে হাত নাড়ল। লোকটা সভ্যতা বোঝে। সে তার কাস্তেটা নাড়তে থাকল। ব্রিজের পর ঢালুতে নামতে নামতে ক্লারা জানালা দিয়ে মুখ বের করে মুখটা ঘুরিয়ে সামনে হাত নাড়ছিল। জলের প্রথম স্পর্শে ফিয়াট মৃদুগতি হল। কিংক্রিটস্ল্যাবে চাকা মাঝে মাঝে স্লিপ করছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর প্রদোষ বলল, জল বাড়ছে। ডাইনে জড়াজড়ি

banglaboi.com

করে থাকা ঝোপজঙ্গল, বাঁদিকে ডুবুডুবু ধানক্ষেত। ক্লারা ঝুঁকে জল দেখছিল। বলল, স্রোত আছে। প্রদোষ ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। তার ভুরু কুঁচকে গেছে। কারণ জলটা ক্রমশ বাড়ছে এবং স্রোতটা জোরালো হচ্ছে। গাড়িটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ শব্দ করছে। একখানে থেমে গেল। প্রদোষ বলল, ইমপসিব্‌ল। ব্যাক করতে হবে। ক্লারা বলল, সে কী! প্রদোষ ব্যাকগিয়ার টানল। গাড়িটা পিছু হাটছিল। হটতে হটতে গোঁ গোঁ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল। প্রদোষ ঠাণ্ডা মাথায় বলল, কারবুরেটারে জল ঢুকেছে।

সে নেমেই হাঁটু জল। সামনে এগিয়ে ঢাকনা তুলে ইঞ্জিনের ভেতর মাথা ঝুলিয়ে দিল। ক্লারা বলল, আমি দেখছি। ক্লারা জলে শাড়ি ভিজিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এল। দেখেই বলল, নিরুপায়। প্রদোষ, আমরা এক কাজ করতে পারি। প্রদোষ শুধু ঠাণ্ডা মাথায় বলল, কী? ক্লারা বলল, ঠেলে ব্রিজে নিয়ে যাওয়া কষ্ট নয়, পরিশ্রম হবে। দু-জনে ঠেলতে লাগল সামনে থেকে। প্রদোষের একহাতে স্টিয়ারিং। কিন্তু জলটা পেছনেও বেড়েছে। বাড়ছে। স্রোত জোরালো হচ্ছে। হাঁটু ছাড়িয়ে জল উঠলে প্রদোষ গলার ভেতর বলল, ইমপসিবল! ক্লারা দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কী? প্রদোষ চমকে উঠেছিল। বলল, কী? ক্লারা আঙুল তুলে রাস্তার ঝোপজঙ্গলের দিকটা দেখাল। প্রদোষ বলল, এ মাউন্ড! ক্লারা বলল, গাড়িটা থাক। চলো, আমরা ওখানে যাই। তুমি বলছিলে পাহাড় নেই। ওই তো পাহাড়। প্রদোষ করুণ হাসল। আহা, পাহাড় নয়, ওটা একটা মাউন্ড— ঢিবি। ক্লারা ব্যস্তভাবে বলল, দেরি কোরো না। জিনিসগুলি তুমি নাও, আমি নিই। চলো, আমরা ওখানে যাই। জল খুব বাড়ছে। এই দেখ জল কোথায় উঠেছে। তার মুখে হাসি। সে গাড়ির দরজা খুললে জল ঢুকে গেল। তার কিটব্যাগ আর মালপোয়ার হাঁড়িটা সে নিল। ক্যামেরা আর তার ব্যাগটা জলের ভেতর খুঁজে পেল না। প্রদোষ হতবাক দাঁড়িয়ে। ক্লারার তাড়ায় সে তার ব্রিফকেসটা তুলে নিল। যখন দু-জনে জলের ভেতর অনেকটা এগিয়ে গেছে, প্রদোষের মনে পড়ল বিয়ারক্যান ভর্তি প্যাকেটটার কথা। বলল, যাক গে! ক্লারার শাড়িটা অসুবিধায় ফেলেছে। জল এদিকে এক কোমর। জঙ্গলে ঢাকা ঢিবিটার কাছে পৌঁছুতে জল বুক ছুঁল। কিন্তু ক্লারা হাসছিল। সামনে পায়ে-চলা, হলুদ, ন্যাড়া একটা পলি রাস্তা উঠে গেছে। দু ধারে শ্লেটপাথরের স্ল্যাব পড়ে আছে। বোঝা গেল, এগুলো একদা সিঁড়ির ধাপ ছিল। খানিকটা উঠে প্রদোষ বসে পড়ল। ক্লারা তাড়া দিল, ওঠ! কিন্তু সেও পা বাড়াল না। ঘুরে দেড়শো মিটার দূরে খোলামেলা এবং জলেঢাকা রাস্তায় গাড়িটা, লাল টুকটুকে ফিয়াট গাড়িটা দেখতে লাগল। গাড়িটা ভাসছে কি-না বোঝা যাচ্ছিল না। প্রদোষ চুপ। ক্লারা আবার তাকে তাড়া দিল। কারণ বৃষ্টি এসে গেল আবার। প্রদোষকে উঠতে হল। উঠে দাঁড়িয়ে সে আস্তে বলল, শিট! ক্লারা ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি একটা—

গাড়িটা, লাল টুকটুকে মোটর গাড়িটা দুলছে। বাঁদিকে সামান্য দূরে শাদা ব্রিজটার দিকে চাকা। ঝর ঝর, প্রপাতের মতো গর্জন। গর্জন হঠাৎ থেমে জলের শব্দ। উঁচু হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো পালে পালে ঢেউ আসছে। গাড়িটা দুলতে দুলতে একপাশে কাত হতে হতে ভেসে যেতে থাকল। অতল ধানক্ষেতের ভেতর একটা নিচু গাছের গুঁড়িতে একটুখানি আটকে থাকার পর গাড়িটা, লাল টুকটুকে মটর গাড়িটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। ভাসতে ভাসতে, ওল্টাতে ওল্টাতে, এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ক্লারা বলল, আমি দুঃখিত। প্রদোষ শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে বলবে ভাবছিল, তোমারই জন্য গাড়িটা গেল। তুমি ভারতের গ্রামের পুজো দেখতে জেদ ধরেছিলে, আমি না। ঢিবিটা উঁচু। প্রদোষ ক্লান্ত। ক্লারা চমৎকার উঠছে। দু ধারে ভাঙাচোরা পাথরের স্লাব। একটা ধ্বংসাবশেষ। গাছপালা ঝোপঝাড় ফুঁড়ে বৃষ্টি নেমেছে। সামনে ভাঙা নিচু পাথরের দেয়াল, মধ্যিখানে খালি পায়ে-চলা রাস্তা। ক্লারাকে ভেজা শাড়ি জড়ানো কিম্ভূত প্রাণী দেখাচ্ছিল। ক্লারা খুব মজা পাওয়ার মতো করে বলছিল, খুব ভাল। খুব ভাল। তখন প্রদোষ বলল, তুমি একটা—

ডাঃ ব্রজহরি কুণ্ডু

ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু, কাঁদরা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনপ্রিয় নতুন ডাক্তার, বাহান্ন-চুয়ান্ন বছর বয়স, অনিবার্যভাবে মাথায় টাক, বেঁটে, নাদুসনুদুস, সারাক্ষণ খুশি খুশি ভাব, মুখে ও হাতে বরাভয়, বৃষ্টিবাদলা অগ্রাহ্য করে বর্ষাতি ও টুপি পরে সাইকেল চেপে জিতপুরের কালোবরণ মণ্ডলমশাইকে দেখতে গিয়েছিলেন। দূরত্ব তিন কিলোমিটার, তেমন কিছুই না। তাছাড়া তিনি কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। আইন মেনে চলেন। ঘোর নীতিবাগীশ। রোগীদের হিতোপদেশ দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ ওষুধ-পথ্যের সঙ্গে চারিত্রিক ও আচরণীয় সব কিছু। তাঁর নিজস্ব একটি জীবনদর্শন আছে। মুমূর্ষু মণ্ডলমশাইকে তিনি বলছিলেন, প্রতিটি মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝলেন মণ্ডলমশাই, শুধু সেই জায়গাটুকু যদি সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পারে, তাহলেই সারা পৃথিবীটা সুন্দর হয়। বাসযোগ্য হয়। অবশ্য এই বাক্যটি ব্রজহরি কোন বইয়ে পড়ে নোটবইয়ে টুকে রেখেছিলেন। মৃতপ্রায় মণ্ডলমশাই বলেছিলেন, খালি মাথাটা কেমন করছে— এই মাথাটা!

মণ্ডলমশাইয়ের বড়ছেলে বারীন্দ্র প্রাইমারি স্কুল-শিক্ষক। সদর দরজার কাছে ব্রজহরির হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে ব্রজহরি খুব চটে গেলেও হাসলেন। তুমি তো জানো বারীন্দ্র, সরকারি রেটের বাইরে আমি এক পয়সা নিইনে। তুমি আমাকে চারটে টাকা দাও।

বারীন্দ্র জিভ কেটে বললেন, ও— কী কথা ডাক্তারবাবু! এই দুর্যোগে বেরিয়েছেন, আমাদের সৌভাগ্য।

ব্রজহরি কিছুতেই নেবেন না। সাইকেলটি মণ্ডলমশাইদের বাড়ির মাহিন্দার

BanglaBook.org

কাঁধে বয়ে আনছিল। গ্রামের পথে প্রচুর জলকাদা। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বারীন্দ্র ছাতা মাথায় ডাক্তারবাবুর পেটমোটা ব্যাগটা বয়ে আনছিলেন। পিচ রাস্তার মোড়ে পৌঁছে বললেন, খুব দুঃখ পাব, ডাক্তারবাবু!

ব্রজহরি পিচে গামবুট ঠুকে নোটটা নিলেন এবং পকেট থেকে তিনটে দু টাকার নোট বের করে মাহিন্দার কানাইকে দিতে গেলেন। কানাই সাইকেল নামিয়েছে সবে, জোরে চেঁচিয়ে উঠল, না, না! ঠিক এই সময় বৃষ্টি ও বাতাসের ভেতর দিয়ে মণ্ডলমশাইদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার কোলাহল ভেসে এল। বারীন্দ্র ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, ওই যাঃ! বলেই প্যাচপেচে কাদায় দৌড়তে শুরু করলেন।

কানাই টাকাগুলো কোমরের কাপড়ের ভাঁজে চালান করে দিয়ে ফিক করে হাসল।

ব্রজহরি ভুরু কুঁচকে বললেন, হাসছ কেন হে তুমি? মানুষের মৃত্যু হলে হাসতে নেই। যাও, গিয়ে দেখ।

কানাই গম্ভীর মুখে বলল, সে-আপনি কী জানবেন ডাক্তারবাবু? ওই যে কাঁদছে শুনছেন, আমি গাঁ জুড়ে হাসি শুনছি। শালা মোড়লমশাই গাঁসুদ্ধু জ্বালিয়ে শেষ করেছে। আমাকেও!

ব্রজহরির সাইকেল চাপাটা দেখার মতো। হ্যান্ডেল ধরে কিছুদূর দৌড়ে যান, তরপর প্যাডেলে একটা পা রাখেন, আরও কিছুটা ওই অবস্থায় দৌড়ান, তারপর সিটে চেপে বসেন। কানাই একটা মানুষের মৃত্যুতে হেসেছে, তাকেই ছ-টাকা, বখশিস বলা চলে না, সাইকেল বওয়ার মজুরি বাবদ দিয়েছেন, এটা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তদুপরি ওই কুৎসিত গাল। মনে হল, ওকে দুটো টাকা দেওয়া উচিতে ছিল।

রাস্তাটা ততবেশি চওড়া না। একটা ট্রাক আসছিল সামনে থেকে। প্রচণ্ড গতিশীল খালি ট্রাক। ট্রাকের পেছনে তেরপল মুড়ি দেওয়া লোক উঁকি দিচ্ছিল। কংক্রিট স্ল্যাব থেকে সাইকেল নামাতে হল। লোকগুলো চেঁচিয়ে তাঁকে কিছু বলে গেল। বুঝতে পারলেন না। ট্রাকটা চলে গেলে স্ল্যাবের উঁচু কিনারা দিয়ে সাইকেলের চাকা ওঠানো গেল না। বাঁকের মুখে বাঁশবনের কাছে স্ল্যাবের সঙ্গে সমতল হয়েছে কিনারা, সেখানে আবার রাস্তা ফিরে পেলেন। বৃষ্টিটা বাড়ল। জোরে বাঁক ঘুরে যেতেই দেখলেন রাস্তার ওপর দিয়ে হাল্কা জলের স্রোত। আন্দাজ হাত দশেক গিয়ে বুঝলেন জল গভীরতর হচ্ছে। তখন সাইকেল থেকে নামলেন। আশা ছিল, কিছুদূর এভাবে যেতে পারলে মৌরী নদীর ব্রিজের চড়াই অংশটাতে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু জল কোমর অব্দি এবং প্রচণ্ড টান। ব্রজহরি সাইকেল কাঁধে তুলে ধরলেন। বুঝলেন, তিনি বিপন্ন। জল সাইকেলটা ঠেলে দিচ্ছে তাঁর ওপর, সেই প্রবল চাপে তিনি ডাইনে সরে যাচ্ছেন ক্রমাগত। তখন সাইকেলটা মাথার ওপর ওঠানোর জন্য

তুলতেই ব্যাকসিটে ডাক্তারি ব্যাগটা চোখে পড়ল। ডাক্তার নিজের ডাক্তারি ব্যাগের কথা ভুলে যাবেন? ব্রজহরি সাইকেল ও ডাক্তারি ব্যাগের মধ্যে ডাক্তারি ব্যাগটাই বেছে নিলেন। সাইকেলটা ছেড়ে দিলে সেটা ওল্টটাতে ওল্টটাতে ভাসতে ভাসতে নিখোঁজ হয়ে গেল। ধূসর বৃষ্টিরেখার ভেতর কিছু স্পষ্ট নয়, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাঁদিকে এখানেই তো—ওই তো!

ব্রজহরি ডাক্তার ব্যাগটা মাথায় রেখে বর্ষাতিসুদ্ধ নিজের বেঁটে মোটাসোটা শরীরকে বয়ে নিয়ে জঙ্গলে ঢিবিটার দিকে পা বাড়ালেন, পা মানে গামবুট। প্রথমে ব্যাগটা ডাঙায় এগিয়ে দিলেন। তারপর আঁকুপাকু করে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে তুললেন। মসৃণ একটুকরো শ্লেটপাথরের স্ল্যাবে বসে একটু হাসলেন ব্রজহরি কুণ্ডু। কেন হাসলেন, তিনি নিজেই জানেন না।...

পুঁতি ও চাক্কু

বীরহাটার মোড়ে এলাকার নামী লোক হাজি বদরুদ্দিনকে পৌঁছে দিয়ে সাইকেল-রিকশোর সিট থেকে এক লাফে নেমে চাক্কু বলেছিল, আর দুটো টাকা বখশিস লাগবে হাজিসায়েব!

হাজি বদরুদ্দিন চাক্কুকে ভাল জানেন। দরকার হলে চাক্কু চাক্কুর মতোই তাঁর পেটে ঢুকে যাবে। টিপটিপে বৃষ্টির ভেতর ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে লম্বা-চওড়া, ঢিলে আজানুলম্বিত সবুজ পাঞ্জাবি, চেককাটা লুঙ্গি ও সাদা সচ্ছিদ্র আঁটোসাটো টুপি পরা ধর্মভীরু লোকটি ব্যাপক নির্জনতা লক্ষ্য করার পর একটি পাঁচ টাকা ও একটি দু'টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। শহরে মামলা ছিল আজ। ব্যাংক থেকে কিছু টাকাও তুলেছেন। দেওয়ানি মামলার শুনানির যা রীতি, গোরে ঢোকার পরও রায় দেওয়া হবে কি না অনিশ্চিত। তেতো হয়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শোনেন, বাস বন্ধ। রেডিওতে খবর হয়েছে তিলেঝাড়া ও মশালজোড় ব্যারেজে জল ছেড়েছে। এই সময় চাক্কুকে দেখে দোনামনা করে শিরীষতলায় এগিয়ে যান বদরুদ্দিন। চাক্কু সিগারেট টানছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, তবে ভাড়া লাগবে পাঁচ টাকা।

চাক্কুর এটা উপরিলাভ। সে আজ বৃষ্টিবাদলা হোক, পৃথিবী জলতল হোক, সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক, বীরহাটার এদিকে আসতই। কিন্তু সে যে আসতই, সেটা বলেনি হাজিসায়েবকে। পাঁচ মাইল রাস্তায় দু জায়গায় একটু জল ছিল। হাল্কা জলের স্রোত এধারের ধানক্ষেত থেকে ওধারের ধানক্ষেতে, তারপরের বার এধারের পাটক্ষেত থেকে ওধারের পাটক্ষেতে। চাক্কু একটু রোগা চেহারার জোয়ান হলেও গায়ে ও পায়ে প্রচণ্ড জোর।

মোড়ে হাজিসায়েবকে নামিয়ে চাক্কু নির্বিকার মুখে নোট দুটো নিয়ে নীল 'ফরেন' ফুলপ্যান্টের পকেটে চালান করে দিয়েছিল। সে যখন প্রকৃত রিকশোচালক,

BanglaBook.org

তখন সে ডোরাকাটা আন্ডারওয়্যার হাফপ্যান্ট হিসেবে পরে। গায়ে নীলচে সুতীর কলারওয়ালা ছেঁড়া গেঞ্জি চাপায়। রোদের দিন হলে একটা টুপিও। স্যান্ডেল জোড়া আটকানো থাকে হ্যান্ডেলের সামনে। কিন্তু আজ তার অন্য বেশ। ফুলপ্যান্টটা হাঁটু অব্দি গুটোতে হয়েছিল, তাহলেও তার গায়ে প্যারাশুট কাপড়ের চকরাবকরা ফুলহাতা জ্যাকেট। মাথায় ক্রিকেট দর্শকদের ব্যবহৃত টুপি। সামনে বাতাস ও বৃষ্টির ছাঁটে তাকে দস্তুরমতো লড়াই করে এগোতে হয়েছে। তাই বীরহাটার মোড়ে অশত্থতলায় দাঁড়িয়ে কাদা রাস্তায় হাজি বদরুদ্দিনকে প্রায় পালিয়ে যাওয়ার মতো হাঁটতে দেখে তার পস্তানি হয়েছিল, অনায়াসে দু টাকার বদলে পাঁচটা টাকা দাবি করতে পারত।

আরও এক মাইল কষ্ট করে এগিয়ে সে রিকশো থামায়। রিকশোটা রাস্তার কিনারায় নিয়ে যায়, দুটো চাকায় চেন আটকে তালা ঝোলায়। তারপর সিটের তলা থেকে ব্যাগটা বের করে। বাঁদিকের ধানক্ষেত ও পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আল রাস্তায় কোনাকুনি হেঁটে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মৌরীনদীর ধারে বাঁধে পৌঁছে যায়। জল বাঁধের কিনারা ছুঁয়েছে দেখে সে একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তাছাড়া ওপারটা যদ্দূর চোখ যায় সমুদ্র।

কিছুদূর চলার পর বাঁধের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ঝুপসি বটতলায় অবিশ্বাস্যভাবে চাক্কু দেখতে পায় পুঁতিকে। পুঁতি গুঁড়ির খোঁকলে সেঁটে দাঁড়িয়ে ছিল। তার শাড়ি ভিজে গেলেও তাকে চকচকে দেখাচ্ছিল। খোঁপা এবং টিপে তাকে নববধূ দেখে চাক্কু দাঁত বের করেছিল। পুঁতি বলেছিল, যাও। তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না।

চাক্কু ঘড়ি দেখে বলেছিল, একটুও বেটাইম হয়নি। সওয়া তিনটে বাজছে। আমার আসার কথা চারটেতে।

পুঁতি দু হাতে ওর ঘড়িপরা আঁকড়ে ঘড়িটা দেখে বলেছিল, আমার কি ঘড়ি আছে? মনিন্দের (মজুমদার) মশাইকে জিগ্যেস করলাম, কটা বাজে মশাই? বললে, টাইম জেনে কী করবি? খাবি, না মুখ ধুবি? পুঁতি খিলখিল করে হাসতে লাগল। শেষে তাড়া দিয়েছিল, চলো, চলো! এতক্ষণ মাসি পাড়া মাথায় করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কই, ওঠ! কী?

চাক্কুর একটু অন্য ইচ্ছে ছিল। জনহীন বটতলা, এক ঝলক রোদ্দুর হঠাৎ ফুটে মিলিয়ে গেল, বৃষ্টিটা থেমেছে, নিচে ভরা নদীর কলকল শব্দ, চকচকে পুঁতি স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়। সে পুঁতিকে টানলে পুঁতি টের পেয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। বলল, হুঁ, গাছে না উঠতে এক কাঁদি।

চাক্কু শ্বাসের সঙ্গে হাসল। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে খুঁজে সিঁদুরের মোড়ক বের করে বলল, এস। পরিয়ে দিই। সাক্ষী বটগাছ।

ঠিক এই সময় তাদের খুব কাছে বাঁধের ওপর দিয়ে নদী উপচে এল।

সামনে ফাটল। পুঁতি ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, না, না। এখানে নয়। বাঁধের গতিক দেখতে পাচ্ছ না? শিগ্‌গির চলো এখান থেকে।

চাক্কু গলার ভেতর বলল, চলো!

ওরা বাঁধ ধরে কিছুটা হেঁটেছে, পেছনে প্রচণ্ড শব্দে ধস ছাড়ল। প্রপাতের মতো জল পড়তে থাকল নিচু মাঠটাতে। পুঁতি ও চাক্কু হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। ডানদিকের মাঠটা দেখতে দেখতে জলময়। বৃষ্টি আবার এল ঝিরঝিরিয়ে। হিজল-জাম-জারুলের ঠাস বুনোট বাঁধের গায়ে কিছুদূর। তারপর আবার খোলামেলা। একটু দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে মৌরীনদীর সাদা ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল। পুঁতি দম আটকানো গলায় বলল, বিরিজে চলো বিরিজে!

কিন্তু ব্রিজের দিকে যেতেই সামনে আবার হুড়মুড় করে ধস, আবার জলপ্রপাত। চাক্কু পুঁতির হাত ধরে টেনে বাঁদিকের পাটক্ষেতে নেমে গেল। পাটক্ষেতের ভেতর পোকামাকড়, বনচড়ুইয়ের একটা ঝাঁক, ঢোঁড়া সাপ, দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে হাঁটু জল, কোমরজল, তারপর পাটক্ষেতের শেষে বুক জল। যত এগোতে থাকে, তত জল বাড়ে। বৃষ্টিতে সব ধূসর। জলের প্রচণ্ড টান। দুটিতে দুটি ব্যাগ এক হাতে মাথার ওপর তুলে সাবধানে পা বাড়ায়। তারপর পুঁতি চেঁচিয়ে ওঠে, দরগা! দরগা! চাক্কু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। তারা স্রোতের চাপে যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেটা একটা উঁচু বিশাল ঢিবি—ঘন জঙ্গলে ঢাকা। খোঁড়া পিরের দরগা।

প্রথমে ওঠে চাক্কু একটা ঝোপ আঁকড়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে তার প্রেমিকাকে টেনে তোলে। বড়-ছোট, উঁচু-নিচু লাইম কংক্রিটের চাঙড় ছড়ানো ঢালু পিঠে। গাছগুলো না থাকলে তারা নিচে গড়িয়ে পড়ে যেত। একটা চাঙড়ে বসে চাক্কু একটু হাসে। বলে, রিকশোটা—

পুঁতি বলে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। কই, সিগারেট থাকলে দাও, টানি।

চাক্কু বলে, পকেটের প্যাকেটটা ভিজে গেছে। টাকাগুলোও। দেখছ? বলে সে ব্যাগে হাত ভরে। থামো, আরেক প্যাকেট আছে। কিন্তু আগুন? দেশলাই কাঠিটার অবস্থা দেখ।

পুঁতি বলে, চলো! দরবেশবাবার কাছে যাই। আগুন পাব।

চাক্কু ওঠে। করুণ দাঁত বের করে বলে, শালা কানা নাকি হাত গুনতে জানে। দুটো টাকা নেবে তো নেবে, জিগ্যেস করব আমার রিকশোটা আছে না ভেসে গেল।

পুঁতি জিভ কেটেছিল। পা বাড়িয়ে বলে, ওই যে গাল দিলে বাবাকে—দেখবে তাও জানতে পেরেছে।

চাক্কু একটু ভড়কে গেল। সে সহজে ভড়কায় না। কিন্তু এখন দুঃসময়।

boiRboi.blogspot.com

বিপ্লবী নেতা ঘনশ্যাম রুদ্র

সত্তরের দশকে বিপ্লবী কৃষক পার্টির স্থানীয় নেতা ঘনশ্যাম রুদ্রের দশবছর জেল হয়েছিল। বেরিয়ে আসতে আশির দশক। কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু চুপচাপ থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সবসময় গোয়েন্দা পুলিশের গতিবিধি, স্থানীয় নৈরাজ্য ও বদমাইসি, খবরের কাগজের বিবিধ উত্তেজক খবর এবং তাঁর আদর্শবাদ অথবা স্বভাব, এইসব মিলে তাঁকে অস্থির করে ফেললে তিনি তাঁর মহকুমা শহরের পৈতৃক বাড়ি থেকে গা ঢাকা দেন। গ্রামে-গ্রামে গড়েতোলা পার্টি ইউনিটগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে এবং পার্টিকমরেডদের জঙ্গি যুবকরা কেউ জোতদারদের ভাড়াটে গুণ্ডা, কেউ খুনে ডাকাত বা ছিনতাইবাজ হয়ে গেছে জেনে খুব দমে যান। কিন্তু তিনি সহজে কিছু ছেড়ে দেবার পাত্র নন। কয়েক মাসের চেষ্টায় পূর্ব-পরিচয়ের খেই ধরে কয়েকটি গ্রামে এবার শুধু ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের ইউনিট গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এলাকায় শিক্ষিতের হার নগণ্য এবং দারিদ্র্যও ভীষণ। কিন্তু জোতদার ও প্রান্তিক চাষীরা আগের তুলনায় সংঘবদ্ধ। ফলে তাঁকে বার দুই খুন করার চেষ্টা হয়। তারপর পুলিশ পেছনে লাগে। আজ দুপুরে ক্ষেতমজুর নাকু শেখের বাড়িতে সবে খেতে বসেছেন, পুলিশ ঢোকার খবর হয়। খাওয়া ফেলে ঘনশ্যাম রুদ্রকে গা ঢাকা দিতে হয়। নাকু তাঁকে পাটক্ষেতের ভেতর পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

ঘনশ্যাম রুদ্র রোগা গড়নের মানুষ। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর প্রায়। তামাটে রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। লম্বা খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, বড়-বড় কান, চোখদুটি সুন্দর। তিনি চিরকুমার। তাঁর পরনে, খেতে বসার সময় ফিকে নীল লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিল। ব্যাগে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। পাটক্ষেতের পর ডাইনে ঘুরে মৌরীনদীর বাঁধে উঠবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু পুলিশের কথা ভেবে সোজা নাকবরাবর ধানক্ষেতের আলে হাঁটতে হাঁটতে সামনে দেখলেন অগাধ জল। মরিয়া হয়ে জলে নেমে বুঝলেন ভুল হয়েছে। জলে স্রোতের টান। কিন্তু ঘনশ্যাম রুদ্র সহজে দমে যান না। জল যত বাড়ে, তত রেগে যান। পা বাড়িয়ে অভিজ্ঞ ঘনশ্যাম আল খুঁজে এগোতে থাকেন। কখনও পা হড়কে ক্ষেতের গভীরে পড়ে যান, আবার ওঠেন আলের ওপর। এভাবে চলতে চলতে বৃষ্টি, বৃষ্টির পর পায়ের স্যান্ডেল জলের তলায় ফেলে আসা, তারপর হাতের ব্যাগ উঁচু করে কোমর জল ভাঙতে ভাঙতে সাঁতার জল এবং ঘনশ্যাম চিতসাঁতার দিতে থাকেন, ব্যাগটি উঁচুতে। একসময় হঠাৎ তাঁর মনে হয়, বিপ্লবের আগে কিছু গঠনমূলক কাজকর্মের জন্য অপেক্ষা করা দরকার, যে-কাজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থেই করবে। একহাতে প্রকৃতি, অন্য হাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করা পণ্ডশ্রম। বাঁধটা মজবুত হলে জোতদারদের লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবীদের যাতায়াত ও লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শক্ত মাটিও পাওয়া

যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর চটে গেলেন ঘনশ্যাম। পা নামিয়ে মাটি খুঁজলেন পেলেন না। ভয় হোল, কতক্ষণ এভাবে ভেসে থাকবেন এবং একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বেনই, তখন তাঁকে খুব আদিম ধরনের মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে! তারপরই জলের ভেতর কী একটা শক্ত জিনিসের জোর ধাক্কা খেয়ে ঘুরে ভেসে ডুবে যাচ্ছে এবং আবার ভেসে উঠছে এমন দুটো, তিনটে বা পুরো চারটে টায়ার, মোটর গাড়িরই টায়ার দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গলেন। একটা ভেসে যাওয়া উল্টেটা মোটরগাড়ি থেকে মরিয়া হয়ে তফাতে সরে গেলেন ঘনশ্যাম রুদ্র। এইসময় বৃষ্টিটা থেমে গেছে। আরও অবিশ্বাস্যভাবে মেঘের ফাঁকে রোদ্দুর— কিন্তু আবার রোদ্দুর মুছে জমাট মেঘ, তারপর ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি— ধূসরকার ভেতর কালো টানা, লম্বাটে একটা দেয়ালের মতো জিনিস। ঘনশ্যামকে স্রোত সেদিকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর মাটি পেলেন। দেখলেন এটা একটা বাঁশবন। কোমর জলে বাঁশঝাড়ের ভেতর যখন হাঁটছেন, তখন মনে পড়ল, পিচের রাস্তা আছে ওধারে।

কঞ্চি ও কাঁটাঝোপে তাঁর লুঙ্গি ও নিম্নাঙ্গ ক্রমাগত ছড়ে যাচ্ছিল। জ্বালা করছিল। বাঁশবন পেরিয়ে গিয়ে পিচের রাস্তার বদলে জলের রাস্তা দেখে একটু ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথমে। কিন্তু স্রোতটা পিচরাস্তার মহকুমা শহরের দিকেই বয়ে চলেছে। ঘনশ্যাম রুদ্র পুলিশ, বিপ্লব, এসব জরুরি ব্যাপার ছেড়ে হিসেব করছিলেন, ছ'মাইল দূরত্ব স্রোতে যদি ভেসেও চলেন, ঘণ্টা দেড়-দুই লাগবে। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তি, জলে ও স্রোতে ধাক্কা এবং আজগুবি ওল্টানো গুবরেপোকার মতো একটা মটরগাড়ির উপদ্রব, কোমরে ব্যথা, পা-অব্দি কাঁটাখোঁচে ছড়ে যাওয়া, তার চেয়ে বড় কথা অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির হাতে একজন বিপ্লবীর অপমৃত্যু হবে— রাগী সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে গিয়ে একটু তফাতে জঙ্গলে ঢিবিটা চোখে পড়ামাত্র ঘনশ্যাম হুড়মুড় করে জল ভেঙে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে জয়ী হলেন।

উঁচুতে উঠে যাওয়া ঢিবির মাটিতে ধেবড়ে বসে ব্যাগটা মাথায় রেখে শুয়ে পড়তে চাইলেন ঘনশ্যাম রুদ্র। মাথার দিকে টেরচা হয়ে আটকে আছে একটা লম্বাটে শ্লেটপাথর। কীসব আঁকিবুঁকি খোদাই করা আছে। এই ঢিবিটা বাইরে থেকে দেখা ঘনশ্যামের। শুনেছেন এটা পিরের দরগা। যাই হোক, আপাতত একটা আশ্রয়। পাথরটাতে ব্যাগ রেখে হাঁটু ভাঁজ করে আধশোয়া হলেন ঘনশ্যাম। দেখলেন, লুঙ্গি কয়েক জায়গায় ফর্দা-ফাঁই, কিছু ক্ষতচিহ্ন ধুয়ে গেলেও আবার রক্ত জমছে, তবে আগে শুকনো জামাকাপড় পরে নেওয়ার দরকার ছিল।

ইচ্ছে করছে না। মাথার ওপর ঝাঁকড়া একটা গাছ, বড়-বড় পাতা। বৃষ্টি

banglaboi.blogspot.com

আটকালেও পাতা থেকে মোটা ফোঁটা পড়ছে। কিন্তু শরীর ঘনশ্যামকে নড়তে দিচ্ছে না। চোখ বুজে আধশোয়া অবস্থায় রয়ে গেলেন। তাঁকে যথাযথ মড়া দেখাচ্ছিল।, ক্ষতবিক্ষত এবং ডাঙায় আটকে পড়া মড়া।

বাউল হরিপদ

গত শ্রাবণে ঝুলন পূর্ণিমার রাতে মহকুমা শহরের রাজবাড়িতে রাসের মেলায় হরিপদ বাউল তার কষ্টার্জিত তৃতীয় সাধনসঙ্গিনী হরিমতীকে হারিয়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেটা একটা গান, এবং বাউলরা যা কিছু করে, গানেই করে :

ভবের হাটে একলা হেঁটে চলো রে মোনকানা...

বাউলদের গান এরকমই সাদাসিধে, লাইনবাঁধা, যেটুকু বাঁকা সেটুকুর মানে গুরু ছাড়া কেউ জানে না বলে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। একতারা হাতে হরিপদ আশ্বিন অব্দি এই গানটা প্রচুর বদলেছে। কাল কাঁদরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডুকে গানটা শোনাতে শোনাতে সে হেসে অস্থির। ব্রজহরি সব কিছুতে সিরিয়াস। হাসির কারণ জানতে চাননি। হরিপদ এমন মাতিয়ে দিয়েছিল যে রোগীরা একবাক্যে স্বীকার করেছিল, সংসারে— অর্থাৎ ভবসংসারে একলা হাঁটাই ভাল। রাতে হরিপদ ডাক্তারবাবুর বাসায় থেকে যায়। ব্রজহরি নিরামিশাষী। কাজেই হরিপদর খুব খাওয়া হয়েছিল। সকালে সে চা-বিস্কুট খেতে মাধুকরীতে বেরিয়ে যায়। পাকা রাস্তার কাছাকাছি গ্রামগুলোর চেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোত এখনও বাউলগানের আদর আছে। আদড়-কুসুমখালিতে এক সদ্-গেরস্থ তাকে কুমড়োর ঘ্যাঁট আর খেসারির ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ায়। তারপর হরিপদ মৌরীনদীর ধারে বাঁধ দিয়ে পিড়িং পিড়িং করে একতারা বাজাতে-বাজাতে গাইতে গাইতে আসছিল। সকাল থেকে ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি, দুপুরে থেমে-থেমে, কখনও ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি। ব্রিজের দিকে আসতে আসতে বাধা পেল। বাঁধ ভেঙে নদী মাঠ ভাসিয়েছে। জয়গুরু বলে হরিপদ পিছিয়ে এল। অনেকটা পিছিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে ভাবছে কী করবে, খোঁড়া পিরের দরগাটা চোখে পড়ল। সে গেরুয়া বেনিয়ান ও গেরুয়া লুঙ্গি খুলে ঝোলায় পুরে মালকোঁচা মেরে গামছা পরে জলে নামল। একহাতে একতারা অন্য হাতে ঝোলা। একবুক জল ভেঙ্গে হরিপদ জয়গুরু বলে ঢিবিতে পৌঁছুল।

এদিকটায় ঝোপজঙ্গল খুব ঘন। গুঁড়ি মেরে উঠতে উঠতে সে চাপা স্বরে কথাবার্তা শুনতে পেল। তখন সে গামছা নিংড়ে উলঙ্গ শরীর মুছে তারপর ঝোলার ভেতর থেকে শুকনো লুঙ্গি ও বেনিয়ান বের করল। আবার সে পরিপূর্ণ বাউল। একতারা পিড়িং পিড়িং করতে করতে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল।

বংকুবিহারী দারোগা

কাঁদরা থানার বড়বাবু বংকুবিহারী ধাড়ার হাতে গোপন তথ্য ছিল, দাগী ডাকাত ইসমাইল নতুন ঘাঁটি করেছে কালীতলায়। এমন অখাদ্য গ্রাম, না যাবে জিপ না সাইকেলও। তার ওপর বৃষ্টি, জলকাদা। এলাকায় হাঙ্গামা চুরিডাকাতি লেগেই আছে। শেষ রাত্রে হানা দিতে হলে সন্ধ্যার পর বেরুতে হয়। তখন ভাগে পেলেন মাত্র দুজন সেপাই।

ইসমাইলের মাথার দাম ঘোষিত হয়েছে পাঁচহাজার টাকা। এটা এ বাজারে কিছুই না। কিন্তু বিবিধ উন্নতির ইশারা আছে। বংকুবিহারী ঝুঁকি নিয়েছিলেন। প্রাণের ঝুঁকিও বলা চলে। ইসমাইল ডাকু এ পর্যন্ত তিনজন সেপাই এবং দুজন অফিসার কোতল করেছে।

কেদার চৌকিদার মৌরী নদীর এপারে তালডোঙা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তালডোঙায় চারটে লোক, ডুবুডুবু অবস্থা, আর কেদারের মতে, নদীর ভাবগতিক ভাল না, তবু এ একটা লড়াই। ইয়াসিন মোল্লার বাড়ির ভেতরে চুপিচুপি মুর্গির মাংস আর মোটা চালের ভাত খাওয়া হল। মোল্লার ঘরে তক্তাপোষে মশারি খাটিয়ে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল দারোগাবাবুর। সেপাই দুজন মেঝেয়, অবশ্য তারাও মশারি পেল। ভীষণ মশার উপদ্রব। শুধু বেচারা কেদার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঢুলতে ঢুলতে মশার কামড় খেয়ে ঢোল। শেষ রাতে মোল্লা জাগিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

তখন কালীতলায় বানের জল ঢুকছে। সারা গ্রামে চ্যাঁচামেচি, নদীর বাঁধের দিকে জল ভেঙে মানুষজন এগিয়ে যাচ্ছে। তালডোঙায় কাচ্চাবাচ্চা, স্ত্রীলোক, ক্রন্দন, সে এক বীভৎস ঘটনা। কেদারের তালডোঙাটি নদীর ধারে বাঁধা ছিল। পাওয়া গেল না, ইসমাইল ডাকু দূরের কথা! মোল্লা আশ্বাস দিলেন, শিগগির তালডোঙা যোগড় করে ফেলবেন। সেই তালডোঙাটি আসতে ভোর হয়ে গেল। তখন আর কেদারের পাত্তা নেই। সে তার সংসার বাঁচাতে গেছে।

হতাশ, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ বংকুবিহারী সেপাই দুজনকে বললেন, তোমরা পরের বার যাবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। মোল্লা সেপাই দুজনকে পরামর্শ দিলেন, বেগতিক দেখলে তারা যেন ঘরের চালে চড়ে বসে। মোল্লাই এখন কাণ্ডারী। তাঁর ভিটেটি উঁচু মাটিতে। কিন্তু ভোরের আলোয় জলের হালচাল দেখে তাঁর ভাল ঠেকছিল না। তালডোঙাটি কোনোক্রমে মৌরীনদী পার করে আন্যপারের বাঁধে পৌঁছে দিলেন দারোগাবাবুকে। তারপর যে চলে গেলেন সেপাইদের আনতে, তো গেলেনই। তখন বাঁধে ভিড়। কাচ্চাবাচ্চা, স্ত্রীলোক, ছাগল, হাঁস-মুরগি গেরস্থালির সরঞ্জাম, প্রচণ্ড ক্রন্দন। তার ওপর থেমে-থেমে বৃষ্টি। বংকুবিহারী বেলা নটা অব্দি অপেক্ষা করে বাঁধের দুদিকে তাকিয়ে ঠিক করতে পারছিলেন না কোনদিকে যাবেন। কেউ তাঁকে পাত্তা দিচ্ছিল না। যাকেই

banglaboi.blogspot.com

জিগ্যেস করেন, সেই প্রলাপ বকতে থাকে। অগত্যা বাঁধ বরাবর পূর্বে হাঁটতে থাকলেন। এপারের বাঁধটা অক্ষত আছে। তারপর তাঁর ব্রিজ এবং পাকা রাস্তাটির কথা স্মরণ হল। তখন বুঝলেন, ঠিক রাস্তায় চলেছেন। মাইলখানেক চলার পর ডাইনে একটা ছোট্ট গ্রাম পেলেন। গ্রামটি উঁচু ভিটের ওপর অবস্থিত। কিন্তু কোনো লোকজন দেখতে পেলেন না। একটি স্ত্রীলোক বাঁধে গাইগরু বাঁধতে এসেছিল। কেন কে জানে, তাঁকে দেখে ঘোমটা টেনে পাথরের মূর্তি হয়ে রইল। সামনে কোথাও বাঁধ ভেঙেছে কি না জানার ইচ্ছা ছিল বংকুবিহারীর। রাগ করে বংকুবিহারী পা বাড়ালেন। নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। বাঁধটা কখনও কাছে, কখনও দূরে সরে গেছে, ব্রিজটি দেখা যাচ্ছে না, ভিজে জবুথবু বংকুবিহারী পরের গ্রামটিতে পৌঁছে ডাইনে একটা ঘরের বারান্দা দেখা মাত্র গুলি খাওয়া বাঘ অথবা শেয়ালের মতো কুঁজো হয়ে ছুটে গেলেন। বারান্দায় কয়েকজন লোক বসেছিল উদ্বিগ্ন মুখে। তারা ভড়কে গেল। তারপর শশব্যস্তে সেলাম দিতে থাকল।

দারোগাবাবু এই গ্রামেরই মোড়ল মশায়ের বাড়ি শেষ পর্যন্ত অতিথি হন। তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। খিদে ও ঘুম। ফলে এই গ্রামে তিনি দুপুর অব্দি থেকে যান। আর এই গ্রামেই অন্যপ্রান্তে বিপ্লবী ঘনশ্যাম রুদ্র ক্ষেতমজুর সমিতির বৈঠক করছিলেন। গ্রামের চৌকিদার পাটক্ষেত থেকে ফিরে ঘুমন্ত বংকুবিহারীর জন্য অপেক্ষা করে। ঘুম ভাঙলে খবরটি দেয়। তার আগে অবশ্য দেরিতে পাওয়া খবরের ধাক্কায় ঘনশ্যাম রুদ্র মুখের আহার ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই গ্রামের চৌকিদারই বংকুবিহারীকে সামনের দিকে বাঁধ ভাঙার খবরটিও দেয় এবং কোনাকুনি আলপথে দ্রুত যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সে কিছুদূর ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ও জঙ্গলের ভেতর দারোগাবাবুকে এগিয়ে দিয়েও আসে। বংকুবিহারী তারপর জলের সামনে পৌঁছান। আর পিছিয়ে যাওয়ার মানে ফের একটা পরাজয়। বংকুবিহারী রিভলবারটি, বেল্টট, বুলেট কেস আকাশে তুলে হাঁটুজল, কোমরজল, বুকজল ভাঙতে ভাঙতে খোঁড়াপিরের টিবিটি চোখে পড়ায় সেদিকে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে যান। তিনিও কিছুক্ষণ নেতিয়ে একটুকরো লাইমকংক্রিটে ঠেস দিয়ে পড়ে থাকেন। চাকরি, জীবন, সবকিছুর প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ।

এক বারবধূ

মহকুমা শহরের বাগানপাড়া গলির বারবধূ শাওনি খোঁড়াপিরের দরগায় সিন্নি মেনেছিল মাসখানেক আগে। সিন্নির উদ্দেশ্য 'মাসির' মৃত্যু। সে শুনেছিল খোঁড়া পির জাগ্রত আত্মা। পাঁচটা খুদে মাটির ঘোড়া, মাটির সরায় খই ও বাতাসা, একখানা নতুন গামছা যত্নে কাপড়ের ব্যাগে ভরে সে চুপি-চুপি বেরিয়ে বাসে

চেপেছিল। কাঁদরা পেরিয়ে রাস্তায় জল। বাস দাঁড়িয়ে গেল। যাত্রীরা বুঝিয়ে সুঝিয়েও ড্রাইভারকে রাজি করাতে পারল না। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। আর মাইল তিনেক গেলে দরগা। শাওনি জল ভেঙে এগোতে থাকল। যাত্রীরা তখন তুমুল হল্লা করছে। কিছুদূর চলার পর জল বাড়ছিল। স্রোতে টলতে টলতে বারবধূ শাওনি একবার পিছু ফিরে দেখল, তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বাসটা জলে ডুবতে ডুবতে পিছু হটছে। সে মুচকি হাসল। আবার হাঁটতে থাকল জলের ভেতর। খোঁড়া পিরের দরগায় পৌঁছুতে তার ঘণ্টা দুই মতো লাগল। হাতে ঘড়ি না থাকলেও সে ঘণ্টা মাপতে পারে। সে যখন ঢিবির মাটিতে হাত রাখল, তখন এত ক্লান্ত যে ওঠার জন্য পা তুলতে পারছে না। সে সাবধানে ব্যাগটা একটা ঝোপের গোড়ায় হাত বাড়িয়ে আটকে রেখে শরীরটা টেনে তুলতে থাকল। সে পিরবাবাকে ডাকছিল বিড়বিড় করে। তারপর সে বুঝল, কেউ তাকে টেনে তুলে নিল। সে চোখ বুজে ফেলেছিল, নির্জীব। তারপর যে তার হাত ধরে টেনে তুলেছিল, সে মৃদুস্বরে বলল, তুমি কি একটু কষ্ট করে উঠতে পারবে? তখন চোখ খুলেই বারবধূটি চমকে উঠল। স্বপ্ন, না সত্যি সত্যি? একটা ধপধপে শাদা দাড়িওয়ালা মুখ, লম্বাচওড়া এক মানুষ— পিরবাবাই কি? সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে একটানে উঠে বসে ধনুকের মতো বেঁকে পায়ে মাথা কুটতে গেল। গিয়ে স্বপ্নটা ভেঙে গেল। পায়ে কালো অদ্ভুত গড়নের জুতো। এক শাদা দাড়িওয়ালা 'সায়েব' গায়ে রেনকোট, মাথায় টুপি। বারবধূ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সায়েব লোকটি ফের বাংলায় বলল, এখানে ভিজো না। আমার সঙ্গে এস। ওখানে ঘর আছে। কী? উঠতে কষ্ট হচ্ছে? ধরতে হবে? শাওনি ধরা গলায় বলল, না। আমি যেতে পারব।

bengalibook.blogspot.com

এবং একটি কুকুর

'সাহেবলোকটি' স্বনামখ্যাত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ছোট ও বড় ধ্বংসস্তূপ, ঝোপঝাড় ও ভাঙা দেউড়ির আড়ালে টলতে টলতে বারবধূটি অদৃশ্য হলে তিনি ডাইনে ঘুরলেন। ওদিকটা ঢালু এবং ঝুরিওয়ালা একটি বটগাছ আছে। সেখানে জার্মান মেয়েটি— ক্লারা গ্ল্যান্সলারকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। চোখে চোখ পড়লে ক্লারা ডাকল, কর্নেল! কর্নেল তার কাছে গেলেন। ক্লারার পরনে সিল্কের শাড়ি। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। খালি পা। ওর কপালটা বড় বেমানান। বাংলার গ্রামে এদেরই 'উঁচকপালি' মেয়ে বলা হয়। ক্লারা হাসছিল। বলল, স্থানটি মূলত একটি সমাধিক্ষেত্র। এই দেখুন একটি সমাধি। কোনো ক্রস দেখছি না। অতএব স্থানটি মূলত মোজলেম সমাধিক্ষেত্র।

তুমি ঠিকই বলেছ। কর্নেল বললেন। তবে কষ্টকর 'সমাধিক্ষেত্রের' বদলে কবরখানা বলতে পারো ডার্লিং!

ক্লারা নড়ে উঠল।...হ্যাঁ, হ্যাঁ—কবরখানা। তারপর নীল চোখে রহস্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, আশাকরি এটা চুণ্ডু খানের কবর নয়। আপনি অ্যারাবিক-পার্সিয়ান জানেন কি! ওই দেখুন, স্মৃতিফলকে কীসব লেখা আছে।

কর্নেল ঝুরির আড়ালে গিয়ে বললেন, তুমি দরবেশসায়েবের গল্পটা বিশ্বাস করো কি?

করি। ক্লারা বলল। ভারতের সবকিছুই বিশ্বাসযোগ্য।

তোমাকে বলেছি ডার্লিং, একটার পর একটা করে তোমার বিশ্বাস ভেঙে যাবে, তখন তুমি কষ্ট পাবে। কর্নেল বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে চুরুট ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে ফের বললেন, সত্যে পৌঁছুতে হলে অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করতে হয়।

ক্লারা একটু ক্ষুব্ধ হল। বলল, আপনি প্রদোষের প্রতিধ্বনি করছেন। আমার ননদিনীর নাম মৃণালিনী। তাকে আমি দিদি বলি। সে বলল, তাদের মামার বাড়িতে পূজার প্রতিমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। আমি দিদিকে বিশ্বাস করি। সুতরাং তার কথায় বিশ্বাস করি।

কর্নেল হঠাৎ তাকে একটানে সরিয়ে আনলেন। ক্লারা হকচকিয়ে উঠেছিল। কর্নেল বললেন, কিন্তু সাপকে বিশ্বাস করতে নেই। সাপটি বিষাক্ত। ওই দেখ।

ক্লারা এবার সাপটিকে দেখতে পেল। সাপটি ক্লারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার একহাত তফাত দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কর্নেল ইটের চাঙড় তুলতে গেলে ক্লারা তাঁকে বাধা দিল। সাপটি সম্ভবত মাটিতে স্পন্দনের প্রবলতা টের পেয়ে একটা স্তূপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। কর্নেল বললেন, আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করা উচিত, ডার্লিং! চুণ্ডু খানের আত্মার চেয়ে সাপ বিপজ্জনক। এস, আমরা দরবেশসায়েবের ডেরায় ফিরে যাই।

ক্লারা মুগ্ধদৃষ্টে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বলল, যত দেখছি, অবাক হচ্ছি। ঠিক এমন কোনো স্থানেই আমি আসতে চেয়েছিলাম। খুব ভেতরে, অনেক— অনেক ভেতরে। যেখানে ভারতের আত্মা আছে।

বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। ক্লারা কর্নেলকে অনুসরণ করছিল। উঁচু সব গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির আটকে-পড়া ফোঁটাগুলি অনর্গল ঝরছিল। ভিজে যাচ্ছিল ক্লারা। দরবেশের ডেরায় পৌঁছুতে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে স্তূপ ও জঙ্গলের দরুন। টিবির সমতল অংশটা কর্নেলের মাপে আন্দাজ দশ একর। পশ্চিম ঘুরে ফাঁকায় পৌঁছে রোদ্দুর দেখা গেল। ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজে। কর্নেল ঝুঁকে একটা লম্বাটে পাথরের স্ল্যাব তুলে নিয়ে বললেন, দেখছ? আশ্চর্য ব্যাপার!

ক্লারা বলল, কী, কী?

পাথরটার একপিঠে দেবীমূর্তি, অন্যপিঠে অ্যারাবিক বা পার্সিয়ান কিছু লেখা আছে।

ডাক্তারবাবু বলছিলেন এটা হিন্দুরাজার প্রাসাদ ও মন্দির ছিল। মোজলেমরা তা অধিকার করে।

পাথরটা রেখে কর্নেল চাপা হেসে উঠলেন। আরও আশ্চর্য ব্যাপার তোমাকে দেখানো যায় ডার্লিং, যদি তুমি অশালীন মনে না করো। তোমার ক্যাথলিক এবং ইওরোপীয় সংস্কারের কথা ভেবেই বলছি।

ক্লারা শক্ত মুখে বলল, আমি ভারতীয় এবং হিন্দু।

ভাল কথা। তাহলে ওই দেখ।

পশ্চিমের খোলামেলা ঢালু ঘাসজমিটায় দাঁড়িয়ে বংকুবিহারী ভিজে খাকি শার্ট-প্যান্ট খুলে ঝোপে শুকোতে দিচ্ছেন। পরনে শুধু গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার। জুতোজোড়া একটা লাইমকংক্রিটে রেখে পাশে বসলেন। মোজা খুললেন। শুকোতে দিলেন। রিভলবার ও বুলেটকেস-সহ চওড়া বেল্টটি কোলে রাখলেন। গোঁফ পাকাতে শুরু করলেন।

ক্লারা চাপা হেসে বলল, ভারতে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনরক্ষকরা।

কর্নেলও একটু হাসলেন। তোমাকে পাসপোর্ট-ভিসা চাইছিলেন। তুমি দেখালেই পারতে!

কেন দেখাব? প্রদোষ ভারতীয় নাগরিক। আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছ তোমার পাসপোর্ট-ভিসা আছে। তাছাড়া এবিষয়ে আইনটি জটিল।

ক্লারা আরও আস্তে বলল, দেখতাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু প্রদোষ যখন বলল, সে স্থানীয় আইনসভার সদস্যের আত্মীয়, তখন পুলিশ অফিসার লোকটি চুপ করে গেল।

ক্লারা, আরও একটু আশ্চর্য!

কই, কই! আমি দেখতে চাই। সে কর্নেলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

একটা কুকুর। কর্নেল আঙুল তুলে দেখালেন।

কুকুরটা সাঁতার কেটে এসে দু ঠ্যাং বাড়িয়ে দিল। তারপর কয়েকবার চেষ্টার পর ডাঙায় উঠল। গা ঝাড়া দিল বারবার। তারপর সামনে তাকিয়ে বংকুবিহারীকে দেখেই মুখ তুলে ঘেউজাতীয় শব্দ করল। বংকুবিহারী আন্যমনস্ক ছিলেন নিশ্চয়। উঠে তাড়া করার ভঙ্গি করলেন। তখন কুকুরটা লেজ গুটিয়ে স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

ক্লারা বলল, আমার ভয় করছিল, যদি পুলিশ অফিসার গুলি করেন হতভাগ্য কুকুরকে!

কুকুরটি ঘোরাপথে ঘুরে কর্নেল ও ক্লারার খুব কাছে এসে পড়ল। তারপর

boiRboi.blogspot.com

সম্ভবত ক্লারাকে দেখে, তার পায়ে বৈদেশিক ঘ্রাণ থাকা সম্ভব, ঘেউ ঘেউ করতে থাকল। ভঙ্গিটি মারমুখী। ক্লারা হাসতে হাসতে আদুরে গলায় বলল, অমন করে না! প্রিয় কুকুর, তুমি কি ভাবছ আমি তোমার শত্রু? আমি তোমার বন্ধু।

বংকুবিহারী ঘুরে দেখছিলেন। গর্জন করে বললেন, কর্নেল! বজ্জাতটাকে তাড়িয়ে দিতে পারছেন না? নাকি আমি যাব?

কর্নেল হাত তুলে বললেন, না না। আমি দেখছি। আপনি ইউনিফর্ম শুকিয়ে নিন। রোদ্দুরটা এখনও কিছুক্ষণ থাকবে মনে হচ্ছে।

কর্নেল এগিয়ে গেলেন কুকুরটার দিকে। কুকুরটা পিছু হটতে থাকল। তারপর তার চ্যাঁচামেচি থেমে গেল। সে লেজ নাড়তে নাড়তে আরও পিছু হটতে হটতে দরগা-সংলগ্ন জরাজীর্ণ ঘরদুটোর কাছে গিয়ে জোরে গা-ঝাড়া দিয়ে ভেঙেপড়া আরেকটা ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ল।...

অন্ধ দরবেশের আস্তানা

ঢিবির ঠিক মাঝখানে বর্গাকৃতি খোলামেলা একটা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে একটা উঁচু বিশাল কবর। কবরটি কালো পাথরের, কিন্তু সেটি বিরাট, অন্তত চার ফুট উঁচু ইটের চতুষ্কোণ স্তম্ভের মাথায় রয়েছে। স্তম্ভের ফাটলে-ফাটলে প্রচুর উদ্ভিদ, প্রচণ্ড সবুজ ও প্রাণবন্ত। কবরের ধারে চারদিকেই অসংখ্য ক্ষুদে মাটির ঘোড়া, বিমূর্ত দিশি ভাস্কর্য সেগুলি। এটিই খোঁড়া পিরের দরগা। নিচেও কয়েকটি লাইমকংক্রিটের কবর আছে। সেগুলি দরগার সেবায়েত 'খাদিম'দের। একসময় প্রাঙ্গণের চারদিকেই একতলা ইটের ঘর ছিল। 'মুসাফিরখানা' বলা হত। দূর-দূরান্তের ভক্তদের রাত্রিবাসের জন্য ঘরগুলি কোনো মুসলিম শাসক তৈরি করেছেন। পশ্চিমের দুটি ঘর এখনও অক্ষত। কারণ মেরামত করা হয় প্রতি বছর। সেই ঘরের একটিতে থাকেন বর্তমান 'খাদিম', কালো আলখেল্লা, লুঙ্গি ও পাগড়িপরা প্রকাণ্ড চেহারার লোক, চোখে কালো চশমাপরা, তাঁকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'কানা দরবেশ'। তিনি নাকি কথা বলেন না মাঝে মাঝে, সেটা তাঁর 'মৌনব্রত'। জীর্ণ একটি গালিচায় বারান্দায় বসে আছেন, হাতে ফুট তিনেক লম্বা, চ্যাপ্টা ও ভারি চিমটে। চিমটেটি লোহার। গোড়ার দিকটায় পেতলের অনেকগুলি আংটা। বুকে চিমটেটি ঠুকছেন এবং ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। একটু-একটু দুলছেন সারাক্ষণ। গলায় কয়েকটা লাল-নীল-সবুজ পাথরের মালা। মাজে মাঝে তিনি হাঁক ছাড়ছেন, চুল্লু! চুল্লুর সাড়া না পেয়ে বলছেন, বেতমিজটা আবার পালিয়েছে। বাবারা, মায়েরা! আপনারা আমার মেহমান। কিন্তু চুল্লু না এলে আপনাদের কিছু খাওয়াতে পারব না।

কেউ খাওয়ার কথা বলেননি অবশ্য। ক্লারা ও প্রদোষ, না ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু, না ঘনশ্যাম রুদ্র, না পুঁতি ও চাক্কু, না দারোগা বংকুবিহারী, না হরিপদ

বাউল। প্রথমে কিছুক্ষণ সবাই অন্ধ দরবেশের সামনে ও পাশে চুপচাপ বসে তত্ত্ব কথা শুনেছে। তারপর কেউ-না-কেউ বৃষ্টির মধ্যে বা বৃষ্টি থামার সময় ঢিবির চারিদিক ঘুরে জলের অবস্থা দেখে এসেছে। জল ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিটি মুখ নিষ্প্রাণ, ক্লারা বাদে। প্রদোষ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। সে ক্লারাকে বোঝাতে পারেনি তারা বিপন্ন এবং প্রকৃতির করতলগত।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহকুমা শহর নবাবগঞ্জে তাঁর সামরিক জীবনের বন্ধু ক্যাপ্টেন সদাশিব চৌধুরীর বাড়ি এসেছিলেন। আসার পথে এই ঢিবিটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্যাপটেন চৌধুরীর কাছে ঢিবিটির কথা প্রসঙ্গক্রমে তোলায় তিনি বলেন, আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে দফতরে বহুবার চিঠি লিখেছি, খুঁড়ে দেখুন আপনারা। এই মাউন্ডটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। গত বছর দুজন ভদ্রলোক এসে দেখেও যান। তারপর কী হয়েছে জানি না। তবে ওখানে একজন পিরের দরগা আছে শুনেছি। একজন অন্ধ দরবেশ থাকেন শুনেছি। তাঁর নাকি বুজরুকি ক্ষমতা আছে। ইচ্ছে করলে দেখে আসতেও পারেন। তবে আমার সময় হবে না, দুঃখিত। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কী অবস্থা চলেছে!

ক্যাপ্টেন চৌধুরী আর্মিতে সার্জেন ছিলেন। এখন বিনাপয়সায় রোগী দেখেন এবং প্রি হেলথকেয়ার ইউনিট গড়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা সাহায্য করে তাঁকে।

কর্নেল খোঁড়া পিরের দরগায় পৌঁছন সকাল দশটায়। তখন বৃষ্টি ছিল, দুপাশের মাঠে ধানক্ষেতের ডগা দেখা যাচ্ছিল, তবে পিচরাস্তায় জল ওঠেনি, বাস চলছিল। পিচরাস্তা থেকে বিশ গজ দূরে আগাছাজঙ্গলে ঢাকা ঢিবিটিতে উঠে ধ্বংসাবশেষ দেখে কর্নেল একটি প্রাচীনত্ব অনুভব করেন। তারপর বিধ্বস্ত পাথরের ফটক পেরিয়ে অন্ধ দরবেশের কাছে যান। দরবেশের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, তবু বয়স অনুমান করা কঠিন। অন্ধদের স্মরণশক্তি স্বভাবত তীক্ষ্ণ। দরবেশ বলে ওঠেন, বাবা, আপনি যেই হোক, শিগগির চলে যান! বান আসছে। চারদিক ডুবে যাবে।

কর্নেল অবাক হয়ে বলেন, কীভাবে বুঝলেন বান আসছে!

চুল্লু বলে গেল।

কে সে?

আছে একজন। আপনি শিগগির চলে যান।

কর্নেল দরবেশের সামনে একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে বলেন, সেলামি নিন দরবেশসায়েব!

কত দিচ্ছেন? দরবেশ হাত বাড়িয়ে ঠিকই টাকা তুলে নিয়ে বলেন, পাঁচ টাকা!

কিছু কথা আছে, দরবেশসায়েব!

শিগগির বলুন। বান আসছে। চুল্লুও আবার এসে পড়বে। বিপদ হবে আপনার।

banglaboi.blogspot.com

চুল্লু কে?

দরগার দক্ষিণে তার কবর আছে।

বুঝলাম। কে ছিলেন তিনি— মানে যখন বেঁচে ছিলেন?

এই জায়গার মালিক। নাম ছিল শাহ্ ফরিদ। লোকে বলত চুল্লু খান। সে প্রায় দুশো বছর আগের কথা।

আপনি এখানে কতদিন আছেন?

তা একশো সত্তয়া-শো বছর হয়ে গেল প্রায়।

আপনার বয়স কত?

বলব না। আপনি চলে যান। বান আসছে। দেরি করলে আর যেতে পারবেন না।

কর্নেল এবার একটি দশ টাকার নোট দরবেশের সামনে রেখে বলেন, সেলামি, দরবেশসায়েব! আমি একটা দিন আপনার কাছে কাটাতে চাই। ধর্মকথা শুনতে চাই।

দরবেশ নোটটি তুলে নিয়ে বলেন, আরও দশ দিতে হবে।

নিন।

দরবেশ নোট পঁচিশ টাকা পেয়ে আলখেল্লার ভেতর চালান করে বলেন, আপনার নিবাস?

কলকাতা।

নাম?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

দরবেশ হাসলেন। সঙ্গে খাবর-দাবার আছে, নাকি আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবেন? শুধু খিচুড়ি খেতে হবে। খাবেন?

চুল্লু খানকে বললে রেঁধে দেয় না?

তা দেয় মাঝে মাঝে। তবে ও বড় বেতামিজ। দরবেশ উঠে দাঁড়ান। আপনি এই সতরঞ্জি বিছিয়ে বসুন। বলে তাক থেকে সঠিকভাবে হাত বাড়িয়ে একটা বিবর্ণ ছেঁড়া সতরঞ্জি টানেন। ধপাস করে ফেলে দেন কর্নেলের সামনে। তারপর বলেন, চা খাবেন? চা চিনি দুধ সব মজুত আছে। বাথান আছে নদীর ওদিকে। আধসের করে দুধ দিয়ে যায় গয়লারা। পিরবাবার মানত— চিরকাল।

'চিরকাল' শব্দটা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে অন্ধ দরবেশ তালা খুলে ঘরে ঢোকেন। ঘরের ভেতর কোনো জানালা নেই। অন্ধকার ছমছম করছিল। দরবেশ বেরিয়ে আসেন একটি কেরোসিন কুকার নিয়ে। বারান্দার তাকে কেটলি ছিল। একটা বাঁশের চুপড়িতে মাটির ভাঁড় ছিল অজস্র। বারান্দার কোনায় গর্তের ভেতর বসানো ছিল একটা মাটির জালা। তাতে জল ছিল। কর্নেল প্রশ্ন করে

জেনে নেন, যারা মানত দিতে আসে, তারা একঘড়া করে জল আনে। এই জালায় ঢেলে দেয়। এটা একটা নিয়ম। এতে বেশি পুণ্য হয় মানুতে ভক্তদের।

চা, চিনি, চাল-ডাল-আনাজপাতি-তেলমসলা সবই ভক্তদের দান। একজন অন্ধ লোক এভাবে বেঁচে আছেন এবং তাঁর শরীরটিও নধর, কর্নেল খুব অবাক হয়ে যান। অন্ধ দরবেশ চমৎকার চা করতে পারেন। চা খেতে খেতে 'মারফতি' তত্ত্বকথা এবং মাঝে মাঝে চুল্লুর প্রেতাত্মার দুষ্টুমির বিবরণ শুনতে শুনতে কর্নেল একসময় বলেন, আমি দেখে আসি বান এল নাকি। আপনি এবার খিচুড়ি রান্না করুন! বারোটা বাজে প্রায়।

কর্নেল ঢিবির চারদিকে সত্যি বানের জল দেখে একটু অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু আর কিছু করার নেই। জায়গাটা তাঁর ভাল লেগেছে। এই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, জঙ্গল, অন্ধ দরবেশ, চুল্লুর প্রেতাত্মা প্রভৃতির সঙ্গে চারদিক থেকে জলের উপচে-ওঠা তাঁর জীবনে আরও একটি রোমাঞ্চকর সংযোজন ঘটাবে। ফিরে গিয়ে দেখেছিলেন খিচুড়ি তৈরি এবং দরবেশ তাঁর প্রতীক্ষা করছেন। বলেছিলেন, একদণ্ড দেরি করলে চুল্লু এসে খেয়ে নিত। আসুন, বসে পড়ুন।...

সূর্যাস্তের আগে একঘণ্টা

রোদ্দুর দেখে লোকগুলি ছত্রভঙ্গ হয়েছিল, শাওনি বাদে। শাওনি দরবেশের সামনে চুপচাপ বসে ছিল। ঘনশ্যাম রুদ্রের পরনে এখন ধুতি ও পাঞ্জাবি, খালি পা। বংকুবিহারী দারোগাকে দেখার পর থেকে তাঁর প্রচণ্ড উদ্বেগ, তবে বংকুবিহারী তাঁকে কখনও দেখেননি। তুব পুলিশের স্বভাব। নামধাম জিগ্যেস করায় বলেছেন, হর্ষনাথ নন্দী। বাড়ি কোনো এক কেশবপুরে— নদীয়া জেলায়। পেশা শিক্ষকতা। বাসে চেপে নবাবগঞ্জ থেকে ফিরছিলেন। নবাবগঞ্জে তাঁর এক পিসতুতো দাদা থাকেন। জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, নাম হর্ষনাথ বটু। বটু? এ আবার কেমন পদবি? এমন পদবির কথা তো শোনেননি বংকুবিহারী।

পশ্চিমের ঢালে রোদ্দুর পড়েছে, সেদিকে গিয়ে বংকুবিহারীকে ইউনিফর্ম শুকোতে দেখে ঘনশ্যাম হাত তিরিশেক তফাতে একটা ঝোপের আড়াল খুঁজে নিয়েছেন। ভিজে লুঙ্গি ও গেঞ্জি শুকোচ্ছেন।

ডাঃ ব্রজহরি কুণ্ডু রাগ করে সি ভিটামিন ট্যাবলেট দ্বিতীয়বার মুখে গুঁজে চুষতে চুষতে রোদ্দুর নিতে গিয়ে বাঁয়ে বংকুবিহারী এবং ডাইনে ঘনশ্যামকে দেখে মাঝামাঝি একটা জায়গা বেছে নিলেন, যেটা ঢিপি থেকে ঝরনার মতো জলস্রোত নেমে যাওয়ার রাস্তা, তার পাশে একটা চাঙড়। স্রোতরেখাটিতে নুড়ি ও ইটের গুঁড়ো। তাঁর মনে হল, ঝরনার পাশে বসে আছেন। তাঁর বর্ষাতি, টুপি ও ডাক্তারি পেটমোটা বাকসো অথবা ব্যাগটি দরবেশের ঘরের বারান্দায় আছে।

banglaboi.blogspot.com

ঘনশ্যাম থেকে অনেকটা তফাতে পুঁতি ও চাক্কু একটা প্রকাণ্ড এবং কাত হয়ে পড়া হিজলগাছের ডালে পাশাপাশি বসল। চাক্কু পুঁতির কাঁধে হাত রাখলে পুঁতি ঝটপট এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল। তারপর আস্তে বলল, কী হবে বলো তো?

প্রদোষ ক্লারার টানে বেরিয়ে এসে দরবেশের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনেই চুপচাপ। তবে ক্লারা হাস্যমুখী।

কর্নেল সবাইকে সাপ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তাই প্রত্যেকে মাঝেমাঝে পায়ের কাছে বা আশেপাশে তাকিয়ে নিচ্ছে, যদিও দরবেশ বলেছেন, বাবার দরগায় সাপ কখনও দংশাবে না। কর্নেল আবার তিনদিকে চক্কর মেরে চতুর্থ দিক পশ্চিমের রোদ্দুরে পা বাড়ালে কুকরটি তাঁর সঙ্গ নিল। কুকুরটি রোগা ও নেড়ি, হাল্কা বাদামি রঙের। কর্নেল তাকে শিস দিয়ে কাছে ডাকলে সে লেজ নাড়তে-নাড়তে কাছে গেল। কর্নেল জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে দৈবাৎ কয়েকটা চকোলেট পেয়ে গেলেন। একটা চকোলেট মোড়ক খুলে মুখে গুঁজে দিতে গেলে কুকুরটা পিছিয়ে গেল। তখন সামনে ফেলে দিলেন। তখন কুকুরটা সেটা শুঁকে দেখে মুখে নিল এবং চিবুতে থাকল। কুকুরটি ক্ষুধার্ত।

এই সময় কোথায় পিড়িং পিড়িং শব্দে একতারা বেজে উঠল। কর্নেল শব্দের দিকে ঘুরে দেখলেন, হরিপদ বাউল বংকুবিহারীর কাছে মর্যাদাজনক দূরত্ব রেখে নিচু একটা চাঙড়ে বসে আছে। বংকুবিহারী সম্ভবত তাকে গান গাইতে বললেন। কারণ তারপর বাউলটি ঘুমঘুম স্বরে গান গাইতে থাকল।

কর্নেল! কর্নেল! ব্রজহরি ডাক্তার তাঁকে ডাকছিলেন চাপা স্বরে। তিনি কর্নেলের ঠিক নিচেই।

কর্নেল তাঁর কাছে গেলেন। কুকুরটি দুঠ্যাঙ ভাঁজ করে এবং দুঠ্যাঙ সোজা রেখে চকাস চকাস শব্দে চকোলেট চুষছিল অথবা কামড়াচ্ছিল। কর্নেল ব্রজহরির কাছে গেলে ব্রজহরি ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। একটা মোটা শেকড় বেরিয়ে এসেছে ঢালু মাটি ফুঁড়ে। মসৃণ ভিজে শেকড়। কর্নেল শেকড়টাতে বসলে ব্রজহরি চাপা স্বরে বললেন, একটা সিরিয়াস ব্যাপার ঘটেছে, জানেন?

কর্নেল একটু হাসলেন। কী?

আমাদের মধ্যে একজন প্রসটিট্যুট আছে।

বলেন কী! কে?

ব্রজহরি আরও গোমড়ামুখে বললেন, যে মেয়েটা সবশেষে এল। মানত দিল।

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, শাওনির কথা বলছেন?

ব্রজহরি খুব অবাক এবং প্রায় মূর্ছিত হবার ভঙ্গিতে বললেন, চেনেন নাকি ওকে! কী অদ্ভুত কথা!

কর্নেল হাসলেন। ...দারোগাবাবু সবাইকে নামধাম জিগ্যেস করছিলেন, তখন শুনেছি।

আমি মশাই শুনিনি! ব্রজহরি ভরাট গলায় বললেন। পুলিশের দিকে তাকাতেও আমার খারাপ লাগে।

তাহলে আপনি কীভাবে জানলেন শাওনি প্রসটিট্যুট?

ব্রজহরি ফিসফিস করে সাপের গজরানির মতো বললেন, ওই রিকশোওলা ছোকরাটা— ওকে চিনি, ওর রিকশোয় বহুবার চেপেছি, কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলেছে, ডাক্তারবাবু মেয়েটা বেশ্যা। বুঝলেন না? রিকশোওয়ালারা ওদের চেনে। চেনা স্বাভাবিক কি না বলুন?

কর্নেল স্বীকার করলেন। খুবই স্বাভাবিক! বলে আধপোড়া চুরুটটি পকেট থেকে বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালেন। কুকুরটা নেমে এসে তাঁর পায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর দিকে দাঁড়িয়ে রইল। ব্রজহরি গুমোটমুখে মাথানিচু করে ঘাস কুচি করছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন, একটা কথা ভাবছি। ভীষণ খারাপ লাগছে ভাবতে।

কী কথা, ডাক্তারবাবু?

শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মাথা নিচু রেখে ব্রজহরি বললেন, রিলিফের নৌকো যদি বেরোয়, এ তল্লাটে আসবে না। কারণ এটা মাঠের মধ্যিখানে। এটা গ্রাম নয়, দরগা। দরগা ডোবার চান্স নেই যে দরবেশবাবাকে উদ্ধার করতে হবে। কাজেই একমাত্র ভরসা, যদি দরবেশবাবার কোনো ভক্ত তাঁর খোঁজ নিতে আসে! কিন্তু প্রব্লেম হল, এ তল্লাটে তালডোঙারই রেওয়াজ। জেলেরাও তালডোঙা ব্যবহার করে। কাজেই—

ব্রজহরি থেমে গেলে কর্নেল বললেন, হুঁ— বলুন!

তালডোঙ্গা বিপজ্জনক। মাত্র একবার চাপতে হয়েছিল রোগী দেখতে গিয়ে— ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! ব্রজহরি মাথা নিচু রেখে আরেকটা ঘাস ছিঁড়ে বললেন, কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ একজন বেশ্যার সঙ্গে এখানে থাকা। দরগার মাটি পর্যন্ত দূষিত হয়ে গেছে, আমি টের পাচ্ছি! ...একটু পরে ফের বললেন, আর ওই পুলিশ! সেও কম বিপজ্জনক নয়। বিশেষ করে কাঁদরা থানার ওই অফিসারটির সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শুনেছি। ভীষণ দুর্নীতিপরায়ণ— ভীষণ! আপনি জানেন, আমার নামে কারা পিটিশন করেছিল হাসপাতালের ওষুধ নিয়ে চোরাকারবার করি বলে? তারপর ওই লোকটা এল। বলল, রফা করে নিন।

করলেন, নাকি করলেন না?

মুখ তুলে অদ্ভুত এবং নিঃশব্দ হাসলেন ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু। আমি রফা করব? গরিবের ডাক্তার বলে আমার প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা আছে— আমি কেন রফা

bengalidownload.com

করব? পাল্টটা পিটিশন গেল। উল্টেট দারোগাবাবুরই ট্রান্সফার হয়-হয় অবস্থা! এসে হাতে ধরে— বলেই কুকুরটিকে দেখতে পেয়ে ব্রজহরি হ্যাৎ হ্যাৎ শব্দে হাত নাড়তে থাকলেন।

কুকুরটি দাঁত বের করে ধমকাল। ব্রজহরি রেগে গিয়ে এবং আতঙ্কে ঝরনারেখাটি ডিঙিয়ে চলে গেলেন এবং অনিবার্যভাবে পড়লেন বংকুবিহারীর কাছে। হরিপদ বাউল ঝুমঝুম সুরে গান গাইছিল। বংকুবিহারী সহাস্যে বললেন, বসুন ডাক্তারবাবু! বড় ভাল গায়—তাই না?...

ক্লারা পা বাড়ালে প্রদোষ ফুঁসে উঠল, ক্লারা! হোয়াট ডু ইউ থিংক্ ইউ আর গোয়িং টু ডু?

ক্লারা ঘুরে মিষ্টি হেসে বলল, তুমি ইংলিশ বোলো না! খারাপ লাগে। তাছাড়া আমার মাতৃভাষা কী তুমি জানো। একথা ঠিক, আমার পরিবার যুদ্ধের সময় জার্মানি ছেড়ে অ্যামেরিকা গিয়েছিল। আমার পরিবার সেজন্য ইংলিশ বলে। আমিও বলতাম। কিন্তু এখন আমি ভারতীয়। কারণ আমি তোমার স্ত্রী।

প্রদোষ হাসবার চেষ্টা করে বলল, ভারতীয় বলে কিছু নেই!

ঠিক। আমি বাঙালি। বলে ক্লারা হাসতে হাসতে নেমে গেল ঢাল বেয়ে। সে একেবারে জলের ধারে গিয়ে একটুকরো পাথরের স্ল্যাবে বসল। পা দুটো জলে রাখল। জল নিয়ে খেলতে থাকল।

প্রদোষ একটু দাঁড়িয়ে থেকে পেছনের ভাঙাচোরা ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে প্রাঙ্গণে চলে গেল। একটা ভিজে কবরের ওপর বসে সিগারেট ধরাল। একটু পরে ঘুরে দেখল, মানত দিতে আসা কেমন-চেহারার মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রদোষ চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল।

শাওনি এসে তার সামনের একটা কবরে নিঃসঙ্কোচে বসে একটু হাসল। ...বাবু, আপনার মেমবউ কোথায়?

প্রদোষ তাকাল। কেন?

আমাকে একটা সিগারেট দেবেন?

প্রদোষ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

শাওনি হাত বাড়িয়ে বলল, দিন না বাবু একটা সিগারেট! তখন থেকে সিগারেটের গন্ধ শুঁকে মাথা খারাপ! দিন না!

প্রদোষ তাকে দেখতে দেখতে বলল, কোথায় থাকো তুমি?

নবাবগঞ্জেতে। আমার নাম শাওনি। শাওনি বারবধূর হাসি হেসে বলল। ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে গেল। ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম। আহা, দিন না একটা— আচ্ছা, আপনার মুখেরটা দিন!

প্রদোষ হাসল।...তুমি সিগারেট খাও?

খাই। বলে শাওনি দুহাত তুলে এলিয়েপড়া ভিজে চুল ঝাড়ার ভঙ্গি করার পর খোঁপা বাঁধতে থাকল। সে ইচ্ছে করেই বুক দেখাল। তারপর ব্লাউজে হাত রেখে বলল, এম্মা! এখনও ভিজে ন্যাতা হয়ে আছে! করছি কী। আমার যে নিমুনি হবে! সে প্রদোষের চোখের সামনে ব্লাউজটি খুলে ফেলল, শাড়িটা আড়াল করার ছলও করল, এবং বেশ্যারা যা করে থাকে!

প্রদোষ তাকে গিসারেট দিলে সে বলল, এম্মা! ধরিয়ে দিন! কী মানুষ আপনি! উঁহু— খামোকা লাইটার জ্বেলে কী হবে? হাতেরটাতে ধরিয়ে দিন।

প্রদোষ এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল। শাওনি দুহাত চেপে ধরে ঝুঁক এল। প্রদোষ শিহরিত হল। নিজের ইচ্ছা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এ শিহরন জৈব। সিগারেট ধরিয়ে নেবার সময় বারবধূটির দুটি চোখ তার দিকে নিবদ্ধ, এতে প্রদোষের শরীর কেঁপে উঠল। আস্তে বলল, তুমি কে?

শাওনি হাত ছেড়ে দিয়ে সিগারেট টেনে ধোঁয়ার মধ্যে বলল, শাওনি।

ধোঁয়া প্রদোষের মুখের দিকে ছুড়েছিল। প্রদোষের শরীর ভারি হয়ে গেল। এবার সে মেয়েটিকে বুঝতে পারল। লজ্জিত ও বিব্রত হল। সে ঝটপট উঠে দাঁড়াল। আচ্ছন্ন অবস্থায় ভাঙা দেউড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। ক্লারা আছে পশ্চিমে, যেখানে রোদ্দুর। প্রদোষ চলেছে পূর্বে স্তূপের ভেতর একফালি পায়েচলা রাস্তায়। একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় পৌঁছে সে ঘুরল। দেখল শাওনি তার দিকেই আসছে। কাছে এলে প্রদোষ শক্ত গলায় বলল, কী চাই?

সাওনি হাসল। বাবু, দশটা টাকা দিন না!

প্রদোষ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, নেই।

আহা, দিন না! আপনার অনেক টাকা আছে, আমি জানি!

তুমি কে, আমি বুঝতে পেরেছি।

সাওনির কোমরে ব্লাউজটা গোঁজা। একটা স্তন খোলা। বাঁকা হেসে প্রদোষের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কৈ, দিন। বেশি না, দশটাকা।

প্রদোষ জৈবতাবশে ক্রুদ্ধ, কিন্তু সংস্কারবশে বিব্রত, শেষে হাত তুলে বলল, আর একটা কথা বললে থাপ্পড় খাবে!

তার আগেই আমি চ্যাঁচাব। হাসতে লাগল শাওনি। চেঁচিয়ে লোকগুলোকে জড়ো করব। আপনার মেমবউ এসে শুনবে। সেটা কি ভাল হবে?

প্রদোষের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। গলার ভেতর বলল, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ! এখানে একজন পুলিশ অফিসার আছেন।

শাওনি একটুও দমে গেল না।...পুলিশটুলিশ দিয়ে কিছু হবে না। আপনার মেমবউ জেনে যাবে—

প্রদোষ গর্জনের চেষ্টা করল। ...সে বিশ্বাস করবে না এসব কিছু! সে আমাকে জানে।

pathagar.net

শাওনি আরও হাসল। মেম হোক আর যাই হোক, মেয়েমানুষ। আমিও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ কী আমি জানি। কৈ, ছাড়ুন, দেরি করবেন না।

প্রদোষ শেষ চেষ্টার মতো বলল, দেব না।

শাওনি ব্লাউজটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ঝটপট গায়ে ঢোকাল। কোমরের কাপড় ঢিলে করতে করতে বলল, তাহলে আমি চেঁচাই? তারপর মাটিতে পড়ার ভঙ্গি করল।

প্রদোষ দ্রুত প্যান্টের পেছনপকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। সে কাঁপছিল। জীবনে একবার এমন অবস্থায় পড়েছিল। সেটা সানফ্রানসিসকোতে মার্কেট স্ট্রিট নামে একটা রাস্তার গলিতে। মেয়েটি অবশ্য নিগ্রো ছিল। দশ ডলারের নোটটি নিয়ে বলেছিল, ম্যান! হোয়েন ইউ আর ইন দা মার্কেট স্ট্রিট এরিয়া, ইউ মাস্ট্ নো হোয়্যার আর ইউ গোয়িং! ঠিক সেইরকম হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছ, আগে জেনেশুনে তবে যাও? নৈলে এরকম, অথবা আরও সাংঘাতিক কিছু। প্রদোষের কপালে ঘাম ফুটল।

টাকাটা কোমরের কাছে গুঁজে শাওনি মিষ্টি হাসল। চাপা স্বরে বলল, বেশি চাইতে পারতাম। চাইলাম না। আপনার মেমবউয়ের খাতিরে। তবে রেট পঁচিশ। রাত্তিরে ইচ্ছে হলে চোখ টিপে জানিয়ে দেবেন।

সে গাছটির কাণ্ডে ঘষে সিগারেট নেভাল। তারপর হাল্কা পায়ে আগাছার জল ভেঙে উত্তরের ঢালের দিকে চলে গেল। প্রদোষ শ্বাস ছেড়ে ভারি পা ফেলে দেউড়ির দিকে এগোল। ভাবছিল, কথাটা পুলিশ অফিসারটিকে জানানো উচিত কি না।...

ঘনশ্যাম রুদ্র আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন কর্নেলকে। সায়েবচেহারার ওই শাদা দাড়িওলা বৃদ্ধটির হাবভাব এবং অমায়িক কথাবার্তায় সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন সদাশিব চৌধুরি একজন কর্নেলের বন্ধু হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কিন্তু আটকে যাচ্ছে মাথার ভেতর। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর লোক নয় তো? রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসারদের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো হয়।

এই যে হর্ষবাবু! কর্নেল নেমে এলেন কাছে।

ঘনশ্যাম হাসবার ভঙ্গি করলেন। ... আসুন কর্নেলসায়েব! অবস্থা দেখুন। এই আমাদের দেশ!

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে কিছু দেখার পর একটু তপাতে একটা পাথরের স্ল্যাবে বসলেন।... আপনি ঠিকই বলেছেন। প্ল্যানিং-এর পর প্ল্যানিং। অথচ এই অবস্থা।

সায় পেয়ে ঘনশ্যাম সিরিয়াস হলেন। ... সম্ভবত আমূল পরিবর্তন ছাড়া— বিপ্লব বলুন!

ঘনশ্যাম একটু হাসলেন।...বিপ্লব মানেই তো রক্তক্ষয়! রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকা চাই। কে দেবে? আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। গঠনমূলক পথেই আমাদের এগোতে হবে।

কর্নেল জলের দিক আঙুল তুলে বললেন, ওই দেখুন গঠনমূলক পথের অবস্থা। জলের তলায়।

ঘনশ্যাম হাসতে লাগলেন। আপনি নিশ্চয় বাঁধটার কথা বলছেন? দোষ তো বাঁধের নয়, যারা বাঁধ বেঁধেছে, তাদের। তারা দুর্নীতিবাজ!

কুকুরটা মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঘনশ্যামের খুব কাছে এসে পড়ল এবং তাঁর কাছাকাছি আরেকটা চাঙড়ে একঠ্যাঙ তুলে হিসি করল। ঘনশ্যাম বললেন, এ কী! এটা আবার কোত্থেকে এল?

কর্নেল বললেন, আপনারা যেভাবে এসেছেন।

বেচারা! ঘনশ্যাম প্রণীটিকে দেখতে দেখতে বললেন। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের সঙ্গে এখন ওর প্রভেদ নেই, এটাই সান্ত্বনা। আপনি কলকাতার মানুষ। গ্রামের বন্যা হয়তো এই প্রথম দেখছেন। দেখার প্রয়োজন ছিল আপনার জীবনে। একটা অভিজ্ঞতা হল।

কর্নেল হাসলেন। কলকাতাতেও আজকাল বন্যা হয়।

হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি। ...ঘনশ্যাম একটু ইতস্তত করে বললেন। ...একটা কথা মাঝে মাঝে আমার মাথায় আসে। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করি। সামান্য মাইনে পাই। ফলে আমার মধ্যে নানা ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। আপনি কথাটা দয়া করে অন্যভাবে নেবেন না!

না, না। বলুন আপনি! কর্নেল কুকুরটিকে আরেকটি চকোলেট দিলেন। ঘনশ্যাম ব্যাপারটি দেখে মনেমনে রেগে গেলেন। কিন্তু মুখে হাসি এনে বললেন, আগে দেশে এত ঘন ঘন বন্যা হত না। সেইসঙ্গে ধরুন, এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনোখুনি, এত বেশি নৈরাজ্য, দলাদলি ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, তত এসব বাড়ছে। আপনার কি মনে হয় না এসবের পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে?

থাকতেও পারে। হয়তো আছে।

নিশ্চয় আছে। ঘনশ্যাম জোর দিয়ে বললেন। আমি সামান্য শিক্ষক। আমার খালি মনে হয়, কোনো বৈদেশিক শক্তি— অথবা একাধিক বৈদেশিক শক্তি দেশটাকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে চাইছে!

আপনার ধারণা অস্বীকার করা যায় না।

ঘনশ্যাম চাপা স্বরে বললেন, দেশে ইদানিং সায়েব, বিশেষ করে মেমসায়েব এত বেশি সংখ্যায় আসছে কেন? মেমসায়েবরা বউ হয়েও আসছে! তাদের প্রকৃত পরিচয় কী, কে বলতে পারে? তারা সি আই এর চর কি না?

bengalidownload.com

কর্নেল মুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, আপনি কি ক্লারা সম্পর্কে সন্দেহ করছেন কিছু?

ঘনশ্যাম আস্তে বললেন, আমার ধারণা। মেমসায়েবের শাড়ি পরে থাকা, বারবার সবাইকে বলা : আমি হিন্দু, আমি ভারতীয়! কী মানে হয় এর, আমার মাথায় তো ঢুকছে না!

কর্নেল একই গাম্ভীর্যে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমরা যদি ইউরোপীয় সেজে থাকতে পারি, ইওরোপীয়রা এদেশে এসে ভারতীয় সেজে থাকলে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো—

বাধা দিয়ে ঘনশ্যাম বললেন, দুটোর মধ্যে তফাত আছে। আপনি যাই বলুন, মেমসায়েব বাঙালি বউ হয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে পুজো দেখতে যাবে, এটা বাজে কৈফিয়ত। দারোগাবাবু লোকটি বদমেজাজি। নৈলে আমি তখনই— মানে, পাসপোর্ট-ভিসা দেখতে চাওয়ার সময় ওকে ইনসিস্ট করতাম। করলাম না। কারণ পুলিশও তো ধোয়া তুলসীপাতা নয়। যাই হোক, এ বিষয়ে আপনার একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। কারণ আপনি মিলিটারিতে ছিলেন। আপনি একজন প্রাক্তন সৈনিক। আপনি ইনসিস্ট করুন। দেখবেন, ওই ট্যাঁশ ছোকরারও প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে। ওরা দুজনে মৌরীনদীর বাঁধে ডিনামাইট চার্জ করে বাঁধটাকে— বুঝলেন তো?

কর্নেল শুধু বললেন, হুম! তারপর উঠে দাঁড়ালেন। কুকুরটিও পা বাড়াল।

ঘনশ্যাম ডাকলেন, শুনুন! আরও একটা কথা আলোচনার ছিল।

বলুন!

ঘনশ্যাম করুণ হাসলেন। ... আমার ধারণা, প্রত্যেকেরই খিদে পেয়েছে বা পাবে। সে বিষয়ে কিছু করা যায় কি না, আপনিই লিড নিন।

কর্নেল এবার একটু হাসলেন। দরবেশের ঘরে প্রচুর চাল-ডালের স্টক আছে। ভাববেন না। অবশ্য বেশি টাকা দিতে হবে। চাঁদা করে দেওয়া যাবে। রান্নার জন্য বড় পাত্রও আছে। ভাড়ায় পাওয়া যাবে। আমি কথা বলে রেখেছি। আর একটা কথা—

ঘনশ্যাম দ্রুত বললেন, বলুন!

ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম, সব শেষে যে মেয়েটি এসেছে, সে একজন প্রস। আর ডাক্তারবাবু শুনেছেন রিকশোওয়ালা যুবকটির কাছে! এখন কথা হল, সেও আমাদের সঙ্গে খাবে। আশা করি, আপনার আপত্তি হবে না।

ঘনশ্যাম নির্মল হেসে বললেন, তাতে কী? এই দূষিত সমাজব্যবস্থায় দেহ বেচে যারা খায়, তাদের প্রতি ঘৃণা নেই আমার। বরং সিমপ্যাথি আছে।...

কর্নেল ওপরে উঠে গেলেন। তার একটু পরেই আচমকা শাওনি এসে পড়ল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল। ঘনশ্যামের পাশ দিয়ে নেমে জলের ধারে

গেল। পরিব্যাপ্ত জলে শেষবেলার রোদ ঝিলমিল করছে। ঘনশ্যাম দুঃখিত চোখে তাকে দেখছিলেন। তারপর চাপা শ্বাস ফেললেন।

শাওনি ঘুরে বলল, বাবু, দেশলাই আছে?

ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়ে বললেন, না। কেন?

শাওনি আধপোড়া সিগারেটটা দেখাল। তারপর বলল, আপনি খান না সিগারেট?

ঘনশ্যাম মাথা দোলালেন। তাঁর বিস্ময়টুকু, নিজেই টের পেলেন, বাবুজনোচিত সংস্কার। বহুবছর তাঁর কেটেছে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষজনের সঙ্গে এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা ধূমপান করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই যুবতীটিকে তিনি কোন বর্গে ঠাঁই দেবেন, বুঝতে পারছিলেন না। এর পরনের শাড়িটা, ব্লাউজটা এবং চোখেমুখে যে ঝলমলে ভাব— এমন একটা দুঃসময়েও, ঘনশ্যামের কাছে বিসদৃশ ঠেকছিল। একমিনিট পরে তিনি নড়ে উঠলেন। মনে পড়ে গেল, এই মেয়েটিই সবার শেষে এসেছে। কর্নেল এর কথাই এইমাত্র বলে গেছেন। হুঁ, এই তাহলে সেই দেহ-বেচে-বেঁচে-থাকা হতভাগিনীটি! ঘনশ্যাম ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

শাওনি বাঁকা হাসল। দাড়িওলা বুড়ো সায়েবকে চুরোট খেতে দেখেছি। আগুন চাইলাম। বলল কী, নিচের বাবুর কাছে যাও। বুড়ো-হাবড়ার কাছে আগুন থাকে? শাওনির বাঁকা হাসি অশালীনতায় ফেটে পড়ল। তা নিচের বাবু তো এখনও তত বুড়ো হয়নি। সেও বলে, আগুন নেই!

ঘনশ্যাম একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, বাচালতা কোরো না! অন্য কারুর কাছে দেখ গিয়ে।

শাওনি চোখে ঝিলিক এনে বলল, ঠিক আছে। তারপর জলের দিকে আদ্ধেকটা ঘুরে ব্লাউজের বোতাম খুলল। আনমনা ভঙ্গি করে বলল ফের, তুলোভরা 'বেসিয়ের' খানা শুকুতে দিয়েছি আমি। কোন্ নিমেগে লম্পট সেটা জলে ফেলে দিয়েছে। ভাসতে ভাসতে চলে গেল। এখন থাকো খালি বুকে আর লম্পটদের নোলায় জল গড়াক।

এত অশালীনতা সহ্য হল না ঘনশ্যামের। গম্ভীর মুখে বললেন, দেখ মেয়ে, তুমি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ।

কে করছে না? শাওনি পা দিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে বলল। দেউড়ির দিকে রাস্তার অবস্থা দেখতে গেলাম, তো ওই যে মেমওলা লোকটা, সে আমাকে জড়িয়ে ধরতে এল!

ঘনশ্যাম ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেসে ফেললেন, তবু হাসিটি ঘৃণার। বললেন, ওরা তো ওইরকম। ওদের শ্রেণীধরনই তাই। যাই হোক, তুমি চেঁচামেচি করলেই পারতে! এখানে দারোগাবাবু আছেন!

হুঃ, বড়বাবুও তো বাঘের মতো হাঁ করে আছে। কতবার ইশারা করল, চোখ ঠারল—বাব্বাঃ!

banglaidownload.com

ঘনশ্যাম ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। জানি। ওরাও ওদের প্রভুর নকল করে। তা হ্যাঁ গো মেয়ে, তোমার বাড়ি কোথায় ছিল? তুমি এ পথে এলে কেন? বলো, তোমার জীবনের কথা বলো, শুনি।

ঘনশ্যাম জাঁকিয়ে বসলেন। শাওনি জলের ধার থেকে কাছে এল। এত কাছে যে ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকল ঘনশ্যামের। তারপর বারবধূর স্বভাববশে, তাছাড়া এই লোকটিকে যথেষ্ট নিরীহ মনে হয়েছে, শাওনি খপ করে তাঁর পাঞ্জাবির বুকপকেটে হাত পুরে দিল। ঘনশ্যাম হাতটা চেপে ধরলেন এবং বিপথগামিনী এক হতভাগিনীর প্রতি দার্শনিক প্রক্রিয়ায় 'ছিঃ, করে না' এইরকম স্নেহমাখা তিরস্কারের ভঙ্গিতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন। এর ফলে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। ঘনশ্যাম বাঁ হাতে তার গালে থাপ্পড় মারতে গেলেন। কিন্তু চতুরা মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় তার কানের দুলে থাপ্পড়টা পড়ল। দুলের ওপরদিকটা খাঁজকাটা হওয়ার দরুন ঘনশ্যামের হাতের আঙুল ও তালুর সন্ধিতে একটা জায়গা ছড়ে গেল।

এইসময় ওপরদিক থেকে নেমে আসছিলেন ডাঃ ব্রজহরি কুণ্ডু। শেষবেলায় আকাশ পরিষ্কার হয়েছে এবং ঝলমলে রোদ্দুর ফুটেছে। এর ফলে প্রত্যেকেই বিশাল ও প্রশস্ত ঢিবিটার চারদিকে ব্যাকুলতা ও প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রত্যেকের অবস্থা খাঁচায় বন্দী বুনোপাখির মতো। এদিকে রোদ্দুর প্রত্যেককে শুকনো করেছে এবং নেতিয়ে পড়া জবুথবু অবস্থাটি শরীর থেকে ঘুচে গেছে।

প্রত্যেকেই স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। উদ্ধারের জন্য ছটফট করছে। তাছাড়া বিষাক্ত সাপটার কথাও রটে গেছে, আর এই চুল্লুর প্রেতাত্মা—রাতের অন্ধকারের জন্য যে বিভীষিকাটি ওত পেতে আছে!

হরিপদর গান শুনে ব্রজহরির অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ। তাঁর মুখে প্রসন্নতার প্রগাঢ় ছাপ। তিনি এই স্কুলশিক্ষককেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। দার্শনিক আলোচনার উপযুক্ত দোসর হওয়ার সম্ভাবনা যাঁর। বলতে আসছিলেন, বাউল-টাউলের গানই ভাল। ওদের তত্ত্বকথায় মাথামুণ্ডু নেই। দরবেশসায়েবের ইসলামি সুফিতত্ত্বও এইরকম গোমমেলে। তার চেয়ে বড় কথা, বাউল-টাউল বলুন আর যাই বলুন মশাই, ওদের ওই সাধনসঙ্গিনী— মানে মেয়েমানুষের ব্যাপারটা ভারি সন্দেহজনক। আপনি ভেবে দেখুন, ব্রহ্মচর্য মানুষকে পরমাত্মার কাছে সরাসরি পৌঁছে দেয়। এজন্যই নারী সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মনুর উক্তি হল—

ব্রজহরি মনে মনে ঠিক এই কথাগুলি হর্ষনাথ মাস্টারমশাইকে বলতে বলতে নেমে আসছিলেন, কর্নেল একটু আগে তাঁর খোঁজ দিয়েছেন— কিন্তু আচমকা চোখে অশালীন দৃশ্যটি ধাক্কা দিল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরলে গর্জে উঠলেন, ধিক! ধিক! ধিক আপনাকে হর্ষবাবু!

শাওনি প্রায় চোখের পলকে পাশের ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘনশ্যাম রাগে কাঁপছিলেন। মুখ তুলে ভাঙা গলায় বললেন, আমার ফার্স্ট এইড

দরকার। রক্ত পড়ছে। তিনি বাঁ হাতের তালুতে ডানহাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরলেন। বিমর্ষ ও বিপন্ন মুখে ফের বললেন, আপনার কাছে ডাক্তারি ব্যাগ আছে দেখছি! প্লিজ, একটু পট্টি-ফট্টি বেঁধে দিন।

ব্রজহরি বিকৃত মুখে বললেন, আছে। কিন্তু আপনার জন্য কিছুই করব না।

সে কী! ঘনশ্যাম রেগে গেলেন। মানুষের বিপদে-আপদে আপনি ডাক্তার, আপনি—

বাধা দিয়ে ব্রজহরি বাঁকা হেসে বললেন, আপনার লাম্পট্যের শাস্তি আমি এনজয় করতে চাই।

ঘনশ্যাম মুখ নিচু করে রক্তের ফোঁটা দেখতে দেখতে গলার ভেতর বললেন, ঠিক এজন্যই ডাক্তারদের খতম করার স্লোগান দেওয়া হত।

কথাটা না বুঝতে পেরে ব্রজহরি আরও বাঁকা হেসে বললেন, বেশ্যার সঙ্গে প্রেম করছিলেন। প্রেমদংশনে রক্তপাত ঘটেছে!

আপনি— আপনি ভুল দেখেছেন! ঘনশ্যাম চড়া গলায় বললেন। মেয়েটা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল!

আরও বাঁকা কথা বলার জন্য নেমে এলেন ব্রজহরি...সাহস পায় কোত্থেকে? কৈ আমার পকেটে তো হাত ঢোকাতে আসেনি!

ঘনশ্যাম বললেন, আসেনি আসবে। তখন কী করেন, দেখা যাবে। তাও তো আমি থাপ্পড় মেরেছি!

হা হা করে হাসলেন ব্রজহরি। আর আমি একটা বেশ্যাকে বুকে টেনে নেব! আপনার মতো!

ক্ষোভে দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলার ভঙ্গিতে ঘনশ্যাম বললেন, আমাকে আপনি কী ভেবেছেন? আমাকে আপনি জানেন না। তাই এই সব জঘন্য কথাবার্তা বলতে বাধছে না আমার সম্পর্কে।

জানি বলেই তো আপনার কীর্তি দেখে দুঃখ হচ্ছে!

জানেন? বলুন, কে আমি? চার্জ করলেন ঘনশ্যাম। বলুন, কী জানেন আমার সম্পর্কে?

ব্রজহরি নির্বিকার মুখে বললেন, আপনি স্কুল-টিচার বলে পরিচয় দিয়েছেন। আমার সন্দেহ হয়েছিল আপনার হাবভাব দেখে। চোরা চাউনি, জড়োসড়ো বসে থাকা, দূরে-দূরে চলাফেরা, আত্মগোপনের চেষ্টা। কথাটা একবার দারোগাবাবুর কাছে তুলেছিলাম। উনি আমাকে সাপোর্ট করলেন। বললেন, ওয়াচ করব'খন।

ঘনশ্যাম ভেতর-ভেতর নেতিয়ে গেলেন। কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললেন, আপনি আমার পেছনে লেগেছেন বুঝতে পারছি। আপনি আমার ওপর নজর রেখেছেন তাহলে! কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছে, ভুল করবেন না। প্রয়োজনে আমি স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারি।

bengalidownload.com

ঘনশ্যাম বানের জলে রক্ত ধুতে গেলেন। ব্রজহরি একটু দমে গিয়েছিলেন ওই সব কথাবার্তা শুনে। রক্ত ধুতে ধুতে ঘনশ্যাম ঘাড় ঘুড়িয়ে আরক্তিম চোখে তাঁকে দেখলেন। ওই চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ব্রজহরি। এই পবিত্র চিবিতে ইতিমধ্যে একজন বেশ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এবার একজন খুনে প্রকৃতির লোক, সম্ভবত লোকটি দাগী ক্রিমিন্যাল, আবিষ্কৃত হল। ভারি পা ফেলে ঢাল বেয়ে উঠতে হাঁপ ধরে গেল ডাক্তার ব্রজহরি কুন্ডুর।

একটা স্তূপের আড়ালে পৌঁছে কর্নেলকে সামনে পেলেন। কুকুরটির মুখের ওপর চকোলেট ধরে খেলা করছেন কর্নেল। নেড়ি কুকুরটি মুখ উঁচু করে দেঁতো হেসে দু'ঠ্যাং সামনে তুলে যেন নৃত্য করছে। কথাটি বলতেন ব্রজহরি। কুকুরটা দেখে রাগ ও ভয় হওয়ায় অন্য পাশে ঘুরে চলে গেলেন। দারোগাবাবুর উদ্দেশেই।...

উপড়ে পড়া হিজলের মোটা ডালটাতে বসে ঝগড়া করছিল পুঁতি চাক্কুর সঙ্গে। ওই বেশ্যা মাগীটার সঙ্গে তোমার চেনা আছে জানলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে আসতাম না!

চাক্কু বলল, আহা! কথাটা কিছুতেই বুঝছ না তুমি। রিক্শা চালায় যারা, তারা ওদের চিনবে না? সব রিকশোওলা চেনে। বাগানপাড়ার গলিতে রিকশো চালিয়ে খদ্দের পৌঁছে দেয়। চিনবে না?

পুঁতি গাল ফুলিয়ে বলল, চালাকি কোরো না। আমি বুঝেছি।

চাক্কু রেগে গেল এতক্ষণে। ...কলাটি বোঝো তুমি! বেশি রেট পেলে বাগান পাড়ার গলিতে কোন রিকশোওলা ঢুকবে না! আমিও ঢুকেছি। তাতে কী হয়েছে?

পুঁতি চোখ মুছে বলল, একটুও বিশ্বাস করি না। ভাব না থাকলে অমন করে আবার সামনে চোখঠার দিয়ে হাসতে পারে কেউ! তারপর আমাকে পর্যন্ত চোখঠারে যেন কী বলল!

বাজে বোলো না। ওদের ওই স্বভাব। চাক্কু সিগারেট ধরাল। গুম হয়ে বসতে থাকল।

পুঁতি তবু থামল না।...আমি দু'জনের চোখে-চোখে কথা দেখেই বুঝেছি তোমার বরাতে কী আছে! আমি কিছুতেই যাব না তোমার সঙ্গে। সাঁতার কেটে গাঁয়ে ফিরে যাব।

চাক্কু খাপ্পা হয়ে বলল, পারিস তো তাই যা! কান পচিয়ে দিলে মাইরি ; এত করে বলছি— পিরবাবার থান এটা, সিঁথেয় নিজের হাতে সিঁদুর পরিয়ে দিলাম, তবু সন্দ! অত যদি সন্দ, তবে চলে যা!

পুঁতি ডাল থেকে মাটিতে পা রাখল। সোজা দাঁড়িয়ে বলল, যাব। যাবার আগে ওই মাগীর রক্ত দেখে তবে যাব!

পুঁতি ঝোপঝাড় ভেঙে বেগে ওপরে উঠে গেল। চাক্কু ঘুরে তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর একটু হাসল। তিনক্রোশ পথ পেরিয়ে পুঁতি গাঁয়ে ফিরতে পারবে না। ফিরলেও দাঁড়াবে কোথায়! ডুবো গাঁ। হারামজাদি মাসি মেরে ভাসিয়ে দেবে বানের জলে। চাক্কু মুখ নামিয়ে নোখ খুঁটতে থাকল।

একটু পরে গায়ে ছায়া পড়লে সে মুখ তুলে দেখল, শাওনি। শাওনি মুখ টিপে হেসে বলল, কী রে চাক্কু? মেয়েটা অমন করে চলে গেল কেন?

চাক্কু দুঃখে হাসল।...তোকে খুন করতে। তুই মাইরি যা করিস— যাঃ!

শাওনি চাপা স্বরে এবং চোখ নাচিয়ে বলল, কোথায় যোগাড় করলি? সত্যিসত্যি বউ?

হুঁ। বউ ছাড়া কে?

শাওনি ওর হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে টানতে টানতে বলল, সিঁথিয় টাটকা সিঁদুর! বৃষ্টিতে জলে সাঁতরে এসেছিল। আর সিঁথিয় টাটকা সিঁদুর! এই দেখ আমার সিঁদুরের অবস্থা! দেখতে পাচ্ছিস?

চাক্কু বলল, শাওনি! ছেনালিপনার জায়গা না এটা। পাছায় এমন লাথি মারব, জলে গিয়ে পড়বি। বাগানপাড়ায় গলিতে যা করার করিস। এখানে নয়।

শাওনি এক'পা পিছিয়ে ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, তোকে বিশ্বাস নেই। তাও পারিস! একটা কথা বলব, শুনবি?

চাক্কু তাকাল। কিন্তু চোখে মিটিমিটি হাসি।

শাওনি ফিস ফিস করে বলল, ছুঁড়িটা তোর বউ-টউ না। ভাল খদ্দের আছে, দিবি?

শাওনি! চাক্কু গর্জন করল।

পাঁচশো টাকা পাবি। শাওনি একই সুরে বলল। গাঁদাকে জিগ্যেস করিস। সে একটা ছুঁড়ি এনেছিল গাঁওয়াল থেকে। এটার চেয়ে পুরুষ্টু। শাওনি সেই মেয়েটির বুকের মাপ দেখাল। পুঁতির বুকের সঙ্গে যে উপমাটা দিল, তা অশ্লীল। তারপর ফিক করে হাসল।...যে খদ্দেরের কথা ভেবে নিয়ে যাচ্ছিস, তাকে আমি চিনি। গুলাই তো? আমার খদ্দের এক বাবু। খুব বড়লোক। একেবারে বোম্বাই চালান করে দেবে— তোর গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেবে না।

চাক্কু তার ব্যাগে হাত ভরে একটা কী বের করল। সেটা থেকে বেরিয়ে এল চকচকে ইঞ্চি ছয়েক ফলা। কদর্য গাল দিয়ে বলল, মাগীর গলা কেটে ভাসিয়ে দেব বানের জলে— ফের যদি একটা কথা বলেছিস!

শাওনি বাঁকা হেসে বলল, আচ্ছা! দেখা যাবে!

সে হাল্কা পায়ে ঢাল বেয়ে উঠে গেল। চাক্কু শ্বাস ফেলে স্প্রিংয়ের চাকুটা বন্ধ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর পুঁতিকে খুঁজতে গেল। তার ভাবনা হচ্ছিল, পুঁতি বিপন্ন।...

bengalidownload.com

বাউল হরিপদ ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ করে বলল, দারোগাবাবু! এবার অনুগ্রু করে হরিপদকে ছুটি দিন।

বাউলগান শুনে বংকুবিহারীর মনে উড়ু-উড়ু ভাব। মিঠে হেসে বললেন, ছুটি নিয়ে যাবি কোথায় বাবা? চতুর্দিকে তো অথৈ সমুদ্র— কূলকিনারাহীন!

হরিপদ হাসল। ...এ সঙ্কটে গুরুই ভরসা দারোগাবাবু! গুরুই উদ্ধার করবেন।

সে একতারাটি পিড়িং পিড়িং করতে করতে উঠে গেল। সূর্য জলের ওপর ঝুঁকে এসেছে। অপার জলে লালচে ছটার ঝিলিমিলি। বংকুবিহারী এতক্ষণে ইউনিফর্ম পরলেন। রিভলবার, বেল্ট ইত্যাদিতে ফের আইনরক্ষকে রূপান্তরিত হলেন। ক্ষিদে পেয়েছে। দরবেশবাবার ঘরে চালডাল থাকা সম্ভব। দেখা যাক।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কেউ ডাকল, দারোগাবাবু, অমনি প্রচণ্ড চমকে অভ্যাসবশে রিভলবারের বাঁটে হাত চলে গেল বংকুবিহারীর। প্রেতাত্মায় তাঁর বিশ্বাস আছে। কেমন নাকিস্বরে ডাক, ভেবেছিলেন চুল্লু। কিন্তু দেখলেন, চুল্লু নয়, একটি মেয়েমানুষ। ভুরু কুঁচকে বংকুবিহারী বললেন, অ্যাই মাগী! লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছিস কেন?

শাওনি জিভ কেটে বলল, ওম্মা! সে কী কথা! একটা নালিশ করতে এসে গালমন্দ খেলাম!

ছেনালি রাখ্। কী নালিশ তোর?

শাওনি খুঁ খুঁ করে কান্নার ভঙ্গি করল।...হতে পারি বেশ্যা! পেটের দায়ে খাতায় নাম লিখিয়েছি। তাই বলে কি মানুষ নই? আপনি এর একটা বিহিত করুন, দারোগাবাবু!

বংকুবিহারী একটু শান্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

শাওনি ফুঁপিয়ে উঠল...জামাকাপড় শুকোতে যেখানে যচ্ছি, একলা পেয়ে মিনসেরা আমাকে টানাটানি করছে।

হ্যা হ্যা করে হাসলেন বংকুবিহারী।...তুই কি সতীলক্ষ্মী? তোর হাত ধরে টানল তো কী হয়েছে? পয়সা চাইলেই পারতিস। নালিশের কী আছে এতে? অ্যাঁ?

শাওনি চোখ মুছে বলল, হুঁঃ, পয়সা! তার বেলা নেই কেউ।

ভুরু নাচিয়ে বংকুবিহারী চাপা স্বরে বললেন, নাম বল্ শুনি!

শাওনি বলল, ওই মেমওলা বাবু—তাপরে...

দ্রুত আইনরক্ষক বললেন, বলিস কী!

আপনার দিব্যি। এ পিরবাবার থান।

হ্যাঁ রে, ওর তো জার্মান তরুণী বউ। ওর তোকে পছন্দ হল?

শাওনি ঠোঁট বাঁকা করে বলল, জানেন না, ঘরে সুন্দর-সুন্দর বউ ফেলে লোকে আমাদের কাছে আসে? আসে না— বলুন?

বংকুবিহারী ভেবে বললেন, হুঁ। তা সত্যি। তবে ওই ছোকরার ব্যাপারে আমি নাচার। ওর মামা এম এল এ। দুঁদে লোক। রাইটার্সে কথা তুললে আরও অখাদ্য জায়গায় বদলি করে দেবে। চেপে যা! আর কে বল্!

শাওনি বলল, ওই যে লম্বা নাক— আধবুড়ো লোকটা...

বুঝেছি। স্কুলটিচার— কী যেন নামটা? বংকুবিহারী ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।...এই বিপদেও মানুষের আদিরিপু মাথা চাড়া দেয়, ভাবা যায় না। মানুষ এক হারামজাদা জীব, বুঝলি? প্রত্যেকটা মানুষ বর্ন ক্রিমিনাল। কেউ পারে, কেউ পারে না— এই আর কী! বুঝলি কিছু?

শাওনি বলল, আর ওই পেটমোটা ডাক্তারবাবু!

যাঃ! জিভ কেটে বংকুবিহারী বুটে পা ঢোকালেন এবং চাঙড়ে বসলেন। মোজা শুকোয়নি। তুই এটা একেবারে বানিয়ে বলছিস! ডাক্তার কুণ্ডুকে আমিই চিনি। ধার্মিক মানুষ। বিয়ে পর্যন্ত করেননি।

শাওনি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, আপনি পুলিশের লোক। কিন্তু আমি বেশ্যা। আপনার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ চিনি।

বংকুবিহারী মোজা দুটো কাঁধে রেখে হাসলেন।...ঠিক আছে। আর?

আর রিক্শাওলা ছোঁড়া।

ওর তো সঙ্গে বউ আছে!

বউ ঝগড়া করে দরবেশবাবার কাছে বসে আছে। শাওনি চাপা স্বরে বলল, আমার একটা সন্দেহ হয়েছে। ছুঁড়িটাকে ভাগিয়ে নিয়ে বেচতে যাচ্ছে ছোঁড়াটা। জেরা করুন, গুঁতোর চোটে বেরিয়ে পড়বে।

কথাটা মনে ধরল বংকুবিহারীর। ভুরু যথেষ্ট কুঁচকে বললেন, দেখছি।

শাওনি দমআটকানো গলায় বলল, আমাকে ধরে টানাটানি করছিল। শেষে চাকু বের কল। ওর ব্যাগে ইস্পিরিং-এর চাকু আছে। এতটা বড়ো!

বংকুবিহারী সিরিয়াস হয়ে বললেন, তখন তুই ওর সঙ্গে শুয়ে পড়লি?

না। বিনি পয়সায় আমি কারুর সঙ্গে শুই না। দৌড়ে পালিয়ে এলাম। আপনাকে নালিশ করতে এলাম।...শাওনি ঠোঁট কামড়ে একটা ভঙ্গি করল, যেন সে ক্রুদ্ধ কিন্তু অসহায়।

বংকুবিহারী হঠাৎ ফিক করে হাসলেন।... হ্যাঁ রে, ওই কর্নেলবুড়ো কিছু বলেনি তো?

শাওনিও হাসল।...বুড়োসায়েবের শরীলে আর আগুন নেই। কুকুর নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে।

বংকুবিহারী উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়িয়ে বললেন, প্রব্লেম হল, তুই একজন বেশ্যা। ওরা তোর বিরুদ্ধে পাল্টা চার্জ আনলেই মামলা কেঁচে যাবে। তবে ওই রিকশোওলা ছোঁড়াটার কাছে ডাগার আছে বললি। সেটা সিজ করে নিচ্ছি। আর শোন, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

pathagar.net

শাওনি কাছে গিয়ে বলল, বলুন!

আইনরক্ষক চাপাস্বরে বললেন, ওই মেমসায়েবটার দিকে নজর রাখতে পারবি. ও কী করছে, কার সঙ্গে কী কথা বলছে-টলছে, কিছু আঁকছে-টাঁকছে কি না...

শাওনি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, বুঝেছি।...

ক্লারা পাথরের স্ল্যাবে বসে জলে শাদা পা ছড়িয়ে সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করছিল। পায়ের শব্দে ঘুরে শাওনিকে দেখতে পেল। মিষ্টি হেসে ডাকল, এস তুমি। এখানে বসো। এস এস।

শাওনি একটু তফাতে বসে বলল, দিদি, আপনি আমাদের কথা বলতে পারেন?

কেন পারব না? ক্লারা গর্বিত ভঙ্গিতে বলল। বলছি না? আচ্ছা, এবার বলো, তোমার নাম কী?

শাওনি।

শাওনি কথার মানে জানো তুমি?

হুঁউ। শ্রাবণ মাসে জন্মো তাই মা নাম রেখেছিল শাওনি।

তুমি খুব ভাল মেয়ে। ক্লারা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত নিল।...তোমার হাতের সঙ্গে আমার হাতের পার্থক্য শুধু রঙের। কারণ আমি বিষুব রেখার বহু দূরে উত্তরে জন্মেছিলাম। তুমি বিষুব রেখার দিকে কর্কটক্রান্তিতে। ও! তুমি কতটা লেখাপড়া করেছ, শাওনি?

আমি লেখাপড়া জানি না। শাওনি মেমসায়েবকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তার হাতটাতে অস্বস্তি। গা ঘিনঘিন করা সাদাটে হাত। যেন চামড়াছাড়ানো হাত।

ক্লারা বলল, তুমি কিছু কাজ করো কি? কী কাজ করো?

কিছু না।

ক্লারা হেসে ফেলল। ...বুঝলাম। তোমার স্বামী করে। সে কী করে?

শাওনি ফোঁস করে উঠল। অত কথায় কী কাজ?

ক্লারা হাসতে লাগল।...তুমি হঠাৎ রেগে গেলে কেন? আমি শুনেছি, ভারতের লোকেরা এসব প্রশ্ন শুনলে খুশি হয়। যাইহোক, দেখছি কথাটা ভুল। ঠিকই তো । অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ শিষ্টতা-বহির্ভূত আমি তোমাকে এসব প্রশ্ন আর করব না।

শাওনি হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। ক্লারা মজা পেয়ে গেল। বলল, তুমি আমাকে দিদি বলেছ। চলো, তোমাকে আমিই মিষ্টান্ন খাওয়াব— তার আগে ছাড়ব না। এবং তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্তও।

ক্লারা তাকে টেনে ওঠাল। শাওনি টের পাচ্ছিল মেমসায়েবের গায়ে জোর আছে। পা বাড়ালো শাওনি। আস্তে বলল, হাত ছাড়ুন যাচ্ছি।

ক্লারা বলল, কিছুতেই নয়। দরকার হলে আমার বোনকে তুলে নিয়ে যাব!

ক্লারা! ক্লারা!

ক্লারা মুখ তুলে দেখল প্রদোষ দাঁড়িয়ে আছে ওপরে। ক্লারা বলল, একজন বোন পেয়েছি।

প্রদোষ একলাফে নেমে এল। ...হোয়াট ডু ইউ থিংক ইউ আর ডুয়িং? সি ইজ আ প্রসটিটিউট আ ব্ল্যাকমেলার!

ক্লারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে শাওনি একঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। সে 'প্রস' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। বাঁকা হেসে বলল, পস! তখন 'পস' কে ধরে টানাটানি করতে খুব মজা লাগছিল, তাই না? দশটা টাকা দিয়ে ভিজে মাটিতে শোওয়ার জন্য পায়ে ধরতে বাকি! বলব না ভেবেছিলাম, বলিয়ে ছাড়লে!

প্রদোষ হুংকার দিয়ে ঘুসি তুলে ঝাঁপ দিল বারবধূটির দিকে। কিন্তু ক্লারা তাকে ধরে ফেলল। শাওনি দৌড়ে ঝোপঝাড় ভেঙে পালিয়ে গেল।

প্রদোষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আই মাস্ট কিল দা ডার্টি বিচ!

ক্লারা তাকে ছেড়ে দিল।

প্রদোষ দম নিয়ে বলল, সি ইজ আ ব্ল্যাকমেলার। আই শুড ন্যারেট দা ইনসিডেন্ট লেটার অন। লেটস গো ব্যাক, বেবি!

ক্লারা তার চোখে চোখ রেখে নির্বিকার মুখে বলল, তোমাকে এই শেষবার বলছি, প্রদোষ। তুমি আমাকে ইংলিশ বলবে না। যদি জার্মানভাষা শিখতে পারো— বলবে, নতুবা বাংলা বলবে, যদিও আমি জানি, তুমি জার্মানভাষা শিখবে না। তুমি এমন মানুষ প্রদোষ, যে হাত বাড়িয়ে সবকিছু চায়, কষ্ট করে না। ভারত ইংলিশম্যানেদের উপনিবেশ ছিল। সুতরাং ইংলিশ শেখা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি ভারতীয়। তুমি জানো না ইংলিশম্যানরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে। আমেরিকাবাসীরা করে না।

ক্লারা হাল্কা পা ফেলে ঢাল বেয়ে দরগার দিকে উঠে গেল। প্রদোষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বেশ্যা-মেয়েটা সম্ভবত তাকে আবার ব্ল্যাকমেল করে গেল। একটা কিছু করা দরকার। তার চোয়াল আঁটো হয়ে গেল।...

একটি তালডোঙা

কুকুরটা খেলতে-খেলতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে ভেউ-ভেউ করে উঠল। যেন কাউকে ধমক দিচ্ছে সে। কর্নেল হাসলেন।... চুল্লুকে দেখতে পাচ্ছিস নাকি রে? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুই লুল্লু। কী? নামটা পছন্দ হল তো? কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। কুকুরটা ঢিবির উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে কাকে ধমক দিতে-দিতে এগিয়ে চলেছে। কর্নেল শিস দিলেন। আ-তু-তু ডাকলেন দিশি প্রথায়। শেষে ধমক দিলেন, লুল্লু! ফিরে আয় বলছি! কুকুরটা— লুল্লু ফিরল না।

banglabook.org

সূর্য ডুবে গেছে। খোঁড়া পিরের দরগার জঙ্গলে ফাঁকে-ফোকরে লালচে রোদ্দুরের ফালিগুলি মুছে দিয়েছে আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতা। পোকামাকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে, চাপা, দূরবর্তী এবং বিস্তৃত। মাথার উপর গাছপালার ঘন ডাল ও পাতা। আকাশের অবস্থা বোঝা যায় না। কুকুরটা কোথায় চলেছে দেখার জন্য পা বাড়ালে সাপের কথা মনে পড়ল কর্নেলের। পাতলুনের পকেট থেকে ছোট্ট কিন্তু জোরালো টর্চটি বের করলেন। এখনও যথেষ্ট আলো আছে বলে জ্বাললেন না। একটু পরে জলের শব্দ শুনতে পেলেন। ঢিবিটা চারদিক থেকে ঘিরে জলের মারমুখী চেহারা এবং উত্থান। ঘণ্টা দুই আগে এইসব মাদারগাছের অনেক নিচে জল দেখেছিলেন। এখন ঢালু মাদারগাছের জটলার ভেতর জল। বন্যা বাড়ছে— তবে ধীরে। কর্নেল ডাকলেন, লুল্লু!

লুল্লু মাদারগাছের পাশে উঁচু চাঙড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কাকে শাসাচ্ছিল। তার পাশে গিয়ে অবাক হলেন। একটা কালো তালডোঙা— তালগাছের গুঁড়ি কেটে বানিয়ে যাতে আলকাতরা মাখানো হয়, শেকড়ে বাঁধা। শেকড়টা নেমে গেছে একটা শিরীষগাছ থেকে। শেকড়ের পাশে ঘন ঘাস। ঘাসগুলোর পাতা চ্যাপ্টা, লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। সবে সোজা হচ্ছে।

কেউ ডোঙা বেয়ে এসেছে এবং দ্রুত সেটা বেঁধে রেখে দরগায় গেছে। ঘাসের ভেতর গামবুটে-ঢাকা একটা পা নামিয়ে বাঁদিকে মাদার-জঙ্গলের পেছনটা দেখতে উঁকি মারলেন কর্নেল। কারণ লুল্লু সেদিকে মুখ ঘুরিয়েছিল।

কাউকে দেখতে পেলেন না। ডোঙাটার ভেতর ফুট সাতেক লম্বা একটা বৈঠা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে বৈঠাটা তুলে নিলেন কর্নেল। একটু ভাবলেন। তারপর শেকড় থেকে দড়িটা খুলে ডোঙায় উঠলেন। ভীষণ টলমলে এই ধরনের জলযানে চাপার অভ্যাস তাঁর আছে। ব্রাজিলের অববাহিকার দুর্গম জঙ্গলে হিংস্র উপজাতি নিভারো ইন্ডিয়ানরা ঠিক এইরকম ক্যানো ব্যবহার করে। ডোঙাটা বেয়ে ঢিবির পূর্ব দিকে পৌঁছুতে সেই স্মৃতি ফিরে এল এবং চলে গেল। একটু দূরে ডুবন্ত অথই পিচরাস্তার ওধারে বাঁকা বনটা কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের মতো। লুল্লু ঢিবির কিনারা ধরে তাঁকে অনুসরণ করছিল। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘুরে ঢালু পাড়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে-থাকা ঝোপের কাছে পৌঁছে আবার একটু ভাবলেন কর্নেল।

ডুবন্ত ঝোপের ভেতর ঢুকে বৈঠা দিয়ে জলের গভীরতা দেখে নিয়ে কর্নেল ডাঙার কাছে গেলেন। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেললেন। নেমে ডোঙাটা কাত করে ধরলেন। জল ঢুকতে ঢুকতে ডোঙাটা ডুবে গেল। সেটাকে জলের ভেতর ঝোপের তলায় ঠেলে দিলেন। ডোঙাটার কোনো চিহ্ন রইল না। বৈঠাটাও ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে উঠে এলেন। দেখলেন, লুল্লু নেই।

লুল্লুর দেখা পাওয়া গেল বিধ্বস্ত দেউড়ির কাছে। সেখানে উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে শাওনি। লুল্লু তার কাপড় শুঁকছে আর লেজ নাড়ছে। কর্নেলের

পায়ের শব্দে শাওনি ঘুরল। মুহূর্তের জন্য কর্নেলের মনে হল সে ভীষণ চমকে উঠেছে। কিন্তু সেই সময় ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডুর ডাক শোনা গেল, কর্নেলসায়েব! কর্নেলসায়েব! সঙ্গে-সঙ্গে শাওনি প্রাঙ্গণ পেরিয়ে হন্তদন্ত চলে গেল।

ব্রজহরির পাশ দিয়ে যাবার সময় সম্ভবত মেয়েটা কিছু রসিকতা করে গেল। কারণ ব্রজহরি হুংকার ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। থাপ্পড়ের ভঙ্গিতে ডানহাতটা উঠে ধীরে নেমে গেল। কর্নেল ডাকলেন ডাক্তারবাবু!

ব্রজহরি একটু হাসলেন। আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বলুন!

চাপাস্বরে ব্রজহরি বললেন, ফকির-দরবেশ এমন গলাকাটা দোকানদারি করতে পারে, ভাবা যায় না। পঞ্চাশ টাকায় রফা হল। তাও চাল-ডালের যা পরিমাণ, এতগুলো লোকের আধপেটা হবে। কুমড়ো আছে শুনলাম। বলে, দেওয়া যাবে না। জ্বালানি কাঠের পাঁজা আছে ঘরভর্তি। খানকতক চেলা কাঠ দিয়ে বললে এতেই হয়ে যাবে। হরিপদ ওই ভাঙা ঘরটার ভেতর উনুন বানাচ্ছে। আমরা দু'জনে রাঁধব। আর—

বলুন!

ব্রজহরি কাঁচুমাচু মুখে বললেন, মেমসায়েব পুরো টাকা দিতে যাচ্ছিল, তা কি উচিত? শেষ পর্যন্ত চাঁদা করে চল্লিশ উঠেছে— মানে, আমি পাঁচ, মেমসায়েব আর এম এল এ-র ভাগ্নে মিলে দশ, টিচার ভদ্রলোক পাঁচ, রিকশোওলা আর তার বউ দশ— ওই মেয়েটাকেও দু'মুঠো দেওয়া হবে, তবে ওঁর চাদা নেওয়া হবে না, এখন—

কর্নেল দ্রুত পার্স বের করে একটা কড়ি টাকার নোট গুঁজে দিলেন ওঁর হাতে।

ব্রজহরি ফ্যাঁচ শব্দে হাসলেন।...ভগবানের আশীর্বাদে রাতটা ভালয়-ভালয় কাটলে আগামীকাল দেখবেন, ঠিকই রিলিফের নৌকো আসবে। বলে আবার গলা চাপলেন।...একটা কথা বলি! এভাবে ঘুরবেন না একা-একা। জায়গাটা ভাল না।

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গিতেই বললেন, আপনি কি চুল্লুর কথা ভাবছেন?

আমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি। ব্রজহরি ঝটপট বললেন। তা ছাড়া একটু আগে—

উনি ভয়-পাওয়া মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে কর্নেল বললেন, কিছু কি দেখেছেন?

দেখেছি। ব্রজহরি ফিসফিস করে বললেন। এদিকে-সেদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ ওদিকে গাছপালার আড়ালে যেন কালো রঙের একটা কিছু— যাই হোক, আসুন। টাকা না দিলে দরবেশ ব্যাটাচ্ছেলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। লোকটা খাঁটি, ফকির-দরবেশ নয়।...

banglidownload.com

সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টা

আবার ঝিরিঝিরে বৃষ্টি। বারান্দায় অন্ধ দরবেশ নমাজের পর ধ্যানে বসেছেন। বুকে চিমটে ঠুকছেন। ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। তাঁর সামনে ঘরটা বন্ধ। তালা আঁটা। পাশের ঘরে ছেঁড়া সতরঞ্জি বিছিয়ে বসে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন লোক। এখন গম্ভীর, নিশ্চুপ ও বিমর্ষ। ক্লারা দরজার কাছে ঘনশ্যাম কোণে। পুঁতি-চাক্কু মাঝামাঝি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। বংকুবিহারী মাঝখানে হাঁটু দুমড়ে বসেছেন। শাওনি ক্লারার কাছে বসে অন্ধকারে বৃষ্টি পড়া দেখছে। পাশের ভাঙা ঘরটাতে ব্রজহরি ও হরিপদ খিচুড়ি রান্না করছেন। কর্নেল বারান্দায় বসে উনুনে ঝলসে-ওঠা দুটি মুখ দেখছিলেন। দুটি মুখই মাঝে-মাঝে হেলে-পড়া ছাদটির দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। ঝুলন্ত কড়িকাঠের ওপর ছাদটা কোনোক্রমে আটকে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। ধোঁয়ায় নাক-মুখ কুঁচকে ব্রজহরি হাতা দিয়ে প্রকাণ্ড ডেকচির ফুটন্ত চাল-ডাল নাড়তে থাকলেন। হরিপদ গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। বৃষ্টির শব্দের ভেতর ফোঁপানির মতো সুরটা।

বৃষ্টি এসেই সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। কোণঠাসা করে ফেলেছে। বিকেলের রোদ্দুরটা খুব আশা যুগিয়েছিল। ফলে জোট ভেঙে লোকগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা এবং আবার বৃষ্টি তাদের একত্র করেছে। তা ছাড়া চুল্লু!

কর্নেল লুল্লকে খুঁজছিলেন। ব্রজহরির সঙ্গে এখানে আসার সময় কুকুরটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর আর তার পাত্তা নেই। সম্ভবত বৃষ্টির শুরুতে সে কোনো ভাঙা ঘরের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি দেখে সে-ও কি আতঙ্কে চুপ করে গেল?

বৃষ্টি বাড়ল। বাতাস উঠল। তখন দরবেশ আচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, চুল্লু!

বংকুবিহারীও অমনি চাপাস্বরে ডাক দিলেন, কর্নেল!

বলুন!

বারান্দায় ছাঁট লাগছে না? এখানে আসুন।

কর্নেল টর্চ জ্বেলে পাশের ঘরে গেলেন। তখনও দরবেশ চাপা-গলায় বলছেন, চুল্লু! চুল্লু! চুল্লু! বংকুবিহারী হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমার টর্চটা সেপাইদের কাছে থেকে গেছে। জানি না বরাতে কী ঘটল! একেবারে ইন্টিরিয়ারে তো! প্রিমিটিভ অবস্থা যাকে বলে!

কর্নেল হাসলেন।...আপনার দাগী আসামির কথাও ভেবে দেখুন!

ওর কিছু হয়নি। বংকুবিহারী আস্তে বললেন। ও ব্যাটাকে চেনেন না। ওর নাকি অনেকগুলো প্রাণ। সহজে যাবার নয়।

চাক্কু বলল, কার কথা বলছেন সার?

বংকুবিহারী বললেন, হ্যাঁরে, চাক্কু না ফাক্কু, ইসমাইলকে চিনিস?

আজ্ঞে নাম শুনেছি। চোখে দেখিনি কখনও।

চুপ ব্যাটা! তুই ইসমাইলের চেলা! তোকে দেখেই বুঝেছি।

চাক্কু হাসল। ...বিপদের সময় এটা কী একটা কথা হল সার? সবাই জানে আমি রিকশো চালিয়ে খাই। ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করুন। তা'পরে এই শাওনিকে জিগ্যেস করুন!

বংকুবিহারী হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, কর্নেল! একবার টর্চ জ্বালুন তো! প্লিজ! আমি দেখাচ্ছি।

কর্নেল ক্ষুদে টর্চটি জ্বাললেন। বংকুবিহারী হাত বাড়িয়ে খপ করে চাক্কুর ঝোলাটা টেনে নিলেন। চাক্কু ভড়কে গেল। বংকুবিহারী ঝোলাটা উপুড় করে ধরলেন। একটা হাফপ্যান্ট, লাল গেঞ্জি, চিরুনি, একটা মানিব্যাগ, আধ-শুকনো একটা লুঙ্গি ছড়িয়ে পড়ল। বংকুবিহারী চার্জ করলেন, ড্যাগারটা কোথায় লুকোলি? কাছে আয়। সার্চ করি।

চাক্কু বলল, করুন সার্চ। তবে ড্যাগার একটা ছিল। রাতবিরেতে বদমাশ পেসেঞ্জার—

চুপ। কোথায় রেখেছিস ড্যাগার?

জানি না। আমারও তো অবাক লাগছে। ব্যাগেই ছিল।

বংকুবিহারী ওকে দাঁড় করিয়ে রীতিমতো সর্বাঙ্গে 'সার্চ' করলেন। কর্নেল বললেন, টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে দারোগাবাবু! ক্ষমা করবেন। বলে টর্চ অফ করে দিলেন।

বংকুবিহারী বললেন, তোর বউকে জ্বালান করেছিস! দেখি, ওর ব্যাগটা দে!

বারান্দার কোণে দরবেশের ঘরের দরজার পাশে রাখা মিটমিটে হেরিকেনের আলো টেরচা হয়ে এ-ঘরে ঢুকেছিল। পুঁতি হতবাক্। তার ব্যাগেও ছোরাটা নেই। বংকুবিহারী বললেন, শাওনি! ওর বডি খুঁজে দ্যাখ তো!

শাওনি পুঁতির গায়ে হাত দিতে গেলে পুঁতি ধাক্কা দিল ওকে। ক্লারা বলে উঠল, এ কী হচ্ছে? কী করছেন আপনারা? এমন বিপদের মধ্যে আইনের কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়। কর্নেল, আপনি ওদের বলুন। বাধা দিন।

দরবেশ হাঁক দিলেন এইসময়, চুল্লু! তারপর বাইরে কী একটা ঘটল। কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। ব্রজহরি ও হরিপদকে বারান্দায় দেখা গেল। ব্রজহরি ভাঙা গলায় বললেন, ছাদটা ধসে গেল। একচুলের জন্য বেঁচে গেছি।

হরিপদ বলল, হায় গুরু! এতগুলো লোকের মুখের আহার! হায় হায় গো!

ব্রজহরি গর্জন করলেন, এমন হবে জানতাম। সবই জানি, কেন এমন হচ্ছে। কেন আবার নেচার ক্ষেপে গেল, কেন মুখের খাদ্য ধ্বংস হল— ক্লারা বলল, কেন, আপনি বলুন। আমরা শুনি।

banglidownload.com

ব্রজহরি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এবং ইংরেজিতে, যেহেতু ক্লারা মেমসায়েব। ইউ নো ম্যাডাম, দা ডেভিল! ইউ নো হিম ওয়েল। অলসো ইউ নো দা স্টোরি অফ দা বাইবেল— দা সেক্রেড বুক অফ ইওর রিলিজিয়ন, ম্যাডাম—

আপনি বাংলায় বলুন! আমি জার্মান। ইংলিশ জানি না।

ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু গ্রাহ্যই করলেন না। দা স্যাটান লেট লুজ! শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। হেয়ার ইজ দা সিম্বল! এ প্রসটিট্যুট! দা ডেভিলস্ ডটার ইজ ইন দিস্ সেক্রেড প্লেস, ম্যাডাম! তারপর যুগপৎ কর্নেল ও বংকুবিহারীর উদ্দেশে বললেন, কর্নেলসায়েব! দারোগাবাবু! আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি-না জানি না, আমি করেছি। আমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। যে মুহূর্তে ওই হারামজাদি মেয়েমানুষটা এ মাটিতে পা দিয়েছে, তখন থেকে একটার পর একটা বিপদ ঘটছে কি-না বলুন!

শাওনির হাসি শোনা গেল। ...ওরে ড্যাকরা মিনসে! আমি বুঝি না কাকে ইংরিজি-মিংরিজি করে গাল দেওয়া হচ্ছে? আমি নেকি?

ব্রজহরি তীক্ষ্ণদৃষ্টে আবছা আঁধারে তাকে দেখার চেষ্টা করে বললেন, বেরো! বেরিয়ে যা বলছি!

শাওনি চ্যাঁচাল। ...তুই বেরো! ডাক্তার না ফাকতার! জল বেচে টাকা খায়, তার আবার বড় বড় কথা? তুই জল বেচে খাস, আমি শরীল বেচে খাই। খাবো।

ব্রজহরি ভাঙা গলায় বললেন, আপনারা সহ্য করছেন? দারোগাবাবু! কর্নেল!

বংকুবিহারী বললেন, আহা! জানেন তো ওরা ওই রকমই। কেন ঘাঁটাতে গেলেন ওকে?

শাওনি দারোগাবাবুর সাহসে আবার চ্যাঁচাল। ভেংচি কেটে বলল, স-ই-হ্য করছেন! স-ই-হ্যওলা ডাক্তারবাবু রে আমার! তখন জলের ধারে একলা পেয়ে পিরীত করতে লজ্জা করেনি?

ব্রজহরি মুখে দু হাত চাপা দিয়ে হো হো করে কেঁদে ফেললেন। বসে পড়লেন ধপাস করে। বাউল হরিপদ ফোঁস করে নাক ঝেড়ে কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, হা গুরু! জয় গুরু! এ কী হচ্ছে গো বাবার দরগায়!

ঢিবি জুড়ে গাছপালা দুলছে, টালমাটাল হচ্ছে, মেঘ গর্জে-গর্জে উঠছে, বিদ্যুতের ছটায় ছটায় ঝলসে উঠছে মুহূর্তকাল, আবার বৃষ্টিময় অন্ধকার মুঠোয় চেপে ধরছে সব কিছু, এবং দরবেশ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, চুল্লু! তখন ঘনশ্যামের কথা শোনা গেল, যা আরও ভয়ঙ্কর : এ ঘরখানা ধসে পড়বে না তো?

বংকুবিহারী ব্যস্তভাবে বললেন, কর্নেল! টর্চ জ্বালুন তো! মনে হল জল চোঁয়াচ্ছে ছাদ থেকে।

কর্নেল ছাদে টর্চের আলো ফেললেন। সত্যি জল চোঁয়াচ্ছে কয়েকটা জায়গায়। চাকু দেশলাই জ্বালনোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। প্রদোষ লাইটার জ্বেলে বলল, টর্চ আনতে ভুলে গেছি!

শিগগির সে লাইটার নিভিয়ে দিল। ক্লারা বলল, চলুন, আমরা বারান্দায় যাই।

তার বলার তর সয়নি কারুর, ভিড় করে চলে এল বারান্দায়। ধাক্কাধাক্কিও হল খানিকটা। কিন্তু দরবেশ হাত বাড়িয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দিলেন। বংকুবিহারী বললেন, আশ্চর্য! নেভালেন কেন?

অন্ধ দরবেশ বুকে চিমটে ঠুকতে ঠুকতে আওড়ালেন, চুল্লু!

রাখুন মশাই আনপার চুল্লু! বংকুবিহারী খাপ্পা হয়ে বললেন।— কর্নেল! টর্চ জ্বালুন। হেরিকেনটা জ্বালা দরকার।

কর্নেল টর্চ জ্বালালেন। বংকুবিহারী হিংস্রভাবে হেঁটে হেরিকেনটা আনতে যাচ্ছেন, দরবেশ এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। হেরিকেনটা তুলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। বংকুবিহারী বললেন, আশ্চর্য!

আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। মেঘের গর্জন। বংকুবিহারী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সাধুসন্ত মানুষরা কেন পাগল হয়, বুঝি না!

ব্রজহরি সামলে নিয়েছেন। ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বললেন, হয়। আসলে আমরা সাধারণ মানুষেরা মেটিরিয়্যালি বিচার করে সাধুসন্ত ফকির দরবেশদের পাগল বলি। কিন্তু স্পিরিচ্যুয়ালি দেখলে, ওটাই স্যানিটি— সুস্থতা।

ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : আমরাও পাগল হয়ে যাব শিগগির, যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সন্দেহজনক শব্দ খুটখাট। বংকুবিহারী বললেন, টর্চ! টর্চ!

কর্নেল ভারি গলায় বললেন, ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে। এমার্জেন্সির জন্য দরকার হবে। আপনি চুপচাপ বসুন তো দারোগাবাবু!

প্রদোষ লাইটার জ্বালল। কিন্তু কিছু দেখা গেল না।

বংকুবিহারী ফের বললেন, আশ্চর্য! দরবেশ নিশ্চয় ঘরে ঢুকে খাওয়া-দাওয়া করছেন।

ঘনশ্যাম বলল, লোকটা স্বার্থপর। ভণ্ড। চুল্লু-টুল্লু বোগাস। সব কিছু বোগাস! রিলিজিয়ন ইজ দা ওপিয়াম অফ দা পিপল!

ধুর মশাই! বংকুবিহারী বললেন। আপনি দেখছি কমিউনিস্ট! আজকাল টিচারমাত্রেই কমিউনিস্ট। কেন কে জানে!

ঘনশ্যাম থেমে গেলেন। ব্রজহরি ভাঙা গলায় ডাকলেন, হরিপদ!

হরিপদ তাঁর পাশেই। বলল, বলুন গুরু!

ব্রজহরি বললেন, বৃষ্টি কমলে কর্নেলসায়েব, প্লিজ একবার ওকে নিয়ে গিয়ে দেখবেন— যদি খিচুড়িটা উদ্ধার করা যায়? ডেকচির মুখে ঢাকনা দেওয়া ছিল বলেই বলছি। ইটকাঠ সরিয়ে-টরিয়ে যদি—

banglaboi.blogspot.com

ক্লারা বলল, আমাদের কাছে কিছু খাদ্য আছে। মিষ্টান্ন। আপনারা খেতে পারেন।

হরিপদ বলল, জয় গুরু! জয় গুরু!

বংকুবিহারী বললেন, দ্যাটস এ গুড নিউজ ম্যাডাম!

প্রদোষ বলল, নেই। ও ঘরে রেখে গিয়েছিলাম, তখন কেউ খেয়ে ফেলেছে। ক্লারা বলল, সে কী বিচিত্র কথা! এমন হওয়া উচিত ছিল না। তুমি কি সত্যই দেখেছ?

হ্যাঁ। তুমিও গিয়ে দেখতে পার।

বংকুবিহারী ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, চাবকাতে ইচ্ছে করে না? এমন বিপদ-আপদের মধ্যেও চোর হতে পারে মানুষ! সে জন্যই তো বলছিলাম, মানুষ বর্ন-ক্রিমিন্যাল!

সায় দিলেন ব্রজহরি। ...অনেকাংশে ঠিক। তবে কথাটা অন্যভাবেই বলা উচিত। মানুষ জন্মায় দু ঠেঙে জন্তু হয়ে। অনেক সাধনায় তাকে মানুষ হতে হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতিবোধ— এসব তো সঙ্গে করে কেউ জন্মায় না। তবে মেমসায়েবদের সন্দেশ-টন্দেশ কে চুরি করে খেয়েছে, আমরা জানি। জেনেও মুখ খোলার উপায় নেই। দা স্যাটান লেট লুজ!

বংকুবিহারী হাঁকরালেন, শাওনি! এ তোর কাজ।

শাওনি বলল, বেশ করেছি। যা পারেন, করুন।

তোকে গুলি করে ভাসিয়ে দেব, হারামজাদি মেয়ে। বংকুবিহারী অভিমানেই বললেন। ক্ষিদেয় প্রত্যেকের নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে। অন্তত একটা করে সন্দেশ খেয়ে জল খেলেও— ওঃ!

ঘনশ্যাম বললেন, কিন্তু জল? ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, বাট নট এ ড্রপ টু ড্রিংক!

আপনি হাসছেন মশাই? বংকুবিহারী তেড়ে গেলেন। একি হাসির সময়?

ব্রজহরি বললেন, আহা! ওই কোনায় পোঁতা জালায় জল আছে। খান না!

শাওনি বলল, আমি এঁটো করে রেখেছি। ধম্মপুত্তুরেরা খাক না বেশ্যার এঁটো জল। সে খি খি করে হাসতে লাগল।

ব্রজহরি নড়ে বসলেন। ...কী বললি, কী বললি?

শাওনি বলল, শুধু এঁটো? খেয়েছি, খেয়ে হিসি করে দিয়েছি। ধম্মপুত্তুররা খাবে বলে!

এই অশ্লীলতার ধাক্কা প্রথমে লাগল ব্রজহরিকে, তারপর চাক্কুকে, তারপর ঘনশ্যামকে, শেষে প্রদোষকেও। ভয়াবহ এই অশ্লীলতা, কারণ ওঁরা ওই জল অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে তুলে খেয়েছেন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। চারজনে একসঙ্গে উঠে এল শাওনির উদ্দেশে। বিদ্যুতের ছটায় ওকে দেখামাত্র চারজনে চ্যাংদোলা করে তুলল। পুঁতি চেঁচাতে থাকল, বানের জলে! বানের জলে!

বাতাসের ঝপটানি ও বৃষ্টির ভেতর, প্রাঙ্গণে বারবধূটিকে চারজন রাগী পুরুষ, প্রতিশোধবশেই নামিয়ে দিল এবং ঠেলে ফেলে দিয়ে ফিরে এল। ব্রজহরি বারন্দায় এসে বললেন, নজর রাখুন! সারবন্দি দাঁড়ান সবাই! এলেই ভাগিয়ে দেবেন!

শাওনি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দুবার দারোগাবাবুকে চিৎকার করে ডাকল। সাড়া না পেয়ে প্রাঙ্গণে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে চূড়ান্ত অশ্লীল গাল দিতে শুরু করল। ক্লারা হতবাক্ হয়ে বসেছিল। এতক্ষণে উঠে এসে চেরা গলায় বলল, এটা অমানবিক! আপনারা মানুষ না পশু?

ঘনশ্যাম গর্জন করলেন, শাট আপ ইউ, সি আই এ এজেন্ট!

এতে প্রদোষ চটে গেল। ...আপনি মশাই বাড়াবাড়ি করছেন। আমার স্ত্রীকে আপনি—

ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বললেন, আপনাদের দু-জনকেই অ্যারেস্ট করা হবে। আপনারা কারা আমি জানি!

বংকুবিহারীর গলা শোনা গেল, চুপ করুন তো মশাই! কমিউনিস্টগিরি পরে ফলাবেন।

ক্লারা নেমে গিয়ে শাওনিকে বলল, এস বোন। আমরা পাশের ঘরে থাকব। ঘরের ছাদ ভেঙে পড়বে যখন, পড়বে। যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাব।

শাওনি ওর হাত ছাড়িয়ে হন হন করে চলে গেল। ক্লারা অবাক হয়ে ফিরে এল। কর্নেল ডাকলেন, শাওনি! শাওনি! যেও না। ওটা নেই। খুঁজে পাবে না!

শাওনির সাড়া এল না। বংকুবিহারী সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, কী খুঁজে পাবে না কর্নেল?

একটা তালডোঙা।

মাই গুডনেস! তালডোঙা! কোথায় তালডোঙা?

কর্নেল শুধু বললেন, ছিল।

আহা, ব্যাপারটা খুলে বলুন না মশাই!

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, সকালের জন্য অপেক্ষা করুন। সকালে সব বোঝা যাবে। তারপর একটু হাসলেন। ...চুল্লুর ব্যাপার আর কী!

ভ্যাট! আপনিও খালি— রাগে থেমে গেলেন আইনরক্ষক।...

bengalidownload.com

গানের আসর

বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। বাতাসও বন্ধ হল। কিন্তু গাছপালা থেকে টুপটাপ জল পড়ার শব্দ— ধারাবাহিক। কখনও কোনো পাখির ডানাঝাড়া এবং নড়ে বসার আচমকা ঝরঝর শব্দে চমক ছিল। ব্রজহরিই শুধু বলে উঠেছিল, কিসের শব্দ? কেউ জবাব দেয়নি। হয়তো চুল্লুর প্রেতাত্মা! তারপর ধীরে জেগে উঠল পোকামাকড়ের ডাকাডাকির শব্দ।

চাক্কু অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালে বংকুবিহারী টের পেলেন। বললেন, কে?

আমি।

বংকুবিহারী ধমক দিলেন, আমি কে?

আজ্ঞে, আমি! চাক্কু মরিয়া হয়ে বলল। শিবপদ!

ঘনশ্যাম, ব্রজহরি, প্রদোষ চমকানো স্বরে বলে উঠলেন, কে, কে?

হরিপদ বাউল হাসল। ...তাহলে আরেকজন পাওয়া গেল। কী করে এলে গো? কখন এলে? জানতেও তো পারিনি। সাড়াশব্দ দিয়ে আসবে তো?

ক্লারা বলে দিল, নতুন লোক নয়। ও রিকশাচালক।

বংকুবিহারী হ্যা হ্যা করে হাসলেন। ...ও! চাক্কু! তা শিবপদ-টদ করচিস কেন বাবা? আর যাচ্ছিসটা কোথায়?

চাক্কু বলল, ঘুম পাচ্ছে। ও ঘরে সতরঞ্জি আছে। ঘুমুতে চললাম দারোগাবাবু!

বংকুবিহারী বললেন, যাস্‌নে ছাদ চাপা পড়তে। চুপচাপ বসে থাক এখানে।

পুঁতি চাপাস্বরে বলল, মরণপাখা উঠেছে! ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে।

চাক্কু গ্রাহ্য করল না। পাশের ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। ঢুকেই চমক-খাওয়া স্বরে বলল, কে, কে?

বারান্দায় সাড়া পড়ে গেল। বংকুবিহারী ব্যস্তভাবে বললেন, কর্নেল! কর্নেল! টর্চ, টর্চ! ব্রজহরি, ঘনশ্যাম। প্রদোষ, হরিপদ একগলায় 'আলো, আলো' রব তুললেন। তারপর পাশের ঘর থেকে শাওনির সাড়া পাওয়া গেল। ...হাবাতে মিনসেরা! এইটুকুতেই অস্থির! গলায় ইট ঢুকিয়ে দেবে চুল্লু! থামো সব— একটু দাঁড়াও না!

ক্লান্তি, উদ্বেগ, বন্যার জল ওঠার এবং চুল্লুর আতঙ্ক প্রগাঢ়। তাই সবাই চুপ করে গেল। চাক্কু দ্রুত ফিরে এল। এটা পুঁতির ভাল লেগেছে। সে আস্তে বলল, শোবে তো এখানেই লুঙ্গি বিছিয়ে শোও! চাক্কু মেনে নিল।

বংকুবিহারী ডাকলেন, শাওনি!

শাওনির গলা ভেঙে গেছে। বিকৃত শোনাল। ...কী?

তুই যে পেত্নী হয়ে গেলি রে! অ্যাঁ? আইনরক্ষক হাসলেন। ডোঙা খুঁজে পেলি?

পাবার সময় হলে ঠিকই পাব।

খুলে বল্ না বাবা!

আপনাকে বলে কী লাভ? শাওনি গলার ভেতর বলল। মিনসেরা আমার খোয়ার করল, তখন তো কই আটকাতে এলেন না? আমি মানুষ তো বটি! আমি যাও বলতাম, মরে গেলেও বলব না!

বংকুবিহারী বললেন, তুই খাওয়ার জলটা নষ্ট করে প্রচণ্ড অন্যায় করেছিস!

ক্লারা বলে উঠল, নিশ্চয় সে ক্রোধবশত বলেছে। সত্যই এ কাজ সে করতে পারে না।

ব্রজহরি বললেন, হোয়াই ডু উই ফরগেট ম্যাডাম, সি ইজ এ প্রসটিট্যুট অ্যান্ড সি ক্যান ডু এভরিথিং— এভরিথিং! সি অলওয়েজ ডাজ অল সর্টস অফ ন্যাস্টি থিংস! সি ইজ অ্যান এভিল ম্যাডাম!

ক্লারা রাগ করে বসে রইল। বংকুবিহারী ডাকলেন, কর্নেল!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। হরিপদ বলল, তখন যেন উঠে গেলেন মনে হল।

ব্রজহরি বললেন, ধুস! উঠে গেলেন অন্ধকারে— হাতে টর্চ, জ্বাললেন না? এই তো ঘুমোচ্ছেন।

তাঁর নাড়া খেয়ে ঘনশ্যাম বললেন, আমি, আমি!

প্রদোষ লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। ক্ষণিক আলোয় দেখা গেল, কর্নেল নেই। বংকুবিহারী চড়া গলায় ডাকলেন, কর্নেল! কর্নেলসায়েব! সাড়া না পেয়ে চাপাস্বরে বললেন, এই লোকটির গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকছে। অবশ্য আমি নজর রেখেছি।

ব্রজহরি হাসবার চেষ্টা করে বললেন, বাইরে লোক কিছু বোঝবার যো নেই কে কী!

হরিপদ বলল, সেটাই তো কথা। বাবারা, মায়েরা! বাইরে যিনি, ভেতরে তিনি না, অন্যজনা। ভেতরকার জনাই মূলাধার। সেজন্যেই তো গুরু বলেছেন : 'এই মানুষে সেই মানুষ আছেন বসে/পেলে দেখা নাইকো রক্ষা ধরবি তাকে কষে/...'

বংকুবিহারী বললেন, সুরে গাও হে! গলা ছেড়ে গাও!

সবাই সায় দিলেন। এই অন্ধকার দরগা, কবরখানা, ধ্বংসস্তূপ, জঙ্গল, বন্যার গ্রাস এবং প্রেতাত্মা চুল্লু দিয়ে তৈরি ভূখণ্ডে প্রকৃতির মুঠোয় ধরাপড়ার বিপন্নতা— এই দুঃসময়! হরিপদ বাউলের গান জরুরি ছিল। একতারাটি পিড়িং পিড়িং করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে সুর মেলাল— তা না না না রি রি রি গুরু গো, হায় গুরু-উ-উ-উ...

গানের মাঝমাঝি প্রাঙ্গণে টর্চ জ্বলল। সবাই দেখেও দেখল না। কর্নেল ফিরলেন। বারান্দায় এসে একপাশে চুপচাপ বসে পড়লেন। গান থামলে বংকুবিহারী বললেন, কী যে করে বেড়াচ্ছেন কর্নেলসায়েব! কখন চুপ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন!

কর্নেল বললেন, তালডোঙাটা খুঁজতে গিয়েছিলাম!

banglidownload.com

আবার হেঁয়ালি! বংকুবিহারী রাগ করে বললেন। কার তালডোঙা, কোথায় ছিল, তা বলবেন না! খালি তালডোঙা, তালডোঙা! শাওনিও বলছে তালডোঙা। ব্যাপারটা কী? আপনারা কেউ কি দেখেছেন?

ঘনশ্যাম বললেন, ডোঙাটোঙা আমি তো মশাই দেখিনি কোথাও। চক্কর মেরে ঘুরেছি। ডাক্তারবাবু দেখেছেন কি?

ব্রজহরি বললেন, নাঃ। প্রদোষ বলল, না। ক্লারা বলল, না। চাকু, পুঁতি, হরিপদ বলল, না। তখন কর্নেল বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন, তালডোঙাটাই আপনাদের উদ্ধারের জন্য জরুরি।

বংকুবিহারী বললেন, সেটা অস্বীকার করছে কে? যদি সত্যি ওটা থেকে থাকে, সকাল হোক। খুঁজে দেখা যাবে।

ঘনশ্যাম বললেন, স্বপ্ন, স্বপ্ন!

ব্রজহরি দুঃখে হাসলেন। ঠিক বলেছেন! পিরবাবা আমাদের পরীক্ষা করছেন। মায়াডোঙা! একটা মায়াডোঙা দেখিয়ে আশার ছলনায় ভোলাচ্ছেন। এর কারণটা কেউ বুঝতে পেরেছেন? পারেননি। এই পবিত্র জায়গায় পাপের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

ক্লারা প্রশংসা করে বলল, ভারতীয়রা দার্শনিক। আমার প্রকৃত অভিজ্ঞতা হল। আপনি আরও বলুন।

বলল হরিপদ বাউল। একতারার বাজনায় এবং গানে।

'মায়ারূপি জগৎ-সংসারে-এ-এ/গুরু, ভেল্কি লয়ে দেখাও খেলা আজ আমারে॥'

ঝোঁকের মাথায় অথবা আবেগে সে উঠে নাচতে নাচতে গাইতে লাগল। বংকুবিহারী শাবাশ দিলেন, ভাল!...

প্রথম হত্যাকাণ্ড

একটার পর একটা গান গেয়ে-গেয়ে এবং নেচে ক্লান্ত হরিপদ যখন বসে পড়ল, তখন সবাই ঢুলছে এবং আইনরক্ষকের নাক ডাকছেও বটে। ক্লারা জেগে থাকার চেষ্টা করেও পারেনি। প্রদোষ অন্ধকারে তাকে টেনেছিল। সে ঘুমন্ত দেখে প্রদোষও চোখ বুজেছিল। মধ্যরাতে আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে থাকল। হরিপদর গলা ভেঙে গিয়েছিল। ভাঙা গলায় জয়গুরু বলে সে মেঝেয় গড়িয়ে পড়েছে। বৃষ্টিটা এলে টর্চ জ্বেলে দেখে নিলেন প্রাঙ্গণে জল উঠেছে নাকি। কর্নেল এবং বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। অবাক হয়েছিল এই ঘুম দেখে। প্রাঙ্গণে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন কর্নেল। যেন ওদের ঘুম ভেঙে চমকে না ওঠে।

কর্নেল রেনকোট টুপি পরে আসলে লুল্লুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কোথাও

তার পাত্তা নেই। নির্বোধ কুকুরটা কি তার তীক্ষ্ণ জৈব বোধের দরুন টের পেয়েছে এই ঢিবিটাও ডুবে যাবে এবং তাই মরিয়া হয়ে জলে সাঁতার কেটে পালাতে গেছে? কিন্তু তাহলে ওর নির্ঘাত মৃত্যু। চারদিকে দূরসুদূর মাঠ এখন সমুদ্র। হতভাগা কুকুরটা।

টর্চের আলো কমে এসেছে। ভাঙা দেউড়ির কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন। পেছনে হাত দশেক দূরে দরগাটা। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে কী একটা শব্দ কানে এল। আস্তে বললেন, কে?

অমনি আশেপাশে অন্ধকারে কয়েকটা ঢিল পড়ল। কর্নেল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন দরগর কাছে। চারপাশে খুঁজে কাউকে দেখতে পেলেন না। গাছের মাথায় একটা শব্দ হল। পাখির ডানা থেকে জল ঝাড়ারই শব্দ। তারপর আবার চড়বড় করে ঢিল পড়ল কয়েকটা। কর্নেল হাসতে হাসতে চাপাস্বরে বললেন, চুল্লু! আমি ভয় পাই না। কাজেই ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না।

খি খি হাসি শোনা গেল। ঢং করে বেড়ানো হচ্ছে রাতদুপুরে!

শাওনি! কর্নেল চর্চ নিভিয়ে দিলেন।

শাওনি দরগার ওধার থেকে বেরিয়ে এল। বুড়োসায়েব কী খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন থেকে? সে হিসহিস করে বলল। তালভোঙাটা তো? নেই। যে এসেছিল, সে নিয়ে গেছে। নৈলে আম্মো কি পড়ে থাকতাম এই ভাগাড়ে?

কর্নেল বললেন, তুমি কি লুল্লুকে দেখেছ, শাওনি?

কাকে?

লুল্লু— কুকুরটা। দেখেছ ওকে?

শাওনি একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দেখেছি। বটতলায় পড়ে আছে।

পড়ে আছে মানে?

চুল্লুকে বিরক্ত করছিল। চুল্লু ছাড়বে কেন? পেঁচিয়ে গলা কেটেছে মনে হল। বিজলির ছটায় রক্ত দেখলাম।

কর্নেল শক্ত হয়ে বললেন, হুঁ। কখন দেখেছ?

সন্ধেবেলায় যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল।

চলো, দেখিয়ে দাও।

আবার একটু চুপ করে থাকার পর বারবধূ আস্তে বলল, সকালে দেখবেন। চুল্লু রেগে আছে। শুয়ে পড়ুন গে যদি বাঁচতে চান। বলে ফিসফিস করে উঠল ফের, আপনাকে সতর্ক করতে এসেছিলাম। আর বেরুবেন না এমন করে।

সে দ্রুত চলে গেল আস্তানাঘরের দিকে। কিন্তু খোলা প্রাঙ্গণ হয়ে নয়, বাঁদিকের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেল। কর্নেল পকেট থেকে এতক্ষণে রিভলবার বের করলেন। টর্চের আলো ক্রমশ লালচে হয়ে আসছে। জ্বেলে লাভ নেই।

banglidownload.com

বরং অন্ধকারে দৃষ্টি পরিষ্কার হবে। বিদ্যুতের ঝিলিকে জঙ্গলের ভেতরটাও ঝলসে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ফাঁকা জায়গা বেছে-বেছে নজর রেখে বটতলার দিকে দক্ষিণে এগিয়ে গেলেন। জল উঠে এসেছে বটতলায়। সাপটির কথা মনে পড়ায় টর্চ জ্বাললেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দেখলেন বটের কোটরের নিচের দিকে জলে দুলছে কুকুরটার মৃতদেহ। গলা ফাঁক। রক্ত ধুয়ে গেছে কখন। কর্নেল দেখেই সরে এলেন।...

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড

কোথাও একটা খুট খুট শব্দ এবং ক্লারা তাকাল। বুঝল সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেখল ভোর হয়ে গেছে। তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধ দরবেশ তাঁর ঘরের শেকলে তালা আঁটছেন। ক্লারা বলল, সুপ্রভাত। দরবেশ জবাব দিলেন না। ঘুরে পা বাড়িয়ে লম্বা চিমটেটি দিয়ে সামনের মাটি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হেঁটে চললেন। বর্গাকৃতি চওড়া বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে লোকগুলো। ক্লারা দরবেশের ঘরের দরজার পাশে কোণের দিকে এবং প্রদোষ পাশেই পা ছড়িয়ে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার পায়ের কাছে পাশের সেই ঘরটার দরজা। সেখানে চৌকাঠে ব্যাগ রেখে মাথা দিয়েছে হরিপদ বাউল, বুকের ওপর একতারা। তার পাশেই ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু কাত হয়ে শুয়েছেন। উল্টোদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন কর্নেল, গায়ে রেনকোট, মাথাটি বুকের ওপর ঝুলন্ত এবং টুপিতে মুখ ঢাকা। তাঁর পাশে ঘনশ্যাম ওরফে হর্ষনাথ কুঁকড়ে শুয়ে আছেন। বংকুবিহারী ঠিক মাঝখানে। কিন্তু চাক্কু ও পুঁতি নেই। ক্লারা একটু অবাক হল। দরবেশ চিমটে বাড়িয়ে দারোগাবাবুকে ছুঁয়ে পাশ কাটিয়ে প্রাঙ্গণে নামলেন। দারোগাবাবুর প্রচণ্ড নাক ডাকছে। দরবেশ প্রাঙ্গণে চক্ষুষ্মান মানুষের মতো হেঁটে দরগার কাছে গেলে ক্লারা বুঝতে পারল, এখানকার প্রতি ইঞ্চি মাটি ওঁর জানা।

ক্লারা চাক্কু ও পুঁতিকে খুঁজতে বসে থাকা অবস্থায় হরিপদর মাথার পাশ দিয়ে পাশের ঘরটার ভেতর উঁকি দিল। দেখল পুঁতি ঘুরে কাত হয়ে শুয়ে আছে এবং চাক্কু চিত। শালীনতাবশে ক্লারা সরে এল। তারপর মনে পড়ল শাওনির কথা। সঙ্গে সঙ্গে কোনায় তার ও প্রদোষের মাথার কাছে রাখা কিটব্যাগ, সুটকেস দেখে নিল। ব্লাউজের ভেতর হাত রেখে তার ছোট্ট পার্সটাও আছে দেখে নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু শাওনি নেই। সে কোথায় থাকতে পারে বুঝতে পারল না ক্লারা। নাকি সাঁতার কেটে চলে গেছে? দুঃখিত মনে ক্লারা উঠল। শাড়িটা গুছিয়ে পরল। মনে পড়ল, সেবার নভেম্বরে ক্যালিফর্নিয়ার ইওনিসিটি ন্যাশনাল পার্কে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে ক্লিভল্যান্ড পাসের ওধারে আটকে গিয়ে চার বন্ধুর জীবনমরণ অবস্থা ঘটেছিল। তবে ওদের সঙ্গে ক্যাম্প এবং স্লিপিং ব্যাগ ছিল। রেডিও-ট্রান্সমিটার ছিল। ফিনিক্স থেকে একটা লোক

নিজের হেলিকপ্টারে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা ভারত নামে দেশ। এখানে সবই অন্যরকম, বিরক্তিকর হলেও রহস্যময়— সারা রাত যা সব টের পেয়েছে, ফিসফিস কথাবার্তা অথবা জলের শব্দ, বাতাসের শব্দ, পোকামাকড়ের শব্দ মিশে ওইরকম মনে হচ্ছিল। কারা বা কেউ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছিল কোথাও। এবং চুল্লু!

ক্লারা প্রাঙ্গণে মেনে চুল্লুর নিদর্শন খোঁজার জন্য এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল। দরবেশ দরগার ওপাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন চোখে পড়ল। চোখে কালো চশমা। কালো আলখেল্লা। সত্যিই কি চুল্লু নামে কোনো অশরীরী প্রেতাত্মা দরবেশের অনুগত ভৃত্য? ক্লারা কয়েক পা এগিয়ে গেল। প্রাঙ্গণের ওপর আকাশ নির্মেঘ। লাইমকংক্রিটের একটুকরো ভিজে চত্বরে দরবেশ হাঁটু দুমড়ে বসে প্রর্থনা করছিলেন। ক্লারা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। রহস্যময় পুরুষ।

রহস্যময় পুরুষটি বুকে চিমটেটি ঝুনঝুন শব্দে ঠুকতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, চুল্লু! ক্লারা চমকে উঠল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে বটগাছের ওদিকে কোথাও কী একটা পাখি ডানা ঝটপট করে এসে বসল অথবা উড়ে গেল। ক্লারা একটু ভয় পেল। ভিজে জঙ্গলের ভেতর এখনও প্রচুর অন্ধকার জড়িয়ে আছে। তার চারদিক ঘিরে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য অসংখ্যাসংখ্য চুল্লু বুঝি ওতে পেতে আছে। নিজের অলক্ষে ক্লারা বুকে ক্রশ আঁকার ভঙ্গি করেই টের পেল, অভ্যাস! ননদিনীর শেখানো 'রাম'-নাম বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে ক্লারা বারান্দায় পৌঁছুল। লোকগুলিকে এবং প্রদেশকে দেখে তার সাহস ফিরে এল। তারপর আইনরক্ষক এবং তাঁর কোমরে খাপে ভরা আগ্নেয়াস্ত্রটি দেখে ক্লারা নিজের ভয়পাওয়াটাকে মনে মনে তিরস্কার করল। এই তো সে দেখতে চেয়েছিল, পৌঁছুতে চেয়েছিল এরকম যথার্থ আদিমতায়, প্রকৃতির অভ্যন্তরে— যেখানে প্রেতাত্মা ও সন্তপুরুষ, সাপ এবং ডাইনি ক্ষিদে এবং মৃত্যুর কারুকার্য। এই তো সেই প্রাচ্যদেশীয় গভীরতা! পাপ-পুণ্য আলো-অন্ধকার জীবন-মৃত্যুর রহস্যলোক।

ক্লারা একটু হাসল। ঘুমন্ত লোকগুলির দিকে তাকাল। বংকুবিহারীর নাক ডাকা দেখে ক্লারা নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তারপরই তার চোখ গেল আইনরক্ষকের মাথার দিকে মেঝেয় পোঁতা জলের জালাটির দিকে। জালাটির মাথায় ঢাকনা চাপানো এবং মেঝে থেকে ইঞ্চি চারেক উঁচু জালাটির কিনারা। ঠিক তারই পেছনে দেয়ালের কোনায় কালো কী একটা জড়ানো পেঁচানো জিনিস। দৃষ্টিস্বচ্ছ ক্লারা চিত্রবিচিত্র একটি কুণ্ডলীপাকানো সাপকে আবিষ্কার করল এবং মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রথমে টুপি সরিয়ে কর্নেল সাড়া দিলেন, কী হয়েছে ডার্লিং?

সাপ! সাপ! প্রকৃত একটি সাপ।

কোথায়?

banglaboi.blogspot.com

পুলিশমহাশয়ের মাথার কাছে। আপনি লক্ষ্য করুন, দেখুন। ওই যে, ওই সাপটি।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে সাপটিকে দেখে বললেন, বিষাক্ত মনে হচ্ছে। তবে লোকের সেই সাপটা নয়। এটার দিশি নাম বাঁকরাজ।

বাউল হরিপদ তড়াক করে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। বলল, কী হয়েছে গুরু?

কর্নেল ঝুঁকে ঘুমন্ত বংকুবিহারীর জুতোসুদ্ধ পাদুটো ধরে হাঁচকা টানে সরিয়ে নিলেন। অমনি বংকুবিহারী তড়াক করে উঠে কোন ব্যাটারে বলে রিভলবার বের করলেন। ওদিকে ক্লারা প্রদোষকেও টেনেছে নিরাপদ দূরত্বে এবং প্রদোষও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এসবের ফলে ঘনশ্যাম ও ব্রজহরি জেগে গেলেন। হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, সাপ! সাপ! পাশের ঘর থেকে পুঁতি ও চাক্কু উঠে এসে ধাক্কা দিল দরজায়।

কুণ্ডলীপাকানো বাঁকরাজ সাপটি এবার লম্বা হওয়ার চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টায় প্রচণ্ড স্পন্দন টের পেয়েছিল। বংকুবিহারী সাপ শুনেই কয়েক পা পিছিয়ে এসেছিলেন। এবার রিভলবার তাক করলেন। প্রাঙ্গণে দরবেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, চুল্লু! বংকুবিহারী হিংস্রমূর্তি হয়ে তোর চুল্লুর নিকুচি করেছে ব্যাটা, বলেই পর পর দুবার গুলি ছুড়লেন। প্রথম গুলিতে জালার মাটির ঢাকনা উড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটি সাপটির লেজে লাগল। ক্রুদ্ধ সাপটি তেড়ে এল। ধেদাপ শব্দে সবাই তখন প্রাঙ্গণে। আহত সাপটি হোবল ছুড়ছে, ফণা নেই, চেরা জিভ লক লক করছে। কর্নেল প্রাঙ্গণ থেকে টুকরো ইট তুলে তার মাথায় মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি ওলটপালট খেতে খেতে নেতিয়ে পড়ল। কর্নেল আরেক টুকরো ইট তুলে মাথাটা থেঁচে দিলেন। তারপর লেজ ধরে তুলে জলে ফেলতে গেলেন। বংকুবিহারী শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, এমার্জেন্সির জন্য কিছু বুলেট মজুত রাখা উচিত। নয়তো ওকে— বাপস! একেবারে মাথার কাছে— ওঃ।

দরবেশ বারান্দায় উঠে বললেন, চুল্লু! তারপর চিমটে বাড়িয়ে অভ্যাসমতো এগিয়ে দরজার তালা খুলতে থাকলেন। হরিপদ ভীত মুখে বলল, গুরুর কৃপায় বেঁচে গেছেন দারোগাবাবু!

ব্রজহরি বললেন, পিরবাবার দয়ায়! কী বলেন হর্ষবাবু?

ঘনশ্যাম মুখ বাঁকা করে বললেন, দয়াটায় নয় মশাই। ওসব বাজে কথা। ইচ্ছে গায়ে হাতটা পড়েনি তাই।

ক্লারা দেখতে গেল, কর্নেল কোথায় সাপটাকে ফেলছেন। প্রদোষ একটু হাসল। বংকুবিহারীর উদ্দেশে বলল, অন্তত এসময় একটু চা পেলে মন্দ হত। দরবেশসায়েব তো চা খান মনে হচ্ছে। ওই দেখুন কেটলি। কেরোসিন স্টোভও।

বংকুবিহারী বারান্দায় উঠে বললেন, দরবেশসায়েব। কাল রাত্তিরে তো দানাপানি বরাতে জোটেনি আমাদের। এখন আমরা কি একটু চা পেতে পারি?

ব্রজহরি বললেন, টাকাকড়ি দেওয়া যাবে অবশ্য। ফের চাঁদা তুলব।

দরবেশ তখন ঘরে। একটা তক্তাপোশ দেখা যাচ্ছিল। সেটা আড়াল করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা খুব জুলুম করছেন বাবারা মায়েরা। আমি অন্ধ মানুষ। আমি কী খেয়ে বাঁচব? আপনারা সাঁতার কেটে চলে যান দরগা থেকে। আর বর্ষা হবে না। আসমান খালি হয়েছে। চলে যান। এ অন্ধের ওপর আর জুলুম করবেন না।

ব্রজহরি জিভ কেটে বললেন, না না। জুলুম করব কেন? আপনি সিদ্ধপুরুষ। আপনি ইচ্ছে করলেই মুখের খাদ্য জুটে যাবে।

ঘনশ্যাম বললেন, রিলিফের নৌকো এসে যাবে দেখবেন। এখন আমাদের প্রাণ বাঁচান।

দরবেশ শুধু বললেন, চুল্লু। তারপর তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে বুকে চিমটে ঠুকতে থাকলেন।

ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, ছেড়ে দিন। কই চলুন দেখি জলের অবস্থা। রিলিফের নৌকোও নিশ্চয় দেখতে পাব। ডাকব চেঁচিয়ে।

ব্রজহরি শ্বাস ফেলে বললেন, তাই চলুন। রাস্তার দিকটায় যাওয়া যাক। নিশ্চয় ওখান হয়ে রিলিফের নৌকো যাবে।

হরিপদ জয়গুরু বলতে বলতে একতারা বাজিয়ে পিড়িং পিড়িং করতে করতে ওঁদের সঙ্গ ধরল। একটু পরে বংকুবিহারীও দীর্ঘশ্বাস করে শ্বাস ছেড়ে বারান্দা থেকে নামলেন। তিনিও দেউড়ির দিকে ওঁদের অনুগামী হলেন।

boiRboi.blogspot.com

চাক্কু বলল, পারবি সাঁতার কাটতে?

পুঁতি বলল, তোমার মাথা খারাপ? জলতল অবস্থা। দরগায় জল উঠল বলে— দেখবে।

চাক্কু গেল দক্ষিণে বটগাছের দিকে। একটু পরে পুঁতি ওকে অনুসরণ করল। চাক্কু ভাঙা মুসাফিরখানার ভেতর ঢুকেই বলল, উরে ব্বাস! দরগায় জল ঢুকল বলে।

পুঁতি বলল, বললাম তোমাকে। আমি ডুবোদেশের মেয়ে। বুঝতে পারি। মানুষের পাপ যেবছর বেশি হয়, সেবার পিথিমি জলতল হয়। পাপ খোঁড়াপিরের দরগায় পর্যন্ত হাজির। আমাকে পর্যন্ত ছুঁতে এল, এত সাহস।

চাক্কু রাগ করে বলল, তোর খালি ওই কথা। ডাক্তারবাবুর মতো।

আমি বানের জলে চান করলে গা ঘিনঘিন যাবে না। পুঁতি নাকের ডগা কুঁচকে বলল। বেশ্যা মাগীর সাহস, আমাকে সাচ করতে এল।

চাক্কু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে বলল, ডেগারখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বল তো?

পুঁতি খাপ্পা হয়ে বলল, আমি তার কী জানি? নিজেই লুকিয়েছে। ভেবেছিলে, যদি মাগীর বুকে বসিয়ে দিই— সেই ভয়ে।

চাক্কু ওর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই কিছুতেই জ্বালাতে না পেরে সে প্রদোষের কাছে চলে গেল। পুঁতি দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে ভাঙা ঘরটার ভেতর দিয়ে বিস্তীর্ণ জলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলল।

প্রদোষ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিল। লাইটার জ্বেলে চাক্কুর সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেও ধরাল সিগারেট। তারপর বলল, এখানে প্রচণ্ড সাপ! তাই না?

চাক্কু বলল, হ্যাঁ স্যার। পেচণ্ড। আসলে চারদিক জলতল হলে সাপগুলান ভাঙা মাটিতেই তো ছেল্টার নেবে। বলুন তাই কি না? তাও তো আগের মতো সাপ আর নাই। ফলিডল-টলের চোটে মারা পড়েছে। এদিকে ধরুন, শেয়াল বলতেও আর নাই। নৈলে দেখতে পেতেন। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি বাঘও ছিল। এই দরগায় নমো করতে আসতো। কত লোক দেখেছে। নৈলে বানের সময় বাঘও দেখতে পেতেন। তবে বিপদের সময় তো। বাঘ—

ক্লারা কর্নেলকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসেছিল। কথা শুনছিল। চাক্কু থামলে সে ব্যস্তভাবে বলল, বলুন আপনি বলুন। খুব ভাল লাগল শুনতে। আর কী সব হত, বিস্তারিত বলুন।...

তৃতীয় হত্যাকাণ্ড

ভাঙা দেউড়ির পর কয়েক'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা— ব্রজহরি, ঘনশ্যাম, বংকুবিহারী, হরিপদ। হরিপদর একতারা থেমে গিয়েছিল। সামনে জল। ছত্রখান ঐতিহাসিক পাথরের স্ল্যাবগুলোর তলা ও ওপর দিয়ে বন্যা ছলকে আসছে। ঢালুতে উঁচু গাছপালার গুঁড়ি অব্দি ডুবে গেছে। ঝোপঝাড় তলিয়ে গেছে। গাছপালার আড়ালে কিছুটা দূরে বাঁশবনের ভেতর কচুরিপানার ঝাঁক আটকে আছে দেখে হরিপদ বলে উঠল, ওই গো! পাটুলির বিল ভেসে গেছে। নতুন বাঁধ। টিকবে কেন?

ব্রজহরি গুম হয়ে বললেন, তাহলে হোল সাবডিভিসন জলের তলায়।

বংকুবিহারী আনমনে প্রশ্ন করলেন, কেন?

ব্রজহরি একুট বিরক্ত হয়ে বললেন, এরিয়ায় আমি নতুন এসেছি। আমার চাইতে আপনারই জানার কথা বেশি।

পাটুলি-আটুলি আমার জুরিশডিকশন নয়। বংকুবিহারী তেমনি আনমনে বললেন। ওদিকটা অন্য থানা।

ব্রজহরি আক্ষেপে বললেন, আমরা পরমাণু বোমা ফাটাতে পারি, স্যাটেলাইট পাঠাই স্পেসে। ভাল করে একটা বাঁধ বাঁধতে পারি না। এই তো অবস্থা!

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকতে পারলেন না, যদিও ভেবেছিলেন মুখ খুলবেন না। বললেন, সোস্যাল কন্ট্রাডিকশনটা বুঝতে হবে। ফিউডালিজম যখন ক্যাপিটালিজমের পোশাক পরতে চায়— তৃতীয় বিশ্বের কথাই বলছি, যেমন ধরুন—

বংকুবিহারী ধমক দিলেন, ধুর মশাই! নেচার। সায়েবদের দেশে ফ্লাড হয় না?

ঘনশ্যাম মরিয়া হয়ে বললেন, নেচারকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু স্টালিন বলেছেন, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম আছে। আমরা নিয়মকে বদলাতে পারি না, কন্ট্রোল করতে পারি। এখন কথা হল, কন্ট্রোলিং সিস্টেমের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে কী হবে?

বংকুবিহারী রাগ করে হাসলেন। ...স্টালিন-ফালিন করে কোনো লাভ হবে না মশাই! এটা কমিউনিস্টগিরি ফলানোর সময় নয়।

ব্রজহরি বললেন, আপনাদের মাথায় আসল ব্যাপারটা ঢুকছে না। দুর্নীতি— করাপশান! রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওই পাপ ঢুকছে। বাঁধে বলুন, যেখানে বলুন, ওই এভিল আক্টিভ। দ্য স্যাটান ইজ ফ্রি!

ঘনশ্যাম বললেন, ওসব মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা। পাপ এভিল-টেভিল বাজে কথা। পাপ করে কেন মানুষ? পাপ করার চালাও সুযোগ তো আছেই, উপরন্তু বেঁচে থাকার দায়। ওই মেয়েটির কথাই ধরুন না। যেন নাম— শাওনি!

ব্রজহরি বললেন, আবার সাত-সকালে ওই নাম! আমনি চুপ করুন তো!

আপনি মহা ধার্মিক! ঘনশ্যাম ব্যঙ্গ করে বললেন। হিন্দু ধর্ম নাকি সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করতে বলে। আর খ্রিস্টান ধর্ম বলে, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়!

ব্রজহরি তেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বংকুবিহারী বাধা দিলেন। ধুর মশাই! খালি এঁড়ে তর্ক। ছাড়ুন তো ওসব। ওই দেখুন, সূর্য উঠছে। রিলিফের নৌকো খুঁজুন— এবারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

হরিপদ একতারায় পিড়িং করলে বংকুবিহারী তাকেও থামিয়ে দিলেন। বললেন, ক্ষিদেয় নাড়ি জ্বলছে আর খালি পিড়িং পিড়িং! মেমসায়েবকে শোনাও গিয়ে। ওদের নাকি ক্যাপসুল চুষে ক্ষিদে মেটে।

অগত্যা ব্রজহরি একটু হাসলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। বুঝলেন তো?

ঘনশ্যাম আপন মনে চাপা গলায় বললেন, সর্বত্র একই অবস্থা। একদিকে প্রচুর খাদ্য, অন্যদিকে অনাহার। একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে অভাব।

ব্রজহরি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুনে ফেললেন।...তা অস্বীকার করা চলে না। যেমন, চোখের সামনেই দেখছি।

banglaboi.blogspot.com

বংকুবিহারী সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, কী?

ব্রজহরি ম্লান হেসে বললেন, দরবেশের ঘরে প্রচুর চাল-ডাল আছে চা-চিনি আছে। আর আমরা ক্ষিদেয় মরছি। কিন্তু—

ঘনশ্যাম ঝটপট বললেন, 'কিন্তু'টা কিসের? কোনো কিন্তু নেই।

আহা, অঙ্গ মানুষ! সাধুসন্ত ব্রজহরি গোঁফ চুলকোতে থাকলেন। জোর করলে পাপ হবে। না হলে তো কেড়ে খেতে পরামর্শ দিতাম এতক্ষণ।

ঘনশ্যাম বললেন, কোনো পাপ হবে না। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

বংকুবিহারী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ইউ আর রাইট। চলুন, আগে অনুরোধ করব ফের। তারপর—

হরিপদ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, দোহাই বাবুমশাইরা! শাপ লাগবে! বিপদ হবে আরও।

ব্রজহরি দ্রুত বদলে বললেন, আহা! টাকা দিয়েই চাইব ফের।

ঘনশ্যাম পা বাড়িয়ে বললেন, সব সহ্য করা যায়, ক্ষিদে সহ্য করা যায় না। চলুন, আমিই লিড নিচ্ছি।

ঘনশ্যাম আগে, তাঁর পেছনে বংকুবিহারী, তাঁর পেছনে দোনামনা করে ব্রজহরি, শেষে 'জয় গুরু, তোমার ইচ্ছা', বলে হরিপদ। প্রাঙ্গণে দরবেশের ঘরের বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে চাক্কু কথা বলছিল। সামনে ক্লারা। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে প্রদোষ। ঘনশ্যাম গিয়েই বললেন, আসুন। আমরা দরবেশের ঘরে ঢুকব। চাল-ডাল বের করব। চলে আসুন সব।

ক্লারা টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, না না! ওই কাজ করবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন আপনারা।

বংকুবিহারীর ইশারায় চাক্কু একলাফে বারান্দায় উঠল। তারপাশে ঘনশ্যাম। চাক্কু দরজার দিকে এগিয়ে বলল, দরবেশবাবা! চাল-ডাল কী সব আছে বের করে দাও। দারোগাবাবুর হুকুম হয়েছে।

দরবেশ তার আগেই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন। দু'হাতে চিমটে তুলে বললেন, আয়! কে আসবি আয়! ফুঁড়ে ফেলব তোদের। চুল্লু! চুল্লু! চুল্লু! চিমটেটা ভারি, লম্বা এবং সূচলো। সামনে খোঁচা মারতে থাকলেন ক্রমাগত। সেই সঙ্গে চিৎকার, চুল্লু! চুল্লু! চুল্লু! ঘনশ্যাম বললেন, চাক্কু! ওর চিমটেটা কেড়ে নাও। চাক্কু সুবিধে করতে পারল না। বঙ্কুবিহারী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রিভালবার বের করে বললেন, গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি! ঘনশ্যাম চ্যাঁচামেচি করে বলতে থাকলেন, ছুড়ুন! ছুড়ুন! এ মুহূর্তে লোকটা মানবতার শত্রু! ওকে গুলি করে মারলে আপনার কিস্যু হবে না। আপনি পুলিশ। পুলিশকে রাষ্ট্র প্রয়োজনে খুন-খারাপির অধিকার দিয়েছে। ব্রজহরি রক্ষার চেষ্টা করছিলেন।...দরবেশবাবা! দরবেশবাবা! টাকা দেব— আমরা চাঁদা করে টাকা দেব। আমাদের ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। দরবেশ চিমটেটা নেড়ে এবার কান্নাজড়ানো স্বরে চেঁচালেন, চুল্লু! সেই সময় চাক্কু পাশ

থেকে খপ করে চিমটের ডগা ধরে ফেলল। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। দরবেশ চৌকাঠে পা আটকে টানতে থাকলেন চাক্কুকে। ঘনশ্যাম বললেন, ইট! ইট মারো! ক্লারা বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখছিল। ঘুরে প্রদোষের দিকে তাকাল। প্রদোষ উঠে এসে তাকে সরিয়ে নেবার জন্য হাত ধরল। ক্লারা হাত ছাড়িয়ে নিল। ঘনশ্যাম ইট কুড়োতে প্রাঙ্গণে নেমেছিলেন। ইট কুড়িয়ে বারান্দায় উঠেছেন, এমন সময় চিলচ্যাচানি চেঁচাতে চেঁচাতে পুঁতি দৌড়ে এল, খুন! খুন! বেশ্যামাগি খুন হয়ে পড়ে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জন্য সংঘর্ষ থেমে গেল। বংকুবিহারী বললেন, কী, কী?

পুঁতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওইখানে বানের জলে আটকে আছে। গলা ফাঁক। আপনারা গিয়ে দেখুন! বুড়োসায়েব দাঁড়িয়ে আছে— যান শিগগিরি!

পুঁতি ধপাস করে বারান্দায় বসল। সে স্নান করেছে। ভিজে শাড়ি। চুলে জল গড়াচ্ছে। সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। দরবেশ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।...

চতুর্থ হত্যাকাণ্ড

কাল বিকেলে বংকুবিহারী যে চাঙড়টাতে বসে ইউনিফর্ম শুকোচ্ছিলেন, বন্যার জল সেটা ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে। জল উঠে এসেছে আস্তানা ঘরের পেছন দিকটায়, যেখানে ছোট-বড় ধ্বংসস্তূপ, খালি স্লেট পাথর, ফণিমনসার ঝোপ। শাওনি চিত হয়ে আটকে আছে সেই ঝোপের গায়ে। জল দুলছে, তার মড়াটা দুলছে। গায়ের শাড়ি আটকে আছে কাঁটায়। তা না হলে হয়তো ভেসে চলে যেত।

বংকুবিহারী একটুখানি ঝুঁকে থেকে সোজা হলেন। কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল ফণিমনসার শরীর ফুঁড়ে বেরনো মোচার মতো ফুলগুলো দেখছিলেন। বংকুবিহারী আস্তে বললেন, এখানেই ছিল ?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। সাপটা ছুড়ে ফেলার পর চোখে পড়েছিল।

ব্রজহরি ডাক্তারের অভ্যাসে মড়াটা দেখতে পা বাড়ালেন। শাওনির মুখটা ওপাশে ঘুরে ছিল। একটা ডাল ভেঙে মুখটা সোজা করে দিলেন। পেছনে ক্লারার চমকে ওঠা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হরিপদ কাঁপা-কাঁপা গলায় বলতে থাকল, হায় গুরু! জয় গুরু! প্রদোষ ক্লারাকে টেনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। বংকুবিহারী গাঢ় স্বরে বললেন, কী মনে হল ডাক্তারবাবু?

ব্রজহরি চেষ্টা করলেন। কী মনে হবে? মার্ডার! বিশুদ্ধ হত্যাকাণ্ড।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। বংকুবিহারী ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। স্ট্যাবিং নয়। আচমকা অ্যাটাক নয়। ধীরেসুস্থে গলায় প্যাঁচ। মুসলমানরা যেভাবে হালাল করে। চাক্কু!

চাক্কু চমকে উঠে বলল, সার!

boiRboi.blogspot.com

তোর কাছে একটা ড্যাগার ছিল। বংকুবিহারী সন্দিগ্ধভাবে বললেন। এখনও সত্যি কথাটা বল্!

চাক্কু ঝটপট বলল, রেতের বেলা তো সাচ করলেন সার!

চুপ! ধমক দিলেন বংকুবিহারী। তোর বউকে সার্চ করা হয়নি— করতে দেয়নি তোর বউ। শাওনি তাকে সার্চ করতে গিয়ে গণ্ডগোল হল। কই, কোথায় সে? তাকে তো দেখছি না!

চাক্কু বলল, দরবেশের বারান্দায় বসে আছে। ডাকতে বলেন তো ডাকি!

বংকুবিহারী পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললেন, আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না। এখানেই থাকুন। বলে চলে গেলেন দরগার দিকে। চাক্কু সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ নিষ্পলক।

কর্নেল ডাকলেন। ডাক্তারবাবু! বডিটা টেনে তোলা দরকার। আসুন।

ব্রজহরি ইতস্তত করে বললেন, দারোগাবাবু—

আপনি তো ডাক্তার। বডি পরীক্ষা করে অনুমান করতে পারবেন না কতক্ষণ আগে মেয়েটি মারা গেছে?

জলে পড়ে থাকা বডি! ব্রজহরি বিরক্ত হয়ে বললেন। মর্গের টেবিলে ছাড়া কিছু বোঝা অসম্ভব।

রাইগর মর্টিস শুরু হয়েছে কি না— বলেই কর্নেল একটু হাসলেন। ভুল হচ্ছে! আমরা শাওনিকে কখন শেষবার দেখেছি, ঠিক করা দরকার। আমি দেখেছি শেষবার, তখন রাত্তির প্রায় সওয়া দুটো। ডাক্তারবাবু, আপনি?

আমি ঘুমুচ্ছিলাম।

হর্ষনাথবাবু?

ঘনশ্যাম ঠোঁট কামড়ে ধরে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, আমিও ঘুমুচ্ছিলাম।

প্রদোষবাবু?

প্রদোষ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, আমি কাউকে লক্ষ্য করিনি।

ক্লারা!

ক্লারা একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, রাত্রি তিন'টার সময় পাশের ঘরে কেউ ঢুকেছিল। ভোরবেলা দেখলাম এই রিকশাওলা ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী শুয়ে আছেন ওই ঘরে। ভাবলাম, তারাই হবে। কিন্তু— `

কিন্তু কি?

ক্লারা বলল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শাওনি ঢুকেছিল। কারণ একজনকে ঢুকতে দেখেছলাম। চাক্কু, তোমরা কখন শুতে গিয়েছিলে পাশের ঘরে?

চাক্কু, বলল, বৃষ্টি থামলে পরে।

তার মানে চারটের কাছাকাছি। কর্নেল বললেন। তোমরা ও-ঘরে ঢুকে শাওনিকে দেখনি নিশ্চয়?

আজ্ঞে না সার! সে থাকলে বুঝতে পারতাম।

বংকুবিহারীর গজরানি শোনা গেল। চাক্কু! চাক্কু! এদিকে আয়! তোর বৌ পালিয়েছে সাঁতার কেটে। তাকে খুঁজে পেলাম না। তার মানে, তোর বউ মার্ডার করে পালিয়েছে। বলতে বলতে আইনরক্ষক এসে চাক্কুর গেঞ্জির কলার খামচে ধরলেন। হাতে রিভলবার।

কর্নেল হন্তদন্ত উঠে গেলেন তাঁর কাছে।...খুঁজে পেলেন না পুঁতিকে?

না। বংকুবিহারী হুংকার দিলেন। রাত্তিরেই আমার সন্দেহ হয়েছিল চাক্কুর বউ ফেরোশাস টাইপের। শাওনিকে সার্চ করার সময় তার আটিচ্যুড মনে পড়ছে আপনাদের?

কর্নেল একটু হাসলেন। কিন্তু লুঙ্গু— মানে কুকুরটাকেও কি গলা পেঁচিয়ে কেটে ভাসিয়ে দিয়েছিল পুঁতি?

হোয়াট? আইনরক্ষক চাক্কুকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। কী বলছেন আপনি?

হ্যাঁ। শাওনির মতো গলাকাটা কুকুরটা ওই বটতলায় পড়ে আছে।

বংকুবিহারীর সঙ্গে সবাই দৌড়ে গেল সেদিকে। শুধু দাঁড়িয়ে রইল চাক্কু। কর্নেল আস্তে বললে, চাক্কু! তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে? পুঁতিকে খুঁজতে ইচ্ছে করছে না?

চাক্কু ফুঁসে উঠল।--পুঁতি যদি মার্ডার করে থাকে, বেশ করেছে। সে না করলে আমিই কাজটা করতাম। যদি বলেন কেন করতাম, তাহলে খুলে বলি।

বলো।

শাওনি কাল বিকেলে বলছিল, ভালো পাত্রের আছে টাউনে। পাঁচশো টাকা দেবে— মানে, পুঁতির দাম।

আর পুঁতি তোমার বউ। কাজেই এ কথায় তোমার রাগ হওয়া উচিত।

বউ? চাক্কু ভুরু কুঁচকে মুখ নামাল। গলার ভেতর বলল, পুঁতি ঠিক বউ নয়। তবে হ্যাঁ, ওর সিঁথেয় সিঁদুর দিতে হয়েছিল। কেন— কী, আপনারা কী ভাববেন। অবশ্যি—

বলো, বলো!

টাউনে গিয়ে ঠিকই বিয়ে করতাম ওকে। তবে এখনও ও আমার বউ না বউ হতে পারে।

'পরে' শব্দটার ওপর খুব জোর দিল চাক্কু। কর্নেল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, পুঁতি কি সাঁতার কেটে পালাতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

চাক্কু একটু ভেবে বলল, তা পারলেও পারে। ডুবোদেশের মেয়ে। সাঁতার জানে। তবে মুখে বলছিল, এত জলে সাঁতার কেটে যেতে পারবে না। দেখছেন না, এত উঁচু দরগার গলা পর্যন্ত জল?

কর্নেল বললেন, আমার সঙ্গে এসো তো!

bengalidownload.com

চাক্কু তাঁকে অনুসরণ করল। ডাইনে গাছপালার ভেতর দিয়ে দক্ষিণে বট গাছটার তলায় বংকুবিহারীদের দেখা যাচ্ছিল। উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন ওঁরা। দরগা পেরিয়ে ডাইনে ঘুরলেন কর্নেল। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বললেন, ওই যে ঝোপের ডগাটা দেখতে পাচ্ছ। ওর তলায় একটা তালডোঙা ডোবানো আছে। টেনে নিয়ে এস।

চাক্কু ভীষণ অবাক হল। তারপর গেঞ্জি, প্যান্ট খুলে একটা গাছের শেকড়ে রেখে, কাঁধের ব্যাগটাও, ডোরাকাটা আন্ডার-প্যান্ট পরা অবস্থায় সাবধানে নামল। গলা জলে দাঁড়িয়ে সে পা বাড়িয়ে খুঁজতে থাকল তালডোঙাটা। বলল, কৈ? কিচ্ছু নেই।

কর্নেল বললে, নিশ্চয় আছে। খুঁজে দেখ। বাঁধা আছে ঝোপের গোড়ায়। বৈঠাও ঢোকানো আছে দেখবে।

চাক্কু ডুব দিল। জলে বুজকুড়ি উঠতে থাকল। ভোঁস করে মাথা তুলে চোখ-মুখের জল হাত দিয়ে মুছে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ডোঙা নেই। বৈঠা নেই। মনে হল, দড়ি আছে একটুখানি।

দড়িটা খুলতে পারবে না?

দেখছি! বলে চাক্কু আবার ডুব দিল। ভোঁস করে মাথা তুলে বলল, নাঃ। পারা যাবে না।

ঠিক আছে। উঠে এস।

চাক্কু উঠে এসে ব্যাগ থেকে ছোট্ট তোয়ালে বের করে মাথা ও গা মুছতে থাকল। কর্নেল বললে, এবার কী মনে হচ্ছে তোমার?

চাক্কু হাঁপধরা গলায় বলল, কী মনে হবে? হারামজাদি বোধ করি ডোঙাটা ডোবানো আছে জানত। ও ডোঙা বাইতে পারে। নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে বহুদূর খুঁজলেন। বাঁ-দিকে— পূর্বে বাঁশবন তাই দৃষ্টি আটকে গেল। পুঁতি যদি বাঁশবনের দিকে ডোঙাটা নিয়ে যায়, দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বাঁশবনটার ওধারে কিছু দেখা যাবে না এ ঢিবি থেকে।

কর্নেল ও চাক্কু দরগার কাছে গিয়ে দেখলেন সবাই দরবেশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বংকুবিহারী কর্নেলকে দেখে বললেন, আপনারা কি পুঁতিকে খুঁজতে গিয়েছিলেন? খি খি শব্দে হাসলেন আইনরক্ষক।...কান টানলে মাথা আসে। চাক্কু, তোকে অ্যারেস্ট করলাম। চুপ করে এখান বস্। আয়! বস্ এখানে।

চাক্কু বলল, ডোঙা—

কথা কেড়ে বংকুবিহারী বললেন, ডোঙা পরে। কর্নেল সায়েব বলবেন ডোঙার কথা। বলুন!

কর্নেল বললেন, তার আগে যে তালডোঙা নিয়ে এখানে এসেছিল, তাকে খুঁজে বের করা দরকার। আমার বিশ্বাস কোথাও সে লুকিয়ে আছে। তার মানে,

যদি তাকে পাওয়া যায়, তবে বোঝা যাবে পুঁতিই ডোঙাটা নিয়ে পালিয়েছে। তা না হলে, আমার ভয় হচ্ছে—

ভয় পরে। আইনরক্ষক আদেশ জারি করলেন। প্রত্যেকে একেক দিকে খঁজতে থাকুন। তন্ন তন্ন খুঁজে দেখুন। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, কেউ সাঁতার কেটে পালানোর চেষ্টা করবেন না। যে পালাতে যাবেন, তাকেই মার্ডারার বলা হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?

ক্লারা আস্তানাঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা চাঙড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, ওটা কী? তারপর দৌড়ে গেল। গিয়েই চিৎকার করে উঠল, হত্যা! হত্যা! সবাই দৌড়ে গেল। চাঙড়ের পেছনে পুঁতি শুয়ে আছে। রক্ত।...

কিছু সূত্র এবং থিওরি

টাটকা রক্ত। গলা ফাঁক। এখনও গাড়িয়ে পড়ছে। গাছপালার জটিলতা ফুঁড়ে দিনের প্রথম রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে। আকাশে আলতোভাবে ভেসে চলেছে টুকরো-টুকরো সাদা মেঘ। ফাঁকা জায়গাগুলো প্রচণ্ড নীল। ঘনশ্যাম আকাশ দেখার ভান করছিলেন। ক্লারা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদোষ তার কাঁধে হাত রেখেছে। সেও এই ভয়ংকর বাস্তবতা থেকে উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছে। চারু পলকহীন চোখে তার প্রেমিকার বুকের পাশে বসে রক্ত দেখছে। বংকুবিহারীর হাতে রিভলবার। চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন, দেখছেন এবং চোখ পিটপিট করছেন। কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে পুঁতির দেহের চারপাশে ভিজে ঘাম ও মাটি খুঁজছেন। দেখছিলেন, রক্তের ধারা ঢাল গড়িয়ে বন্যার দুলন্ত জলে মিশে যাচ্ছে। পুঁতির দুটো পা জলে ভাসছে। দুলছে। একটা ঝোপের ডগাটুকু জেগে আছে পায়ের নিচে এবং সেই ডগায় বসে আছে একটা ঝলমলে প্রজাপতি। কর্নেল প্রজাপতিটা দেখতে থাকলেন। ভাবলেন, প্রজাপতির জাল হলে সহজে এই অসাধারণ প্রজাপতিটা ধরা যায় অবশ্য। কিন্তু মনস্থির করতে পারলেন না। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। গাঢ় নৈঃশব্দ্য ভেঙে কিছু বলবেন ভাবলেন। বললেন না।

বংকুবিহারী ফোঁস শব্দে শ্বাস ছাড়লে ব্রজহরি ভাঙা গলায় বললেন, আমিই বলেছিলাম—

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, কী?

হঠাৎ ছ্যাংরানো কণ্ঠস্বরে ব্রজহরি চেঁচিয়ে উঠলেন, দা স্যাটান লেট লুজ! আমরা কেউ বাঁচব না। প্রত্যেককে এইরকম চিত হয়ে পড়ে থাকতে হবে—গলা ফাঁক, চাপচাপ রক্ত, মুখে মাছি!

হরিপদ বাউল সবার পেছনে দুহাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছিল। মুখ তুলে ভিজে গলায় বলল, হায় গুরু! বলেই ফুঁপিয়ে উঠল।

banglaboimela.com

বংকুবিহারী গর্জন করলেন, এই ব্যাটা! ন্যাকামি করিস নে। আর ডাক্তারবাবু, আপনাকেও বলছি— ওসব পাগলামি ছাড়ুন। ইউ আর অল আন্ডার অ্যারেস্ট! আইনরক্ষক প্রত্যেকের দিকে রিভালবারের নল তুলে বললেন, ইউ! ইউ! ইউ! ইউ! চাক্কু, তুই নির্দোষ। কারণ তুই আমার সামনে ছিলিস। তুই খালাস! তারপর কর্নেলের উদ্দেশে বললেন, আপনার গিতিবিধি সন্দেহজনক। কাল থেকে আমি লক্ষ্য করছি। আপনার সঠিক পরিচয়—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। এটাই আশ্চর্য! মেয়েটি সম্ভবত বাধা দেবার এবং চেঁচাবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। এ থেকে মনে হয় খুনী ওর চেনা লোক।

বংকুবিহারী ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকলেন ওঁর দিকে। ঘনশ্যাম হাসবার চেষ্টা করে বললেন, এই দুটি ঘটনার— না, তিনটি ঘটনায়, মানে হতভাগা কুকুরটিকেও হিসেবে ধরা উচিত, প্রমাণিত হল আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ। তবে দারোগাবাবু যে বললেন, উই আর আন্ডার অ্যারেস্ট! এতেও এই সমাজব্যবস্থায় আইনের ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

ব্রজহরি ক্ষুব্ধ। বললন, এই মেয়েটি সদ্য খুন হয়েছে। ওই দেখুন, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। এবং ওকে যখন খুন করা হচ্ছে, তখন আমরা প্রত্যেকে দারোগাবাবুর সামনে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় প্রমাণিত হচ্ছে, আমরা কেউ ওকে খুন করিনি। সুতরাং হর্ষনাথবাবু ইজ কারেক্ট।

ঘনশ্যাম আরও জোর পেয়ে বললেন, কারেক্ট। কিন্তু একটু ভুল হল ডাক্তারবাবু! আমরা যখন আস্তানাঘরে মেয়েটিকে খুঁজতে এলাম, তখন একজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল না।

বংকুবিহারী বললেন, কে সে?

ঘনশ্যাম ক্লারার দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওই মেমসায়েব। মনে করে দেখুন, মেমসায়েবই এখানে দাঁড়িয়ে হত্যা হত্যা করে চেঁচাচ্ছিলেন।

ক্লারা কী বলতে যাচ্ছিল, প্রদোষ ঘুষি তুলে বলল, আর একটা কথা বললে দাঁত ভেঙে দেব।

ঘনশ্যাম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারো! তোমার মতো বিস্তর বুর্জোয়া-পাতি বুর্জোয়া আমার দেখা আছে। এস, চলে এস!

ব্রজহরি মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হচ্ছেটা কী? দারোগাবাবু, আবার একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে যে!

ক্লারা প্রদোষকে টানতে টানতে আস্তানাঘরের দিকে নিয়ে গেল। বংকুবিহারী হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লেন একটা চাঙড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, মরুক। সবাই মরুক। আমার কিছু করার নেই। আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে।

ব্রজহরি বললেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন! চলুন, আপনাকে একটা ট্যাবলেট দিই।

আমিও একটা খাব। আমারও মাথাটা কেমন করছে। মনে হচ্ছে চেঁচামেচি করি। সব ভাঙচুর করে ফেলি। চাক্কু, উঠে আয়! তোকেও একটা ট্যাবলেট দেব। চাক্কু! শুনতে পাচ্ছিস কী বলছি? কর্নেল, দেখুন তো ছোকরার কী হল?

চাক্কু এতক্ষণে দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। হরিপদ গিয়ে তাকে ধরল। টানতে টানতে নিয়ে এল উঁচু জায়গায়। চাক্কু নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ভাঙা গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি জলে ডুবে মরি। আমার আর বেঁচে থাকতে মন চায় না।

ঘনশ্যাম তার কাঁধ ধরলেন। ...মরবি কেন বাবা? লড়াই করে বরং মরবি। আয়, আমার সঙ্গে আয়। তোকে একটা-একটা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, গণ্ডোগোলটা কোথায়। কেন সবার আগে মেয়েদের গায়েই আঘাতটা পড়ে।

ঘনশ্যাম ও হরিপদ চাক্কুকে টানতে টানতে আস্তানাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। ব্রজহরি ভুরু কুঁচকে নাকে রুমাল চেপে বললেন, কর্নেলসায়েব! দারোগাবাবু! এই টাটকা রক্তের কাছে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমরা সত্যি পাগল হয়ে যাব। চলুন, দরবেশের ওখানে যাই। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করি। আসুন!

বংকুবিহারী গুম হয়ে বসে রইলেন। কর্নেল বললেন, ডাক্তারবাবু, কাল আপনি যেন কাকে দেখেছিলেন!

ব্রজহরির মনে পড়ল। নড়ে দাঁড়ালেন।...তাই তো! দেখেছিলাম যেন কালোমতো একটা কিছু— ওই যে গাছগুলো দেখছেন, ভাঙা দেয়ালটার কাছে।

বংকুবিহারী গলার ভেতর বললেন, তালডোঙাটার কথাও ভাবা উচিত।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ— তালডোঙাটা একটা বড় সূত্র। ধরুন, তালডোঙা চেপে যে এখানে এসেছিল তাকে শাওনি চিনত। আমি গিয়ে পড়ায় সে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তারপর শাওনি অথবা সে আড়াল থেকে দেখেছিল, আমি তালডোঙাটা কোথায় লুকিয়ে রাখছি।

বংকুবিহারী বললেন, আপনি মশাই অদ্ভুত লোক! আমাদের তক্ষুনি সেটা না জানিয়ে অমন করে এটা লুকোতে গেলেন কেন? ঠিক এই পয়েন্টটাতে আপনার অ্যাক্টিভিটি অত্যন্ত ডাউটফুল। তাই না ডাক্তারবাবু?

ব্রজহরি বাঁকা হেসে বললেন, উঁহু! ভেবেছিলেন আপনি বাঁচলে বাপের নাম। একা সুড়ুৎ করে কেটে পড়বেন আর কী! সেলফিশ অ্যাটিচ্যুড একেই বলে।

কর্নেল একটু হাসলেন। না ডাক্তারবাবু! লোকটা কে, আমার জানা দরকার ছিল।

বংকুবিহারী বলেন, কেন?

যেহেতু সে গা-ঢাকা দিয়েছিল আমার সাড়া পেয়েই।

ব্রজহরি চঞ্চল হয়ে চাপা স্বরে বললেন, একটা থিওরি মাথায় আসছে।

আইনরক্ষক দ্রুত বললেন, বলুন, বলুন!

BengaliDownload.com

ব্রজহরি চারিদিক দেখে নিয়ে তেমনি চাপা স্বরে বললেন, শাওনিও তালডোঙাটা— কর্নেলসায়েবের কথায় বিশ্বাস রেখেই বলছি, লুকিয়ে রাখা দেখেছিল। ধরুন, সে শেষরাত্তিরে সেটা জল থেকে তুলে এই দ্বীপ থেকে— হ্যাঁ, এটা এখন দ্বীপই বলা যায় কি না বলুন আপনারা?

বলা যায়। বংকুবিহারী সায় দিলেন। দ্বীপ বৈকি। চারদিকে অগাধ জল। সমুদ্র! মাঝখানে একটা দ্বীপ!

ব্রজহরি উত্তেজনায় বসে পড়লেন, আরেকটা চাঙড়ে।...ধরুন, ডোঙাটা তুলে জল বের করে শাওনি রেডি হয়েছে, এমন সময় লোকটা টের পেয়ে তাকে—

বংকুবিহারী বললেন, ওয়ান্ডারফুল! তাই বটে!

ব্রজহরি উৎসাহ পেয়ে বললেন, এছাড়া অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, কিন্তু ডোঙাটা লুকোনো ছিল দক্ষিণপূর্ব কোণে। শাওনির ডেডবডি পাওয়া গেছে পশ্চিমে— অনেক দূরে। আস্তানাঘরের পেছনের ঢালে ফণিমনসার ঝোপে।

ব্রজহরি বলেন, কোনো গণ্ডগোল নেই! সোজা হিসেব। ফ্লাডের জল দরগার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে লক্ষ্য করুন। বডিটা ভাসতে ভাসতে ওখানে চলে গেছে। ফণিমনসার কাঁটায় আটকে গেছে।

কিন্তু তাহলে পুঁতিকে খুন করল কে? কর্নেল বললেন। হত্যার পদ্ধতি অবিকল এক। শ্বাসনালী কেটে হত্যা।

ব্রজহরি দমে গিয়ে শ্বাস ছাড়লেন। বংকুবিহারী বললেন, লোকটা— ধরুন, চলে যায়নি। কোনো উদ্দেশ্য ছিল তার । এবং পুঁতি তাকে চিনতে পেরেছিল।

ব্রজহরি আবার উৎসাহ পেলেন।...ঠিক তাই। আমরা যখন ওদিকে শাওনির বডির কাছে, তখন সে এখানে তালডোঙাটা লুকিয়ে— ওই ঝোপগুলোর মধ্যে লুকোনো সহজ, এবং—

বংকুবিহারী বললেন, ভাসমান অবস্থায় লুকিয়ে, বলুন!

হুঁ, ভাসমান অবস্থায়। ব্রজহরি বললেন। তালডোঙায় নেমেই সে পুঁতির মুখোমুখি হল!

বংকুবিহারী বললেন, পুঁতি তাকে চিনত। কাজেই পুঁতিকে সে— মাই গুডনেস! বংকুবিহারী লাফিয়ে উঠলেন। লোকটা নিশ্চয় ইসমাইলডাকু— যাকে ধরতে ফাঁদ পেতেছিলাম!

ব্রজহরি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাচ্ছে সব! দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছে। পুঁতিকে মেরে রেখে বেগতিক বুঝে ডাকু ব্যাটা ডোঙায় চেপে পালিয়ে গেছে। কারণ ঠিক তখনই মেমসায়েব এদিকে আসছিল।

কর্নেল বললেন, কিন্তু জলটা হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে দেখছেন! পুঁতির কোমরঅব্দি বেড়েছে। ওই দেখুন!

মাই গুডনেস! বংকুবিহারী চমকে উঠে তাকালেন সেদিকে। পুঁতির বডিটা দুলছে। ভয় পাওয়া গলায় বলেন, ফের, কিছু করার নেই। উই আর হেল্পলেস! দা নেচার ইজ বিয়ন্ড দা রিচ অফ এনি হিউম্যান ল।

ব্রজহরি উদাত্ত স্বরে বললেন, আস্তানাঘরের ছাদে উঠব বেগতিক দেখলে। যদি দেখি, সেখানেও জল উঠছে, গাছে গিয়ে চাপব। পরস্পরকে হেল্প করব। কোঅপারেশন হল মানুষের টিকে থাকার মূল কথা । দা রুট অফ হিউম্যান একজিস্টেন্স। চলে আসুন! নেচারকে জয় করার ক্ষমতা মানুষের আছে। ভাববেন না!

বংকুবিহারী পা বাড়িয়ে বললেন, ট্যাবলেট দেবেন বলছিলেন।

দেব। আসুন। কর্নেলসায়েব! কী দেখছেন? ইসমাইলকে পালাতে দেখছেন নাকি?

কর্নেল একটা উঁচু লাইম-কংক্রিটের চাঙড়ে উঠে চোখে বাইনোকুলার রেখে উত্তরে কিছু দেখতে দেখতে বললেন, মৌরীনদীর ব্রিজটা খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, ভেঙেচুরে ভেসে গেছে।

বংকুবিহারী খাপ্পা হয়ে বললেন, যাক! ধ্বংস হয়ে যাক সবকিছু। আর পারা যায় না মশাই।

ব্রজহরি তাঁর কাঁধে হাত রেখে পা বাড়ালেন, বললেন, পাপ জমেছিল পৃথিবীতে। ধুয়ে মুছে যাচ্ছে— যাক। আবার সব নতুন হয়ে যাবে। সৃষ্টি স্থিতি, তারপর প্রলয়। আবার সৃষ্টি। আবার স্থিতি। আবার প্রলয়। দা ইটারন্যাল প্রসেস!

গমগমে কণ্ঠস্বরে এসব কথা বলতে বলতে চিকিৎসক ও আইনরক্ষক আস্তানাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

bengalidownload.com

কর্নেল চাঙড় থেকে নেমে পুঁতিকে টেনে উঁচুতে এনে রাখলেন। তারপর চোখে পড়ল, ওর ডান হাতের মুঠিতে কী একটা আটকে আছে। দেখলেন, কিন্তু কিছুই করলেন না। একফালি কাপড়ের মতো কিছু— পুঁতি খামচে ধরেছিল মরিয়া হয়ে চাপা নিঃশ্বাস ফেলে কর্নেল আস্তানাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। হয়তো ব্রজহরি ও বংকুবিহারীর থিওরিই ঠিক। কোনো এক ইসমাইল ডাকু একটি কুকুর এবং দুটি চেনা মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। কারণ এখানে দারোগাবাবুকে আবিষ্কার করে ভড়কে গিয়েছিল সে, যে-দারোগাবু তাকে ধরার জন্য হানা দিয়েছিলেন দুর্গম এক গ্রামে।

কিন্তু—

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাক্কুর কাছে নাকি একটি স্প্রিংয়ের ড্যাগার ছিল। কাল রাতে সেটা তার ব্যাগ থেকে উধাও হয়েছে। যথেষ্ট অন্ধকার ছিল বারান্দায়। ইসমাইলের পক্ষে তা হাতানো হয়তো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু—

আরও একটা কিন্তু আছে। সেটাই মারাত্মক। সব জটিল করে দিচ্ছে সেটা। সমস্যা হল, জল না নামলে আপাতত কিছু করা যাবে না। কর্নেল আবার পা বাড়ালেন। আগে ভাবতে পারেননি বন্যাটা এত বেশি হবে।...

খিচুড়ি! খিচুড়ি

ঘনশ্যাম রুদ্র বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে চাক্কু। চাক্কুর কাঁধে তাঁর হাত। ওপাশে বাউল হরিপদ। ঘনশ্যাম চাপা স্বরে চাক্কুকে বোঝাচ্ছিলেন, এই কথাটা তোমার বোঝা উচিত বাবা! যখনই কোনো বিপদ আসে, সেই বিপদের প্রথম ধাক্কাটা তোমাদের মতো গতর-খাটিয়ে মানুষের গায়েই লাগে। কেন এমন হয়? স্বীকার করছি ওই শাওনি মেয়েটি বেশ্যা ছিল। কিন্তু কেন সে বেশ্যা হয়েছিল? খুঁজে দেখলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। নিশ্চয়ই কেউ তাকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা সুস্থ সংসার থেকে টেনে এনে মুখ্যত বাগানপাড়ার গলিতে ঢুকিয়েছিল। তারপর আর হতভাগিনী সেখান থেকে বেরুনোর রাস্তা খুঁজে পায়নি। তারপর—

হরিপদ বলে উঠল বাবুমশাই, তাহলে একটা কথা বলি?

বলো, বলো, ঘনশ্যাম উৎসাহে সোজা হয়ে বসলেন।

হরিপদ একটু হাসল।...ওই যে মেজিকওলারা টাকার মেজিক দেখিয়ে বলে, বাবাসকল! মা সকল! সব মিথ্যে, পেট সত্যি। পেট! বাবুমশাই, পেট!

অসাধারণ বলেছ তুমি। ঘনশ্যাম সায় দিলেন। পেট— মানে, ক্ষিদে। এই যে তুমি বাউল হয়ে বেড়াচ্ছ হরিপদ, তুমি যে গুরু-গুরু করে স্লোগান দিচ্ছ, হেঁয়ালি আওড়াচ্ছ— আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো, ক্ষিদে পেলে তোমার গুরু-টুরু তত্ত্ব-টত্ত্ব কোথায় থাকে? তখন কারুর-না-কারুর কাছে দুমুঠো খাওয়ার জন্য সাধতেই হয়।

হরিপদ বিব্রতভাবে জিভ কেটে বলল, মাধুকরী বাবুমশাই, মাধুকরী!

হঠাৎ রেগে গেলেন ঘনশ্যাম।...চালাকি! পলাতক মনোবৃত্তি! এই চাক্কু রিকশো চালিয়ে খায়। সেও একজন যোদ্ধা। আর তুমি হরিপদ, তুমি কাপুরুষ। ছদ্মবেশী ভিখিরি। অলস, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, পরান্নভোজী!

আরও কিছু বলতেন, বংকুবিহারী ও ব্রজহরি এসে গেলেন। ব্রজহরি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আস্তানাঘর-সংলগ্ন ধসে পড়া ঘরটার দিকে একবার তাকালেন। বললেন, গতরাতে ওই ঘরটাই ধসে পড়েছিল কি না দেখুন তো দারোগাবাবু!

বংকুবিহারী বিরক্তমুখে বললেন, আমি কী করে বলব? আমার মাথায় অন্য চিন্তা। আমারই উপস্থিতিতে দু-দুটো খুন করে পালিয়ে গেল ইসমাইল ডাকু। দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ।

হরিপদ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।...হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ওই সেই ঘর। ওখানেই ডেকচিটা চাপা পড়েছে।

ব্রজহরি বললেন, ক্ষিদেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে। আপনারা আসুন, হাত লাগান। ইট-ফিট সরিয়ে খিচুড়ির ডেকচিটা উদ্ধার করা যাক্। আসুন, আসুন সবাই!

বংকুবিহারী হাত বাড়িয়ে বললেন, ক্যাপসুল! আগে প্রত্যেককে একটা করে ক্যাপসুল দিন— ইউ প্রমিজড, মাইন্ড দ্যাট!

হ্যাঁ— ক্যাপসুল। মাল্টিভিটামিন এনার্জি ক্যাপসুল! বলে ব্রজহরি ব্যস্তভাবে বারান্দায় উঠলেন। ওষুধের ব্যাগটি যথাস্থানে ছিল বর্ষাতি ঢাকা। একটা কৌটো বের করলেন ব্যাগ থেকে। প্রত্যেককে বিলি করলেন এবং নিজেও একটা গিলতে গেলেন— গিয়েই বললেন, কিন্তু জল? জল ছাড়া ট্যাবলেট গেলা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ আমার গলা শুকিয়ে আছে। আপনাদের কী অবস্থা?

সবার আগে ঘনশ্যাম বারান্দায় পুঁতে রাখা জালার ঢাকনা তুলে বললেন, প্রচুর জল! চলে আসুন সব।

ব্রজহরি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, কী করছেন, কী করছেন মশাই? ওতে এক বেশ্যার নোংরা পদার্থ মেশানো আছে! কী করে সব ভুলে যান বুঝি না! বরং বানের জল শুদ্ধ।

ঘনশ্যাম গ্রাহ্য করলেন না। বারান্দার দেয়ালের ঝুকে রাখা বাঁশের চুপড়ি থেকে একটি মাটির ভাঁড় নিয়ে সহাস্যে জালার জল তুলে কোঁৎ করে ক্যাপসুলটি গিললেন। বংকুবিহারী সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, কী বুঝলেন হর্ষবাবু?

কী বুঝব? বিশুদ্ধ জল।

কোনো গন্ধ-টন্ধ।

নাঃ! ঘনশ্যাম প্রাঙ্গণে নামলেন। বললেন, চাক্কু! হরিপদ! ওঁরা বাবু। ওঁরা গন্ধ শুঁকে জল পান করেন। তোমরা বাবু নও। যাও, দেরি কোরো না। ক্যাপসুল খেয়ে আমাদের শিগগির কাজে নামা দরকার।

কর্নেল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলেন। ঘুরে একটু হেসে বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি আশা করি 'শিবাম্বু' কথাটির সঙ্গে পরিচিত? প্রাচীন ভারতে শিবাম্বুপান প্রচলিত ছিল। এখনও শিবাম্বু চিকিৎসা পদ্ধতি দেশে চালু আছে। বংকুবিহারী লাফিয়ে উঠলেন।...দ্যাটস্ রাইট, দ্যাটস্ রাইট! মনে পড়ে গেছে!

ব্রজহরি তেতোমুখে বললেন, ধুর মশাই! সে তো স্ব-মূত্র পান! আপনি যতই বিদ্যে ফলান, আমি ও পথে নেই!

বলে ব্রজহরি সোজা ভাঙা দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বোঝা গেল, 'শুদ্ধ' বানের জলেই কাপসুল গিলবেন। ক্লারা অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। বলল, কর্নেল! বিষয়টি সম্পর্কে আমি জানতে চাই। কারণ আমি প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী।

bengalidownload.com

প্রদোষ বাঁকা মুখে বলল, ক্লারা! ইউ আর আ ম্যাড গার্ল! হি ইজ টকিং ননসেন্স, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড?

ক্লারা তাকে অগ্রাহ্য করে কর্নেলের কাছে এল। কর্নেল তাকে শিবাম্বু চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। ততক্ষণে বংকুবিহারী জালার জলে ক্যাপসুল গিলেছেন। তাঁর দেখাদেখি হরিপদ এবং চাক্কুও গিলেছে। ঘনশ্যাম ধসে পড়া ঘরের ইট ও লাইমকংক্রিট সরানোর কাজে হাত দিয়েছেন। বংকুবিহারী চাঙ্গা হয়ে হরিপদ ও চাক্কুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পাশে গেলেন। ধুপধাপ ধড়াস শব্দে ধ্বংসস্তূপ জড়ো হতে থাকল নিচের প্রাঙ্গণে। প্রদোষ পা বাড়িয়ে বলল, আই মাস্ট ফলো দা ফিজিশিয়ান; এবং দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল ক্লারা মুগ্ধভাবে শিবাম্বুতত্ত্ব শোনার পর জালার জলে ক্যাপসুল গিলল। এই সময় কর্নেলও জালার কাছে গেলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, যাই হোক, শেষ কথাটি তোমাকে বলা উচিত ডার্লিং। শাওনি সত্যিই তেমন কিছু করেনি— করতে পারে না। কারণ তার এটুকু বুদ্ধি ছিল যে এই জলবন্দী অবস্থায় জালার জলটা তাকেও খেতে হবে। আসলে ওটা তার ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়!

ক্লারা বলল, হ্যাঁ— সে বিষয়ে আমিও এখন একমত হলাম।

কর্নেল ক্যাপসুলটি জলের সাহায্যে গিলে বললেন, আরও একটা কথা। এই দরগায় শাওনি এসেছিল মানত দিতে। তুমি জানো না, এদেশে বেশ্যারা ধর্ম মানে। ঠাকুর দেবতা পিরে ভক্তি করে। প্রাণের দায়েই হয়তো করে। কাজেই পিরের দরগার জল নোংরা করার মতো সাহস তার থাকাই সম্ভব নয়।

ক্লারা হাসল। সঠিক কথা। জলে ইউরিনের গন্ধ পেলাম না।

বংকুবিহারী ডাকছিলেন, কৈ— সব আসুন! হাত লাগান! কর্নেল, মেমসাহেব! ডাক্তারবাবু! প্রদোষবাবু!

কর্নেল ও ক্লারা ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। ব্রজহরি ও প্রদোষ এসে পড়লেন। পুরোদমে খিচুড়ি উদ্ধার চলতে থাকল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডেকচির একাংশ দেখতে পাওয়া গেল। আরও পনের মিনিট পরে পুরোটা বেরুল। হরিপদ, চাক্কু ও ঘনশ্যাম বিজয়দর্পে সেটি বয়ে এনে বারান্দায় রাখলেন। প্রকাণ্ড ডেকচিটির গায়ে প্রচুর চুণসুরকিকাদা মেখে আছে। ব্রজহরি উদ্বোধনের ভঙ্গিতে ঢাকনাটি তুললেন। তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, ভেরি গুড! সবাই ঝুঁকে পড়লেন। দেখলেন এবং আনন্দে চঞ্চল হলেন সুঘ্রাণে।

এইসময় দরবেশের ঘরের দরজা খুলে গেল। অন্ধ দরবেশ দরজায় দাঁড়িয়ে একটু কাশলেন। তারপর কাতর স্বরে বললেন, বাবাসকল মা সকল! আমিও ভুখা আছি। দয়া করে আমাকেও দুমুঠো দেবেন।

হবে না! বংকুবিহারী তেড়ে গেলেন। ভেংচি কেটে বললেন, ভুখা আছি! ঘরভর্তি চালডাল— একটা কুমড়ো পর্যন্ত!— আবার বলা হচ্ছে ভুখা আছি!

ব্রজহরি বললেন, আপনি বড় স্বার্থপর দরবেশসায়েব! সাধুমহাত্মা লোকেদের এমন স্বভাব কখনও দেখিনি— এই প্রথম দেখলাম। তখন আপনাকে কত করে সাধলাম। টাকা দিতে চাইলাম পর্যন্ত!

ঘনশ্যাম বললেন, আহা! অন্ধমানুষ! ছেড়ে দিন।

চাক্কু বাঁকামুখে বলল, ওনার চ্যালা চুল্লু আছে না? চুল্লুকে হুকুম করলেই তো মুখের আহার এনে দেবে।

দরবেশ হাসলেন। চুল্লুকে যে আপনারা বাবাসকল মা সকল খেপিয়ে দিয়েছেন! চুল্লু কথা শুনছে না। খুনখারাপি করতে শুরু করেছে। করেনি? দয়া করে আর ওর নাম মুখে আনবেন না। আমিও আনব না। দুমুঠো আমাকেও দেন। তার বদলে থালা-বাসন যা লাগে আমি দিচ্ছি। সিন্দুকে অনেক থালা মজুত আছে। বাবাসকল, মা সকল! এসব থালা কতকালের পুরনো জানেন? সেই যখন বাদশা মুর্গিন খাঁর আমল।

ব্রজহরি ব্যস্তভাবে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থালা দিন। তাহলে আপনাকেও দু মুঠো দেব।

দরবেশ বললেন, আপনার গলা শুনে মনে হয়, আপনার মনে ভক্তি আছে। আসুন বাবা, আপনি আসুন। অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেব না। আমি অন্ধ হলেও খোঁড়াবাবার দয়ায় সব দিনবরাবর নজর হয় আমার। আপনি আসুন। কিন্তু হুঁশিয়ার, অন্য কেউ ঘরে ঢুকলে কলজেয় চিমটে বিঁধিয়ে দেব বলে দিচ্ছি।

ব্রজহরি ভয়ে-ভয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ঘরটি অপ্রশস্ত। ভ্যাপসা গন্ধটা অস্বস্তিকর। একটা তক্তপোশ, তাতে নোংরা বিছানা। একপাশে একটা কাঠের সিন্দুক। আবছা অন্ধকার। কোনো জানলা নেই। শুধু একটি ঘুলঘুলি আছে পেছন দিকের দেয়ালে— উঁচুতে। দরবেশ দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। চিমটে বাগিয়ে ধরেছেন। বললেন, সিন্দুকে তালা নেই। খুলে থালা বের করুন। আপনারা ক'জন আছেন?

ব্রজহরি আড়ষ্টভাবে বললেন, সাতজন। আপনাকে নিয়ে আটজন।

ন'খানা বের করুন।

কেন দরবেশবাবা?

চুল্লুর ভাগ। দরবেশ চাপা স্বরে বললেন। চুল্লুরও খিদে পেয়েছে। খেতে না পেলে আরও রেগে যাবে।

শুনে-শুনে অগত্যা ন'খানা থালা' বের করলেন ব্রজহরি। বারান্দায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, থালাগুলো দেউড়ির ওদিক থেকে ধুয়ে আনো হরিপদ। উঁহু, একা যেও না। চাক্কু যাও!

ঘনশ্যাম বললেন, আমিও যাই ওদের সঙ্গে। এখন থেকে পদে-পদে সতর্ক হওয়ার দরকার।

boighar.blogspot.com

তিনজনে চীনেমাটির সুদৃশ্য থলাগুলো নিয়ে ধুতে গেলেন। দরবেশ দরজার মুখে বসে বুকে চিমটেটি ঠুকতে শুরু করলেন। ঝুনঝুন শব্দ হতে থাকল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। বিড়বিড় করে কিছু আওড়াচ্ছেন। ক্লারা চাপাস্বরে কর্নেলকে বলল, উনি প্রার্থনা করছেন!

কর্নেল কিছু বললেন না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঝকমকে রোদ এসে বারান্দার কিছু অংশ এবং প্রাঙ্গণে পড়েছে। চোখে বাইনোকুলার রেখে আকাশ দেখতে থাকলেন। বংকুবিহারী বিরক্ত হয়ে বললেন, কী দেখেন খালি, বুঝি না!

কর্নেল আস্তে বললেন, শকুন!

হোয়াট? বংকুবিহারী আকাশের দিকে তাকালেন।

শকুনরা টের পেয়েছ এখানে তিনটে মড়া আছে। ওরা আসছে। ক্লারা দৌড়ে বারান্দার কোনায় রাখা কিটব্যাগ থেকে প্রদোষের বাইনোকুলারটি খুঁজে নিয়ে এল। চোখে রেখে বলল, কৈ? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, তোমার কাছে ক্যামেরা আছে ক্লারা?

ক্লারা দুঃখিত মুখে বলল, গাড়ির আসনে রেখেছিলাম। ভেসে গেছে গাড়ির সঙ্গে। প্রদোষ এজন্য দায়ী। শীঘ্র নামতে বলল গাড়ি থেকে। আমিও ভুলে গেলাম। সৌভাগ্যই বলব, এই বাইনোকুলারটি প্রদোষের গলায় আটক থাকায় নিষ্কৃতি লাভ করেছে।

বংকুবিহারী সহাস্যে বললেন, আপনার বাংলাভাষাটা এখনও প্র্যাকটিস হয়নি ম্যাডাম!

ক্লারা জবাব দিতে যাচ্ছিল, থালাসহ দলটি ফিরে আসায় বাধা পড়ল। ব্রজহরি বললেন, আগে কথামতো দরবেশবাবা আর তাঁর ইয়ে— অর্থাৎ অশরীরী আত্মাটির জন্য দুটো থালা আমাকে দিন।

খিচুড়ি একেবারে আঠা। তাতে কারুর আপত্তি নেই। দরবেশ থালাদুটি হস্তগত করেই তক্তাপোশে রাখলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। চুল্লুর সঙ্গে আহার করবেন বোঝা গেল। এবং চুল্লু বহিরাগতদের দেখা দেবে না, তাও বোঝা গেল।

বারান্দায় বসে চটাস চটাস হাপুস হুপুস শব্দ করে ক্ষুধার্ত লোকগুলি খেতে শুরু করল। কর্নেল দ্রুত থালা শেষ করে বললেন, দারোগাবাবু! এবার আরেকটা কাজে হাত লাগানো দরকার। শাওনি ও পুঁতির বডি দুটো তুলে এনে পাশের ঘরে রাখতে হবে। ওই শুনুন! গাছের ডগায় শকুন বসল।

বংকুবিহারী ঢেকুর তুলে বললে, ছেড়ে দিন!

কর্নেল এঁটো থালা ধুতে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। বললেন, ভুলে যাবেন না—এটা মার্ডার। বডি পোস্টমর্টেম করতে হবে। কেসডায়েরি লিখতে হবে। খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনার অনেক দায়িত্ব!

বংকুবিহারী বিরসমুখে বললেন, এখন তো ফ্লাড মশাই! ফ্লাডের জল কি সহজে নামবে ভাবছেন? ততদিনে বডি পচে ভুট হয়ে যাবে। আর খুনী তো ইসমাইলডাকু! তাকে যথাসময়ে অ্যারেস্ট করা যাবে। এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

হরিপদ এঁটো থালা নিয়ে শূন্য ডেকচিতে উঁকি দিচ্ছিল। ব্রজহরি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, কী দেখছিস বাবা? সব মুছে-টুছে পরিষ্কার করে সমানভাগে ভাগ করে দিয়েছি।

হরিপদ এঁটো হাত ঢুকিয়ে বলল, গুরুর ইচ্ছে ডাক্তারবাবু! তলায় পোড়াটুকুন আছে। ছাড়ি কেন?

ক্লারা খুশি মুখে খাচ্ছিল। প্রদোষ তেতোমুখে, ক্লারা বলল, সুন্দর! অসাধারণ। খিঁচুড়ি! সত্যই সুস্বাদু খিঁচুড়ি!

ব্রজহরি শুধরে দিলেন। হল না। ম্যাডাম! খিচুড়ি, খিচুড়ি!...

প্রতীক্ষা, সন্দেহ, ত্রাস

কর্নেল দু'হাঁটুতে হাত রেখে কুঁজো হয়ে সাপটিকে দেখছিলেন। বুনো ফুলের একটি জাঁকালো ঝোপ এক টুকরো ধ্বংসস্তূপের গা ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে। তার ভেতর চকরাবকরা ছায়া। সেখানে চিত্রবিচিত্র ছোট্ট সাপটি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। প্রাকৃতিক ক্যামফ্লেজের ফলে সাপটির অস্তিত্বটের পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কর্নেল প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে জানেন, চেনেন। প্রকৃতির কাছাকাছি হলেই তাঁর যেন একটি বাড়তি ইন্দ্রিয় শামুকের শুঁড়ের মতো খুলির ভেতর সন্তর্পণে উত্থিত হয়। বিভীষিকারও সৌন্দর্য আছে প্রকৃতিতে, সাপটি দেখতে দেখতে ভাবছিলেন কর্নেল। বৃষ্টিধোয়া সিঁদুরে এখন যত উজ্জ্বলতা, তত বিভীষিকা দু'হাত নিচে বন্যার জল দুলছে। সাপটি এবং বন্যা দু-ই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বিভীষিকার যুগপৎ প্রতীক বলা চলে। তবে প্রকৃতি জীবিত ও মৃতে ফারাক করে না। ওই রক্তাক্ত মৃতদেহগুলিও এখন প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে গেছে। রক্ত ও কান্নার পৃথক মূল্য দেয় না প্রকৃতি।

পেছনে একটু শব্দ। কর্নেল দ্রুত সোজা হলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, ক্লারা।

ক্লারা হাসল। আপনি সম্ভবত ভয় পেয়েছিলেন!

পেয়েছিলাম। কর্নেল স্বীকার করলেন। কিন্তু তুমি এভাবে একা ঘুরে বেড়িও না। ভারতীয় প্রকৃতি খুব বিপজ্জনক। এ তোমাদের সাজানো-গোছানো হাতেগড়া মার্কিন প্রকৃতি নয়। এর নিজস্বতা আছে, ক্লারা! প্রচণ্ডরকমের নিজস্বতা!

কর্নেল হাসছিলেন। ক্লারা সিরিয়াস হয়ে বলল, কিছুটা বুঝতে পেরেছি। এই নিজস্বতা আমাকে আকর্ষণ করছে। এ একটা আশ্চর্যজনক আদিমতা। এর

boiRboi.blogspot.com

ভেতরে ঢুকতে চাই। ভেতরে আপাতত একটি সাপ আছে। কর্নেল ঝোপটির দিকে আঙুল দেখালেন। দেখতে পারো!

ক্লারা উৎসাহে ঝুঁকে গেল। কিন্তু সাপটিকে দেখতে পেল না। কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন, হুঁ, লুকিয়ে পড়েছে। সরে এসো। আর শোনো, এভাবে একা ঘুরো না। প্রদোষ কোথায়?

ক্লারা কয়েক পা সরে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে বলল, বাইনোকুলার নিয়ে ওদিকে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। ত্রাণকারীদের নৌকা খুঁজছে। দারোগামহাশয় আদেশ দিয়েছেন, চারদিকে সকলে ত্রাণকারীদের নৌকা খুঁজবে। আমি চাই, ত্রাণকারীদের নৌকা দেরি করে আসুক। কারণ আমার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত উপভোগ্য।

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটি চুরুট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালেন। তারপর ক্লারার দিকে ঘুরলেন। ক্লারা, আমার মনে হয়, তোমার প্রদোষের কাছে যাওয়া উচিত। সে তোমার জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারে।

ক্লারা শক্ত মুখে বলল, হবে না। আমার স্পষ্ট বলা উচিত, সে আমাকে আর পছন্দ করছে না।

কর্নেল আস্তে বললেন, এ তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তথাপি আপনাকে জানাতে চাই। আপনি শুনুন। আমি কিছু লুকিয়ে রাখা সঠিক মনে করি না।

কর্নেল অবাক হয়ে তাকালেন। ক্লারাকে রাগী দেখাচ্ছিল। বললেন, বলো ক্লারা!

ক্লারা চাপাস্বরে বলল, কাল বিকেলে একটা ঘটনা ঘটেছিল। প্রদোষ যদিও বলল, শাওনি তাকে ব্ল্যাকমেল করছে, আমি বিশ্বাস করিনি। প্রদোষকে আমি জানি। সে শাওনিকে একা পেয়ে অসভ্যতা করে থাকবে। সে আমাকে বিবাহ করে সুখী হয়নি। সে প্রকৃতপক্ষে একজন 'মেমসাহেব' অর্জন করতে চেয়েছিল। ভারতে সে এটি একটি কৃতিত্ব হিসাবে দেখাতে চেয়েছে। একটি খেলার সামগ্রী মাত্র! এবং আমি জানি, ভারতীয় মাত্রেই এতে গৌরবান্বিত বোধ করে।

কর্নেল হাসলেন না। আর গম্ভীর হয়ে বললেন, বুঝলাম।

এখনও বুঝতে পারেননি! ক্লারা তেতো মুখে বলল। আমার কথাটা ভেবে দেখুন। আমি কী চেয়েছিলাম? একজন ভারতীয় পুরুষকে। প্রদোষ আমাকে ইওরোপীয় পোশাকে দেখতে চায়। আমার এই ভারতীয় নারীর পোশাক তার সহ্য হয় না। আমরাও সহ্য হয় না প্রদোষের ইওরোপীয় পোশাক।

হুঁ— বুঝলাম।

ক্লারা একই সুরে বলল, আমি প্রকৃত ভারতীয় পূজা দেখতে চেয়েছিলাম। প্রদোষ তার মামার বাড়িতে পূজা দেখাতে নিয়ে এল। বন্যায় এই দ্বীপে আটক

হলাম। প্রদোষের গাড়ি ভেসে গেল। এখন বুঝতে পারছি, তার উদ্দেশ্য ছিল সগৌরবে মামার বড়িতে একটি খেলার সামগ্রী প্রদর্শন। কারণ সে এই আটক অবস্থার মধ্যে সর্বদা আমাকে ইওরোপীয় পোশাক পরতে বলছে। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, আমি ত্রাণকারীদের নৌকা এলে আপনার সঙ্গে কলিকাতা ফিরে যাব। তারপর—

কর্নেল হঠাৎ বললেন, শাওনি প্রদোষকে ব্ল্যাকমেল করেছিল বললে?

ক্লারা নিষ্ঠুর মূর্তিতে বলল, প্রদোষই তাকে হত্যা করেছে বলে আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে।

হুঁ! কিন্তু পুঁতিকে?

প্রদোষের পক্ষে অসম্ভব নয়। পুঁতির দিকেও তার চোখ পড়েছিল সম্ভবত।...ক্লারার চোখে জলের ফোঁটা দেখা গেল। আস্তে বলল, আমি তার চরিত্রের ইতিহাস কতটুকু জানি? শুধু এইটুকু আভাস দিতে চাই, সে একজন অতিশয় কামুক পুরুষ।

বলেই ক্লারা চলে গেল। গাছপালা-ঝোপজঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল ফের ঝুঁকে গেলেন ফুলন্ত ঝোপটির দিকে। সাপটিকে খুঁজতে থাকলেন।...

ব্রজহরি গাছের শেকড়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ডানদিকে কিছুটা দূরে কুকুরটিকে ছিঁড়ে খাচ্ছে এক ঝাঁক শকুন। ভাবছিলেন, কর্নেলসায়েব লোকটির মাথা এখনও ঠাণ্ডা আছে। বাদবাকি সবাই প্রায়ই প্রায় পাগল হয়ে গেছে। ব্রজহরির নিজের অবস্থাও তাই—সেটা বুঝতে পারছেন। এই যে হাটাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দিতে, সেটাও পাগলামির লক্ষণ বলা চলে। জোর করে ইচ্ছেটাকে ঠেকিয়ে রাখছেন। কখনও ইচ্ছে করছে শকুনগুলোকে ঢিল ছুড়ে তাড়ান। বড্ড চ্যাঁচামেচি করছে ব্যাটাচ্ছেলেরা! আবার তখনই মনে হচ্ছে, বেশ্যা মেয়েটাকে অমন করে তুলে এনে পাশের ঘরটাতে রাখা হল, মেমসায়েবের দরদ উথলে উঠল এবং ভাবা যায় না, একটা সুন্দর সিল্কের শাড়িতে ঢেকে দিল,—তা না করে শকুনগুলোর মুখের সামনে ছুড়ে ফেলা উচিত ছিল না?

আর ওই মেয়েটাকেও! আগে যদি জানতেন, ওকে রিকশোওলা ছোকরা ভাগিয়ে এনেছে, তাহলে তারও বডি তুলতে বাধা দিতেন। দারোগাবাবুর কাছে সব কবুল করল ছোকরা, ধমকের চোটেই করল— অথচ দারোগাবাবুটি তাকে কিচ্ছু বললেন না আর! নিশ্চয় টাকা খেয়েছেন। বংকুবিহারী যে ঘুসখোর, ব্রজহরি তা জানেনই। নতুন কথা আর কী?

পেছনে একটা শব্দ হল। দারুণ আঁতকে উঠে ব্রজহরি তড়াক করে দাঁড়িয়ে ঘুরলেন। বংকুবিহরীকে দেখে হাসলেন ...ও আপনি? আসুন, আসুন। এক্ষুনি আপনার কথা ভাবছিলাম। অকেদিন বাঁচবেন।

pathagar.net

আর বাঁচা! বংকুবিহারী শ্বাস ছেড়ে বললেন। সে-আশা ছেড়ে দিয়েছি। আপনিও দিন।

ভয় পাওয়া মুখে ব্রজহরি বললেন, সে কী! নতুন কিছু কি ঘটেছে?

বংকুবিহারী প্রায় গর্জন করলেন। ওই শকুনগুলো! ওরা কেন এসেছে বুঝতে পারছেন না? আমাদের জ্যান্ত ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে।

ব্রজহরি ব্যস্তভাবে বললেন, সেটাও তো ভাবছিলাম এতক্ষণ। চলুন, ইটপাটকেল ছুঁড়ে ওদের তাড়িয়ে দিই!

বংকুবিহারী রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন মুখের। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, দূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়েছিলেন ওই ভদ্রলোক— এম এল এ'র ভাগ্নে। ছাদ থেকে বাইনোকুলারে দেখেছিলেন।

তারপর, তারপর?

তারপর আর কী? চলে গেল।

রুমাল নাড়তে বললেন না কেন। আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার সাহায্যেও অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত।

ধূর মশাই! বাইনোকুলারে দেখা নৌকো। খালি চোখে দেখাই গেল না। বংকুবিহারী কান পাতলেন ডানদিকে। অসহ্য! শকুনগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

ব্রজহরি একটা ইট কুড়িয়ে নিলেন পায়ের কাছ থেকে। পা বাড়িয়ে বললেন, চলুন! সবাইকে ডাক দিন। প্রচুর ইট আছে সাবধানে। আগে ইটগুলো এক জায়গায় জড়ো করে তারপর একসঙ্গে ছুঁড়তে শুরু করব।

বংকুবিহারী গুম হয়ে ভাবছিলেন। বললেন, পরে, পরে। ভাবছি, একটা গুলি ছুঁড়ে দেখব। একটা মারা পড়লে রিঅ্যাকশান বোঝা যাবে ওদের। ব্রজহরি লাফিয়ে উঠলেন। ...তাই তো! আপনার কাছে পিস্তল আছে!

এটা পিস্তল নয়, রিভলবার।

একই কথা। ব্রজহরি খুশিতে হাসলেন।

একই কথা নয় মশাই! বংকুবিহারী বললেন। পিস্তল আর রিভলবার আলাদা জিনিস। ছটা গুলি ছিল। সাপ মারতে দুটো গেছে। আর চারটে আছে। পিস্তল হলে আঠারোটা পর্যন্ত গুলি থাকত। ভাবতে হত না! কিন্তু রিভলবার বলেই ভাবতে হচ্ছে। এখনও আমরা নিরাপদ নই।

ফের চমকে উঠলেন ব্রজহরি। চাপাস্বরে বললেন, তেমন কিছু কি—

বংকুবিহারী চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, কর্নেলসায়েবের তালডোঙার গপ্পো আমি বিশ্বাস করি না।

হুঁ। লোকটি সন্দেহজনক। গতিবিধিও সন্দেহজনক।

আমার দৃঢ় ধারণা খুনী আমাদের মধ্যেই আছে, চেনা যাচ্ছে না।

বলেন কী! ব্রজহরি ভড়কে গেলেন। তাহলে তো একা-একা বসে রিলিফের নৌকোর খোঁজ করা বড় বিপজ্জনক। রীতিমতো রিস্কি।

রিস্কি হলেও উপায় নেই। বংকুবিহারী নির্বিকার মুখে বলেন। সাবধানে থাকলেই হল। একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসলেই হল। আপনি যেখানে বসেছিলেন, পেছনে গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে খুনী আপনার ওপর ঝাঁপ দিলেই হল! শেষে—

কাঁচুমাচু মুখে ব্রজহরি বাধা দিলেন, কী যে বলেন! আমাকে কেন খুন করবে কেউ?

কিছু বলা যায় না। সাবধানে থাকুন। বলে বংকুবিহারী বুটের শব্দ তুলে চলে গেলেন।

ব্রজহরি ইটটি ফেললেন না। একটু এগিয়ে ফাঁকা জায়গায় একটা লাইম কংক্রিটের চাঙড়ে বসলেন। খুব দুঃখিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। দারোগাবাবুটি তাঁকে এভাবে ভয় না দেখালে পারতেন! তিনি এলাকায় আসা অব্দি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রাতদুপুরে ঝড়-বৃষ্টিতে রোগীর বাড়ি থেকে ডাক এলে তিনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েন। একটি পয়সা বেশি ভিজিট নেন না। এমন মানুষকে কে খুন করবে— কেনই বা করবে?

হঠাৎ একটু চমক খেলেন মনে-মনে। ওই লোকটা— স্কুল-শিক্ষক বলে পরিচয় দিয়েছেন যে, হুঁ— হর্ষনাথ! হর্ষনাথ কাল বিকেলে বেশ্যাটার ওপর জবরদস্তি করছিল। বেশ্যাটাকে ব্রজহরি ভীষণ ঘৃণা করেছেন, সে জানে। বেশ্যাটা শেষ পর্যন্ত খুন হয়েছে। এখন কথা হল, হর্ষনাথ যদি তাকে খুন করে থাকে তাহলে ব্রজহরিকেও খুন করার ইচ্ছে জেগে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রতিহিংসাবশত— হুঁ, প্রতিহিংসা। কারণ তার পয়লানম্বর পাপ অর্থাৎ ধর্ষণের চেষ্টার বাধা ছিলেন ব্রজহরি!

ব্রজহরি মরিয়া হয়ে গেলেন এবং ইটটি শক্ত করে ধরলেন। মনে মনে বললেন, আয়! কাম অন! মুণ্ডু থেঁতো করে দেব ব্যাটাচ্ছেলের!...

তখন ঘনশ্যাম একটা ইটের চাঙড়ে বসে ঢুলছিলেন। ভাবনার ক্লান্তিজনিত ঢুলুনি। খালি পেটে বিপ্লব হয় না। প্রকৃতি বাধা দিলে বিপ্লব হয় না। রোগা, ক্ষুৎকাতর ক্ষেতমজুর দিয়ে বিপ্লব হয় না। সংগঠন গড়ে ছোটখাটো লড়াই করতে করতে বড় লড়াইয়ের দিকে এগোনো যায় বটে, কিন্তু বিপ্লব আলাদা জিনিস। বিপ্লব সামরিক ঘটনা। কারণ রাষ্ট্র সামরিকভাবে শক্তিশালী। তাই পাল্টা সামরিক সংগঠন চাই। ধুস! কী করলেন এতটা কাল— জীবনভর?

নিজের ওপর রেগে গিয়ে ঘনশ্যামের ঢুলুনিটা কেটে গেল। দেখলেন, বন্যার জল ইঞ্চি ছয়েক নেমে গেছে। সামনে তাকালেন। রিলিফের নৌকো না ঘোড়ার ডিম! ঘণ্টায় তিন ইঞ্চি করে যদি জলটা নামে, তাহলে মাটি জাগতে কতক্ষণ লাগবে হিসেব করতে গিয়ে পেছনে শব্দ। দারুণ চমকে ঘুরে বসলেন ঘনশ্যাম।

banglaboi.com

দারোগাবাবু বংকুবিহারী। বললেন, কী? চোখে পড়ল কিছু?

ঘনশ্যাম মাথা দোলালেন। তারপর গম্ভীর মুখে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, জল নামছে। এই দেখুন!

বংকুবিহারীর নজর গেল আঙুলের দিকে। আঙুলটা তর্জনী এবং ডগায় পট্টিবাঁধা। বললেন, আঙুল কাটলেন কিসে?

ঘনশ্যাম হকচকিয়ে বললেন, খিচুড়ি বের করার সময় ইট সরাতে গিয়ে—

বংকুবিহারী বাধা দিলেন। কিন্তু তখন আমরা কেউ দেখিনি। আপনি বলেননি!

আহা, তেমন বলার মতো কিছু নয় বলেই বলিনি। জাস্ট্ একটুখানি আঁচড় মাত্র।

আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার আছেন। আপনি তাঁকে বললেই ব্যান্ডেজ পেতেন। বংকুবিহারী সন্দিগ্ধভাবে বললেন। তাছাড়া এ টি এস ইঞ্জেকশানও পেতেন। কারণ এ থেকে টিটেনাস হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে-সব কিছুই করেননি। ওটা কী জড়িয়েছেন?

ঘনশ্যাম ভেতর-ভেতর খাপ্পা। কিন্তু মুখে কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে বললেন, ছেঁড়া লুঙ্গির একটা ফালি।

কোথায় পেলেন?

ঘনশ্যাম ফোঁস করে বললেন, আশ্চর্য!

আশ্চর্য তো বটেই। বংকুবিহারী ঝুঁকে গেলেন তাঁর দিকে। কৈ, খুলুন— দেখি কী অবস্থা।

যদি না দেখাই? ঘনশ্যামের মুখ লাল। চোখ বড়ো। নাকের ফুটো ফুলে উঠল।

বংকুবিহারী গলা চড়িয়ে বলেলেন, তাহলে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে!

বেশ। করুন। ঘনশ্যামের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। এ ঘনা রুদ্রকে অসংখ্যবার অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

বংকুবিহারী চমকে উঠে বললেন, ঘনা রুদ্র? মাই গুডনেস! তার মানে ঘনশ্যাম রুদ্র? পলিটিকাল অ্যাব্স্কনডার? রিভলবার বেরিয়ে এল ঝটপট।...ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। উঠুন! আর— আপনার ব্যাগটা দিন।

বাঁকা হেসে ঘনশ্যাম তাঁর কাপড়ের ব্যাগটা ছুড়ে দিলেন সামনে। বংকুবিহারী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে রীতিমতো তল্লাস করে ফেরত দিলেন। বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

নিয়ে যাবেনটা কোথায়? ঘনশ্যাম খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলেন। মরিয়া হাসি। চলুন, নিয়ে চলুন! যাচ্ছি!

বংকুবিহারী ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছিলেন। পুলিশ রেকর্ডে লোকটিকে

'বিপজ্জনক ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা আছে। বলা যায় না, রিভলবার বা পিস্তল থাকতেও পারে জামার পকেটে কিংবা কোমরে ধুতির ভাঁজে লুকোনো। তার চেয়ে বড় কথা, গ্রেফতার করে বড়জোর আস্তানা ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তারপর? বন্যার জল কখন নামবে, কিংবা কখন দৈবাৎ একটা রিলিফের নৌকো এসে পড়বে— সেই অনিশ্চিত সময়ের জন্য তাঁকে পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে। কী করা উচিত ঠিক করতে পারছিলেন না অইনরক্ষক।

ঘনশ্যাম বাঁকা মুখে বললন, কী হল? আসুন!

বংকুবিহারী রিভলবার তুলে শাসালেন।...গুলি করে ঠ্যাং ভেঙে দেব। দুই ঠ্যাঙে দুটো গুলি। পড়ে থাকবেন। কাতরাবেন। পালাতে পারবেন না।

সোজা দাঁড়িয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিলেন ঘনশ্যাম।...ভাল কথা! করুন গুলি! ঠ্যাঙ ভেঙে না হয়ে পড়েই রইলুম। ঘনা রুদ্রের শরীর অনেক গুলির দাগ আছে। যদি দেখতে চান, দেখাতে পারি। কিন্তু তারপর কী হবে, সেটাও বলে দিই। আপনার বউ বিধবা হবে। কারণ আমার কমরেডরা আপনাকে জবাই করবে। ঠিক যেভাবে ওই মেয়ে দুটোকে জবাই করা হয়েছে, তার চেয়ে বীভৎসভাবে। কেন? না— আপনি তাদের নেতার ঠ্যাং ভেঙেছেন। একটা নয়, দুটো ঠ্যাং! মাইন্ড দ্যাট।

হঠাৎ বংকুবিহারী হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন। ...ধুর মশাই! বিপদের সময় কীসব রসিকতা হচ্ছে! চেপে যান। কাউকে বলবেন না আপনি ঘনাবাবু। আমিও বলব না। বুঝলেন না? বিপদের সময় সাপে-নেউলে বাঘে-গরুতে এক হয়ে যায়। তখন শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ থাকে না। আপনাকে জাস্ট একটু ভড়কি দিয়ে দেখে নিলাম। বসুন। নজর রাখুন। রিলিফের নৌকো দেখলেই চেঁচাবেন। যত জোরে পারেন চেঁচাবেন। আমরা সবাই এসে জড়ো হব একসঙ্গে চেঁচাব।

এটা বংকুবিহারীর ধূর্তামি। মনে মনে বললেন, রোশো ব্যাটাচ্ছেলে বিপ্লবী না টিপ্লবী! সময় এলে ব্যবস্থা হবে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে যতক্ষণ রাখা যায়।

আর ঘনশ্যাম মনে মনে বললেন, খুব দিয়েছি! ভয় পেয়ে গেছে ব্যাটাচ্ছেলে!

বংকুবিহারী রিভলবারটি খাপে ভরলেন এবং পা বাড়িয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি চলে গেলে ঘনস্যাম চাঙড়টাতে বসে পড়লেন। আবার ঢুলতে শুরু করলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।...

চাক্কু রাঙা চোখে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। একটা দোনামনা ভাব তাকে পেয়ে বসছিল। একবার ভাবছিল, এক্ষুনি ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে যাবে, এই ভয়ঙ্কর দরগায় তার আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না— আবার ভাবছিল, তাহলে দারোগাবাবু তাকে সন্দেহ করবেন, সময়মতো হাজতে ঢুকিয়ে বেদম ঠ্যাঙানি দেবেন, আর খুনের দায়টা তো পড়বেই তার ঘাড়ে।

amarboimela.com

কিন্তু এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, একখানা রিলিফের নৌকোও নজর হচ্ছে না কেন? এও ঠিক এ দরগাটা চারদিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে। তবে একটু তফাত দিয়ে পাকা রাস্তা আছে। সেখান দিয়েও কোনো নৌকো চলাচল করছে না। কেন? করলে হরিপদর মুখে খবর হত। সে ওদিকেই বসে আছে কোথাও।

এর একটাই মানে হয়— চুল্লু! চুল্লুর কথা সে শুনেছে ছেলেবেলা থেকে। চুল্লু এক চ্যালা— অশরীরী আত্মা। সে নাকি খোঁড়াপিরের দরগা পাহারা দেয়। চাক্কুর মনে হল, কানা দরবেশই চুল্লুকে লেলিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর। দিয়েছেন, তার একটাই কারণ, ওই বেশ্যা হারামজাদি! খোঁড়াপিরের পবিত্র দরগায় বেশ্যা এসে বেশ্যাগিরি করে বেড়াচ্ছিল— কে জানে, দরবেশবাবার সঙ্গে ও ঢলাঢলি করতে গিয়েছিল কি না! হয়তো গিয়েছিল ; চাক্কু নড়ে বসল। আলবাৎ গিয়েছিল। সে জন্যই চুল্লুকে দিয়ে ওকে জবাই করিয়েছেন দরবেশবাবা। কিন্তু পুঁতি?

চাক্কু ভেবে পেল না, পুঁতি কী দোষ করল দরবেশবাবার কাছে? নাকি পুঁতি ক্ষিদের জ্বালায় দরবেশবাবার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে গিয়েছিল? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। দরবেশবাবার ঘরে খাবার-দাবার আছে। পুঁতি কি পোড়া পেটের জন্য দরবেশবাবাকে—

চাক্কু চমকে উঠে ঘুরল। পেছনে পায়ের শব্দ।

মেমসায়েব। মুখে পাগলাটে হাসি। বললেন, আপনি এখানে আছেন?

আপনাকে খুঁজছিলাম।

চাক্কু বলল, আজ্ঞে?

ক্লারা একটা লম্বাটে পাথরের স্ল্যাবে বসল। আপনার কাছে গল্প শুনতে এলাম। ক্লারা একটা ঘাস ছিঁড়ে নিল হাত বাড়িয়ে। বলল, আমি জানি, আপনি ভীষণ দুঃখিত। শোকগ্রস্ত। আপনার স্ত্রী নিহত হয়েছেন। কিন্তু আমার ধারণা, কথাবার্তা শোক দূর করে। আপনি কিছু কথা বলুন, এই দেশ সম্পর্কে অথবা আপনার যা ইচ্ছা।

চাক্কু রোদ্দুরে দেশলাই শুকিয়ে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেটে এখনও তিনটে সিগারেট আছে। সে একটা ধরিয়ে জোরে টান দিল। ধোঁয়ার ভেতর বলল, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না মেমসায়েব! আর নতুন কথা কী বলব?

ক্লারা বলল, আমার মতো আপনার অবস্থা। আপনি কি আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারেন?

চাক্কু জানে, দেখেছে, মেমসায়েবরাও সিগারেট টানে। তার কাছে মেমসায়েব সিগারেট চাওয়ায় সে খুশি হল। সিগারেট ও দেশলাই দিল।

ক্লারা হাল্কা একটা টান দিয়ে হাসল। ...ভারতে আসার আগে আমি ধূমপান

ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই বিপদের অবস্থায় ধূমপান একটা শান্তি। আপনাদের দেশে নারীরা ধূমপান করেন না শুনেছি।

চাক্কু অগত্যা হাসল।...করে। করে বৈকি।

ধূ-ম-পা-ন, অর্থাৎ সিগারেটের কথা বলছি!

বুঝেছি। চাক্কু বলল জোরগলায়। বাবু ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েরা না খেতে পারে। গাঁগেরামে আমাদের মতো ঘরে, আজ্ঞে, সিগারেট কোথা পাবে? তবে বিড়ি-তামাকটা খায়। তাপরে আজ্ঞে, মদ-তাড়িও খায়।

ক্লারা উৎসাহে বলল, বলুন, বলুন! আমাকে ভুল বলা হয়েছিল বুঝতে পারছি।...

প্রদোষ আস্তানাঘরের ছাদের কার্নিশে বসে বাইনোকুলারে সুদূর জল দেখতে দেখতে বাঁ-দিকে ঘুরেই অবাক হল। বাইনোকুলারে দেখল ক্লারার ঠোঁটে সিগারেট, তার পাশে রিকশোওলা ছোকরাটি। অসহ্য লাগায় প্রদোষ বাইনোকুলার নামিয়ে ফেলল। রাগে ও ঘৃণায় সে অস্থির— কিন্তু এ মুহূর্তে কী করবে ঠিক করতে পারল না। আদিম ভারতের ভেতরে ঢুকে পড়তে চেয়েছিল ক্লারা। ঘটনাচক্রে অনেকখানি ঢুকে পড়েছে। প্রদোষ তার উপলক্ষ মাত্র। প্রদোষ তার নিতান্ত চাবিকাঠি। প্রদোষের স্ত্রী সেজে ক্লারা ভারতে ঢুকেছে এবং যথাসময়ে তাকে ফেলে চলে যাবে। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে বইটই লিখে ফেলবে। সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে প্রদোষের কাছে। প্রদোষ ঠোঁট কামড়ে ধরল।...

ঢুলুনি কেটে গেল ঘনশ্যামের। পাশের ঝোপটা নড়ছে। খস খস শব্দ। বললেন, কে, কে?

কর্নেল সাড়া দিলেন, আমি।

ঘনশ্যাম গম্ভীর হয়ে বললেন, ঝোপের ভেতর সাপখোপ থাকতে পারে। ওখানে ঢুকে কী করছেন?

কর্নেল বেরিয়ে এলেন।...জলের অবস্থা দেখছিলাম। ইঞ্চি সাত-আট নেমেছে মনে হল। বলে কর্নেল একটু হাসলেন। দারোগাবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিলেন। কী ব্যাপার?

ঘনশ্যাম ভুরু কুঁচকে বললেন, আপনাকে বলার কোনো দরকার আছে কি? সব সময় লক্ষ্য করছি, সবতাতে আপনি নাক গলিয়ে বেড়াচ্ছেন। কে আপনি? আপনার সঠিক পরিচয় কী?

ঘনশ্যামবাবু, আমার পরিচয় গোপনের প্রয়োজন হয় না।

ঘনশ্যাম চমকানো গলায় বললেন,—হুঁ—যা সন্দেহ করেছিলাম। আপনি সি বি আই অফিসার?

মোটেও না ঘনশ্যামবাবু! কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে দূরে কিছু দেখতে দেখতে বললেন। আমার নাম সত্যিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তবে

bengalidownload.com

নাকগলানোর কথা বললেন, ওটা আমার স্বভাব। কাল বিকেলে আপনি শাওনিকে থাপ্পড় মেরেছিলেন। তার ফলে ওর কানের গয়নায় আপনার আঙুল কেটে যায়। কথাটা দারোগাবাবুর কাছে গোপন না করলে আপনি স্কুলটিচার হর্ষনাথই থেকে যেতেন। আসলে, সহজ সত্য গোপন করতে গেলে ঝামেলা বাড়ে।

ঘনশ্যাম মুখ বাঁকা করে বললেন, বাঃ! বলেছেন ভালো! ওই বাঁকামুখো দারোগাবাবুটিকে আপনি চেনেন না! আসল কথাটা বললে ঠিকই ধরে নিত আমিই শাওনিকে খুন করেছি।

উনি কিন্তু তাই ধরে নিয়েছেন!

আমি শাওনিকে খুন করিনি। ঘনশ্যাম রোখের মুখে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বিপ্লবী। বিপ্লবীরা অকারণ নরহত্যা করে না। তাছাড়া ওই হতভাগিনীর প্রতি বিপ্লবী মানুষের সিম্প্যাথিই স্বাভাবিক।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হেসে বললেন, ঠিক তাই।

তাহলে প্রত্যেকের পেছনে ওত পেতে বেড়াবেন না। আমাকে একলা থাকতে দিন।

থাকুন। কিন্তু সাবধান!

তার মানে?

কর্নেল পা বাড়িয়ে ছিলেন। ঘুরে আস্তে বললেন, আপনি কি এর আগে কখনও এই দরগায় এসেছেন?

নাঃ। কেন এ কথা জিগ্যেস করছেন জানতে পারি?

এমনি। বলে কর্নেল উঠে গেলেন ঢালের ওপর। ঘনশ্যাম তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কর্নেল অদৃশ্য হয়ে গেলে ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন।...

কর্নেল দরগার প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন, অন্ধ দরবেশ চিমটে বুকে ঠুকতে ঠুকতে দরগার দিকে চলেছেন। আস্তানাঘরের দরজায় তালা। নির্ভুল অভ্যস্ত পদক্ষেপে দরবেশ উঁচু দরগা বা পিরের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাঁক দিলেন, চুল্লু! তারপর দরগার কিনারায় প্রকাণ্ড চিমটেটি রেখে নমাজ পড়া শুরু করলেন। কর্নেল ঘড়ি দেখলেন সাড়ে বারোটা বাজে। দক্ষিণের বটতলার ওখানে শকুনের চেঁচামেচি থেমেছে। শকুনগুলো চলে যায়নি। বংকুবিহারীকে খুঁজছিলেন। দেখতে পেলেন না। আছেন কোথায়, রিলিফের নৌকোর প্রতীক্ষা করছেন।...

ব্রজহরি ভাবছিলেন, আর পারা যায় না। আস্তানাঘরের বারান্দায় গিয়ে শুয়ে পড়বেন। রিলিফের নৌকোর আশা বৃথা। উঠতে গিয়ে চমকে বললেন, কে, কে?

দেখলেন, কর্নেলসায়েব। তখন হাসলেন।...ও! আপনি! কিন্তু সাড়া না দিয়ে আসতে আছে এমন করে? যা অবস্থা!

কর্নেল বললেন, কিছু দেখতে পেলেন ডাক্তারবাবু?

ব্রজহরি দঃখের মধ্যে হাসলেন।...মরীচিকা! বুড়ো আঙুলও নেড়ে দিলেন অভ্যাসমতো।...খালি মরীচিকা দেখছি কর্নেলসায়েব!

নৌকোর মরীচিকা?

শুধু নৌকোর কেন— কতরকম!

যেমন?

চুল্লুর। ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্যা-খ্যা করে আরও হাসতে লাগলেন ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু।

চুল্লুকে দেখলেন বুঝি?

শব্দ শুনলাম, বুঝলেন? শব্দ খসখস, মচমচ, ধুপধাপ! বলে ব্রজহরি গাছপালার দিকে আঙুল তুললেন। যদি বলেন বাতাস, তো বাতাস। চুল্লু তো চুল্লু! তবে— গলা নামিয়ে ফের বললেন, কাল একটা কালোমতো জিনিস দেখেছিলাম কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কিছুক্ষণ আগেও মনে হল, ওই ভাঙা ঘরগুলোর ভেতর কী একটা দেখলাম। আপনি যদি সঙ্গে যান, খুঁজে দেখতে আপত্তি নেই। কারণ আমার ধারণা, আমাদের অজানা কেউ এই দরগার ঢিবিতে লুকয়ে আছে। আসুন না, দেখি—

আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি এই দরগায় আগে কখনও এসেছেন?

নাঃ। কেন বলুন তো?

এমনি। বলে কর্নেল চলে গেলেন বাঁদিকের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। ব্রজহরি তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাবলেন, লোকটা কে? সত্যিই কি কোনো রিটায়ার্ড কর্নেল? বড় রহস্যময় গতিবিধি এই বুড়ো ভদ্রলোকের। শাদা দাড়িগুলো আসল, না নকল? দারোগাবাবুর কাছে কথাটা তুলতে হবে এক্ষুনি। ব্রজহরি হন্তদন্ত পা বাড়ালেন বংকুবিহারীর খোঁজে।...

চাক্কু মেমসায়েবকে এই দরগার খোঁড়া পিরের কাহিনী শোনাচ্ছিল। এক বর্ষার দিনে একজন লোক মানত করতে এসে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল। পিরসায়েব তাকে বলেন, থাক বাবা— এই বৃষ্টিতে বেরুসনি। দু'মুঠো রান্না করি। খা। খেয়ে ঘুমো। কিন্তু খবর্দার, আমি যতক্ষণ রান্না করব, চোখ বুজে থাকবি। চোখ খুললে তোর বিপদ, আমারও বিপদ। কিন্তু লোকটা চোখ বুজে কতক্ষণ থাকবে? তাছাড়া তার প্রচণ্ড ইচ্ছে, ব্যাপারটা দেখবে। সে চোখ খুলে দেখে কী, পিরসায়েব উনুনে একটা ঠ্যাং ভরে রেখেছেন আর সেই ঠ্যাংটাই জ্বলছে। কাঠের বদলে ঠ্যাং! ব্যস! লোকটাও পাগল হয়ে গেল তাই দেখে। এদিকে মানুষের চোখ পড়ায় পিরসায়েবের ঠ্যাংটাও গেল পুড়ে। খোঁড়া হয়ে গেলেন। সেই থেকে খোঁড়া পির নাম। চাক্কুর ঠাকুর্দার কাছে শোনা কথা।

গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ পেছনে শব্দ। দু'জনে চমকে উঠেছিল। ঘুরে দেখল, কর্নেল। বললেন, এই যে ক্লারা! তুমি এখানে— আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম!

boiRboi.blogspot.com

ক্লারা উদ্বিগ্নমুখে বলল, কেন বলুন? কিছু কি বিপদ হয়েছে?

না। কর্নেল একটা চাঙড়ে বসলেন। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে খুঁজিনি।

তবে—

বলুন পিতা!

তুমি আমাকে পিতা বললে!

বলতে ইচ্ছা হল। ক্লারা একটু হাসল।...আপনাকে মাঝে মাঝে খ্রিস্টীয় ফাদার দেখায়। আমি কী বলতে চাইছি, আশা করি বুঝেছেন। অবশ্য আপনি একজন কলোনেল— দুঃখিত, আমেরিকাবাসীরা কর্নেল বলে না— মুখের ভুল!

ক্লারা! কর্নেল জার্মান ভাষায় বললেন, প্রদোষ সম্পর্কে তোমার ধারণা হয়তো ভুল। ওর সঙ্গে তুমি মিটমাট করে নাও। আমি সাহায্য করতে রাজি। কারণ তুমি আমাকে যে অর্থে হোক, পিতা বলে ডেকেছ!

ক্লারা অবাক হয়ে জার্মান ভাষায় বলল, আপনি জার্মান জানেন?

জানি। যাই হোক, তুমি ওর কাছে যাও। তার সঙ্গে কথা বলো। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

ক্লারা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করতে রাজি। কিন্তু প্রদোষ আমার সঙ্গে কথা বলছে না।

তুমি এখনই যাও। ওকে নেমে আসতে বলো ছাদ থেকে। বলো, জরুরি দরকার আছে।

ক্লারা কর্নেলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ছোট্ট শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে চলে গেল। তার চলার ভঙ্গি দেখে কর্নেল বুঝলেন, হয়তো প্রদোষের কাছে সে যাচ্ছে না। মনে মনে বিরক্ত হয়ে নিছক স্থানত্যাগ করছে। মেয়েটি অদ্ভুত প্রকৃতির যেন। কর্নেল ডাকলেন, চাক্কু!

চাক্কু হাঁ করে তাকিয়ে দুজনকে লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। বলল, আজ্ঞে সার?

তুমি আগে কখনও এ দরগায় এসেছ?

আজ্ঞে না, স্যার। তবে পেসেঞ্জার পৌঁছে দিয়েছি নিচের রাস্তায়।

পুঁতি কখনও এসেছিল কি না জানো?

পুঁতি— চাক্কু স্মরণ করার চেষ্টা করে বলল, তা এসে থাকতেও পারে। কেন সার?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে বললেন, আচ্ছা চাক্কু, পুঁতিকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয়?

চাক্কু মুখ নামিয়ে এক টুকরো ইট পায়ের কাছে পাথরের স্ল্যাবে ঠুকতে ঠুকতে বলল, আমার ডেগারখানা পুঁতি কখন হাতিয়েছিল— তা' পরে মনে হয়, শাওনিকে তাই দিয়ে খুন করেছিল...

পুঁতি? কর্নেল ঝুঁকে গেলেন তার দিকে।

চাক্কু গলার ভেতর বলল, পুঁতি খুব তেজী মেয়ে ছিল। নদীর ধারের ডুবো দেশের মেয়ে। ওর ওইরকমই। কখন আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে শাওনিকে আচমকা ধরে গলায় প্যাঁচ দিয়ে থাকবে।

কিন্তু পুঁতিকে কে খুন করল তাহলে?

চাক্কু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, হরিপদকে সন্দ হয় আমার।

কেন বলো তো? সে তো বাউল!

চাক্কু তেতোমুখে বলল, হতে পারে বাউল-বোষ্টম। বাইরে থেকে কাউকে কি চেনা যায় সার? এই যে আমাকে দেখছেন, আম্মো কি কম? কম নইকো। এই বিপদের মধ্যে আটকে আছি, তাই। নৈলে—

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, নৈলে তুমি হরিপদকে জবাই করতে বুঝি?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। চাক্কু শক্তমুখে বলল। সার! আমি এখন মরিয়া। আমার মাথায় খুন চড়ে আছে।

বুঝলাম। কিন্তু হরিপদ কেন খুন করবে পুঁতিকে?

চাক্কু একটু দোনামনা করার পর চাপাস্বরে বলল, তাহলে আসল কথাটা খুলে বলি, সার?

বলো, বলো!

শাওনির আসল নাম ছিল হরিমতী। চাক্কু আরও ফিসফিসিয়ে উঠল। শাওনির সব কথা আমার জানা। আমি, সার, এই তল্লাটের ছেলে। হরিমতী ছিল এলোকেশী বোষ্টুমীর মেয়ে। হরিপদ তাকে কিনেছিল এলোকেশীর কাছে। বাউলবোষ্টমরা কড়ি দিয়ে বোষ্টুমী কেনে, জানেন তে? কণ্ঠিবদল হয়— সেটাই ওদের বিয়ে বলতে পারেন। তো আগের বছর নবাবগঞ্জেতে ঝুলনের মেলার সময় হরিমতী হরিপদকে ছেড়ে এক বাবুর 'রাখনি' হয়েছিল। রাখনি বোঝেন তো সার?

রক্ষিতা?

আজ্ঞে! চাক্কু মাথা দোলাল। 'রক্ষিতে'। হরিপদ আমার চেনা লোক। আমি সব জানি। এবার আপনি ইশারায় বাকিটা বুঝে নেন। বাবুর সঙ্গে বনিবনা হল না, তখন হরিমতী কী করবে? 'শাওনি' হয়ে বাগানপাড়ায় ঢুকল। আমি, সার, রিকশো চালিয়ে খাই। অনেক লোকের অনেক খবর আমার জানা। বাগানপাড়ার গলির খবরও জানা।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, শাওনিকে এখানে দেখে হরিপদ কি কিছু বলেছিল তাকে— কিংবা তোমাকে?

boighdownload.com

চাক্কু জোরে মাথা দোলাল। না— বলেনি। বললে শাওনি হরিপদকে একশো খিস্তি না করে ছাড়ত ভাবছেন? তবে—

তবে কী?

চাক্কু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কাল রেতের বেলা হরিপদর গানখানা মনে করে দেখুন। সেই গানখানা, সার! 'মরা মানুষ পড়ল ধরা ছিমতী (শ্রীমতী) ভাগীরথীতে/চিত হয়ে ভাসচে জলে ঠুকরে খায় ডাল-কোয়োতে (দাঁড়কাকে) ॥' গানখানা শুনে আমার কেমন যেন সন্দ সন্দ, ধন্দ বলুন ধন্দ, লাগছিল। তা'পরে যখন গলাকাটা শাওনিকে জলে সেইরকম অবস্থায় দেখলাম, পেথমে হরিপদ শালাকে ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পুঁতি হঠাৎ বলল, চান করব। আর হরিপদ অমন করে কাঁদছিল— আপনি দেখেননি?

লক্ষ্য করিনি। তখন শাওনিকে ওই অবস্থায় দেখে আমি তো বটেই, আমরা সবাই কেমন হয়ে পড়েছিলাম। কর্নেল স্বীকার করার সুরে বললেন। হ্যাঁ— তখন সবার চোখ ছিল শাওনির দিকে।

চাক্কু বলল, আমার ছিল না। আমি পেথমে পুঁতিকে, তাপরে হরিপদকে দেখছিলাম। শাওনি কাল বিকেলে পুঁতির সামনে আমার সঙ্গে মস্করা করতে গেল। পুঁতি ক্ষেপে গেল আমার ওপর। শাওনির ওপরও বটে! শাওনি আমাকে বলছিল, মেয়েটাকে ভাগিয়ে এনেছি আমি। বেচে দিলে পাঁচশো টাকা পাইয়ে দেবে। কাজেই বুঝলেন সার? শাওনিকে পুঁতিই আমর ডেগার দিয়ে মেরেছে।

কর্নেল সায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন, হুঁ। পুঁতির রাগের আরও একটা কারণ থাকতে পারে। রাত্রে দারোগাবাবুর কথায় শাওনি ওকে সার্চ করতে গিয়েছিল।

ঠিক ধরেছেন, সার! চাক্কু নড়ে বসল। হ্যাঁ— এক্কেবারে ঠিক। সকালে পুঁতি চান করতে গিয়েছিল— মনে হয়, কাপড়ে রক্ত-টক্ত ছিল!

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললেন, তুমি দারোগাবাবুকে এসব কথা বলেছ নাকি?

না। চাক্কু মুখ নামিয়ে বলল। বলিনি। তখন বলব-বলব ভাবছিলাম, হঠাৎ মনে হল—

চাক্কু থেমে গেলে কর্নেল বললেন, কী?

ইসমাইল ডাকুর কথা বলছিলেন দারোগাবাবু। তাছাড়া তালডোঙাটা! কাজেই সার, দোনামনায় পড়ে গেলাম। চাক্কু শ্বাস ছাড়ল জোরে। পুঁতি ইসমাইলকে চিনত। ওদের তল্লাটের লোক ইসমাইল। পুঁতি তাকে দেখে দারোগাবাবুকে ডাকবে এই ভয়ে শালা ডাকু হয়তো পুঁতিকে মেরে পালিয়েছে। কিন্তু এখানে বসে ভাবতে-ভাবতে মনে হচ্ছে, ইসমাইল তালডোঙা নিয়ে দরগায় লুকুতে এসেছিল। রাত্তিরটা কোনো গাছতলায় লুকিয়ে থেকে ডোঙাটা খুঁজে বের করে পালিয়ে গেছে। কেন— না, দরগায় দারোগাবাবু হাজির। সার! এইসব কথা

ভাবতে ভাবতে মনে হল, এটা হরিপদরই কাজ। হরিমতী বলুন বা শাওনি বলুন, মেয়েটা তার কণ্ঠিবদলকরা বউ তো বটে। পুঁতি তাকে মেরেছে। তাই হরিপদ পুঁতিকে মেরেছে। আমি এর শোধ না নিয়ে ছাড়ব না, তাতে শূলি-ফাঁসি যা হবার হবে।

কর্নেল একটু হাসলেন। না চাক্কু! তুমি ওকে মারতে গেলে ও চ্যাঁচাবে। তখন দারোগাবাবু ডাক্তারবাবু— সবাই দৌড়ে যাবে।

চ্যাঁচাতে দেব ভাবছেন নাকি? গলা টিপে ধরব পেছন থেকে।

সম্ভবত পারবে না। হরিপদ তোমার চেয়ে তাগড়াই লোক। তার গায়ে জোরও আছে। কর্নেল মিটি মিটি হাসছিলেন।...তাছাড়া হরিপদর কাছে তোমার ছোরাটা আছে। তাই না?

চাক্কু আগুনজ্বলা চোখে তাকিয়ে বলল, আজ্ঞে, সেই ভেবেই তো এতক্ষণ দোনামনা করছি। নৈলে কখন শালাকে গলা কেটে জলে ভাসিয়ে দিতাম!

সে ইটের টুকরোটা ঠুকতে ঠুকতে গুঁড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে থাকল। মুখটা নিচু। কর্নেল প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন, দরবেশ দরগার কাছে নমাজ পড়ে আস্তানার বারান্দায় গেছেন এবং সেই জীর্ণ গালিচাটি পেতে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে চিমটে ঠুকছেন। বিড়বিড় করে জপ করছেন এবং মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছেন, চুল্লু!

কর্নেল পাশের ঘরে কাপড়ঢাকা বডি দুটো উঁকি মেরে দেখে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলেন। আকাশের যে অংশটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে কয়েকটা বৃষ্টিমেঘ খুব ধীরে ভেসে যাচ্ছে। বিকেলে আবার বৃষ্টি নামবে হয়তো। বাতাস বন্ধ। ভ্যাপসা গরম। নিঝুম দরগার বনভূমিতে পাখ-পাখালির ডাক মাঝে মাঝে। বাইনোকুলারে পাখি দেখার ইচ্ছে করছে না আর। চারদিক থেকে আবছা জলের শব্দ। যদি ফের বৃষ্টি নামে, জল ফের বাড়বে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের গতিবিধির ওপর কিছুক্ষণ নজর রাখলেন কর্নেল। তারপর উঠে পড়লেন। বংকুবিহারীর খোঁজে এগিয়ে গেলেন।...

হরিপদর একতারা চুপ। আর পিড়িং পিড়িং করে সুর দিতে বিরক্তি আসছে। একটা ছাতিম গাছের গোড়ায় ইটের মস্তো চাঙড়। তার ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে রেখেছিল সে। জলটা কমছে। সে বিড় বিড় করল, জয় গুরু! জয় গুরু! তারপর একটু চমকে উঠল। পাশে ও পেছনে ছাতিম গাছের ওপাশে ঘন ঝোপ। ধ্বংসস্তূপ জুড়ে জঙ্গল গজিয়ে আছে। যেন পায়ের শব্দ শুনেছিল। বলল, কে গো বাবা?

কেউ সাড়া দিল না। একটু হাসল হরিপদ।...মনের ভুল! আপনমনে বলল সে। তারপর গুনগুনিয়ে উঠল। 'ওরে মোনকানা/তুমি মানুষ চিনেও চিনলে না/লোকে ডেকে চিনিয়ে দিলে তুমি বললে চিনলাম না/ওরে আমার মোনকানা॥'

boiRboi.blogspot.com

সেই সময় সামনের আকাশে ঘর-ঘর গুরু-গুরু শব্দ। গান থামিয়ে দিল হরিপদ। উত্তরপূর্ব কোণ থেকে প্রকাণ্ড কালো ভোমরার মতো কী একটা উড়ে আসছে। শব্দটা বাড়ছে। হরিপদ তাকিয়ে রইল। আস্তানার দিকে চ্যাঁচামেচি শুরু হয়েছে।...

হেলিকপ্টার এবং পঞ্চম হত্যাকাণ্ড

আস্তানাঘরের ছাদ থেকে হেলিকপ্টারটা বাইনোকুলারে এখন দেখেছিল প্রদোষ। তারপর সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, হেলিকপ্টার! হেলিকপ্টার! ক্লারা ঘনশ্যামের সঙ্গে কথা বলছিল। দুজনেই দৌড়ে এসেছিল প্রাঙ্গণে। হেলিকপ্টারটা শব্দ শুনে ব্রজহরি এসে পড়ে বিকট চেঁচিয়ে বললেন, প্রদোষবাবু! প্রদোষবাবু! রুমাল নাড়ুন! রুমাল নাড়ুন! দৌড়ে এলেন কর্নেল, বংকুবিহারী, তারপর চাক্কু। সবাই চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিলেন। প্রদোষ উঁচুতে আছে। সে রুমাল নাড়তে লাগল। হেলিকপ্টারটা উত্তরপূর্ব কোণ থেকে এসে আস্তানাঘরের ওপর পৌঁছুলে প্রদোষ আরও জোরে রুমাল নাড়তে থাকল। ব্রজহরি ছাদে চড়ার চেষ্টা করছিলেন। ভাঙা দেয়ালে উঠে টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খেলেন। বংকুবিহারী উঠে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে কর্নেলও। শেষে ঘনশ্যাম এবং চাক্কু। কেউ হাত নাড়ছেন, কেউ রুমাল। হেলিকপ্টারের লোকেদের নিশ্চয় চোখে পড়েছে। কারণ হেলিকপ্টারটা চক্কর খাচ্ছে দরগার ওপর। অনেকটা নিচুতে নেমেও এল। তারপর একবার চক্কর দিয়ে দক্ষিণে চলে গেল। বংকুবিহারী ক্ষোভে দুঃখে এবং রাগে গর্জন করলেন, শুওরের বাচ্চা! নিচে থেকে ব্রজহরি চেঁচিয়ে উঠলেন, গুলি করে নামান! গুলি করে নামান ব্যাটাচ্ছেলেকে! অমনি বংকুবিহারী পিস্তল বের করে সত্যিই দু-দুটো গুলি ছুড়লেন— তখন হেলিকপ্টার দূরে, কর্নেল বললেন, কী হচ্ছে দারোগাবাবু? হেলিকপ্টারে কোনো মিনিস্টার থাকতে পারেন! শুনেই বংকুবিহারী দারুণ চমকে বললেন, সরি! আমি পাগল হয়ে গেছি— বিলিভ মি! রিভলবার সঙ্গে সঙ্গে কোষবদ্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বললেন, আই ডোন্ট কোয়ার মিনিস্টার অর ফিনিস্টার! কর্নেল বললেন, অবশ্য আপনার গুলি ছোড়া মিনিস্টার দেখতে পাননি— ভাববেন না। বংকুবিহারী ধপাস করে বসে বললেন, বয়ে গেল। আমি চাকরি ছেড়ে দেব। আমি একটা থানার অফিসার-ইন-চার্জ। দুদিন ধরে আমি নিখোঁজ। কারুর মাথায় এল না আমি কোথায় আছি— কী অবস্থায় আছি? জাস্ট্ পাঁচমাইল দূরে থানা। ব্রজহরি দ্বিতীয় চেষ্টায় উঠে এলেন ছাদে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, নিশ্চয় থানার অফিসাররা বোট নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছেন ও তল্লাটে— মানে যে তল্লাটে গিয়েছিলেন। ওঁরা কেমন করে বুঝবেন, আপনি দরগায় আছেন? বংকুবিহারী ভেবে বললেন, হুঁ— তা ঠিক। ঘনশ্যাম বললেন, দেখে গেল— নিশ্চয় বোট পাঠাবে। ওয়েট করুন। তারপর নিচের প্রাঙ্গণে ক্লারাকে দেখতে পেয়ে বললেন,

ম্যাডাম! এখানে চলে আসুন। উঁচুতে থাকলে ওদের নজরে পড়ত। ভেরি ইজি, ম্যাডাম! কাম হেয়ার! জয়েন আস্। ঘনশ্যাম আনন্দে হেসে ফেললেন। কিন্তু বংকুবিহরী আচমকা গর্জে উঠলেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। ডোন্ট ফরগেট ঘনশ্যামবাবু! ঘনশ্যামবাবুর মুখের হাসি মুছে গেল। গলার ভেতর বললেন, ঠিক আছে। হাজতখাটা আমার বহুকালের অভ্যেস! বলে বসে পড়লেন কার্নিসে। ক্লারা উঠে এল খুব সহজেই। সে চাক্কুর পাশে বসে আস্তে বলল, আপনার কাছে আর সিগারেট আছে? চাক্কু বলল, আজ্ঞে না মেমসায়েব! প্রদোষ ভুরু কুঁচকে কথাটা শুনল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা ছুড়ে দিল তার দিকে। ক্লারা কিন্তু হাসল। বলল, ধন্যবাদ। তারপর চাক্কুকে বলল, আপনি দেশলাই জ্বালুন। প্রদোষ রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, উই আর অল ম্যাড— এভরিবডি! ব্রজহরি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন ঘনশ্যামের দিকে। এতক্ষণে বললেন, ও মশাই! আপনার নাম তো হর্ষনাথবাবু! আপনি ঘনশ্যামবাবু হলেন কখন? ঘনশ্যাম গর্বিত হেসে ললেন, আমি বিপ্লবী কৃষক-মজদুর পার্টির নেতা ঘনশ্যাম রুদ্র! আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলাম! আমার নাম আপনার জানা উচিত ছিল। বংকুবিহারী বললেন, শাট আপ! আর একটি কথা নয়। এইসময় কর্নেল বললেন, কিন্তু হরিপদ— সে কোথায়? ব্রজহরি বললেন, আছে কোথাও। সংসারত্যাগী মানুষ। আউল-বাউল লোক। গুরুর নাম জপছে নিরিবিলিতে। বলে ডাকতে থাকলেন, হরিপদ! ও হরিপদ! হরিপদো—ও—ও! কর্নেল ছাদ থেকে ব্যস্তভাবে নেমে গেলেন। বংকুবিহারী মন্তব্য করলেন, পাগল!

তারপর কতক্ষণ কর্নেলের পাত্তা নেই। ক্লারা সিগারেট টেনে নিচে জল লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলল। জলে পৌঁছুল না। নিচে একটা পাথরের ফলকের খাঁজে আটকে গেল। ক্লারা যেন সেটা জলে না ফেলে ছাড়বে না এমভাবে কার্নিশ থেকে ভাঙা দেয়াল বেয়ে নেমে গেল। প্রদোষ ফের বলল, উই আর অল ম্যাড! ঘনশ্যাম ঘুরে মেমসায়েবকে নামতে দেখলেন। ব্রজহরিও দেখলেন, মুখে ভয়ের ছাপ। পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে, সে ভয় নেই— মেমসায়েবরা সত্যিই আজব দেশের আজব প্রাণী!

ক্লারা কিন্তু আস্তানাঘরের প্রাঙ্গণে চলে গেছে। তারপর হন হন করে হেঁটে চলেছে। সে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রদোষ কার্নিশের ধারে চাক্কুর পাশে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা আনতে গেল। ব্রজহরি বললেন, আমাদের নজর রাখা দরকার। বোট আসবে। হেলিকপ্টারে মিনিস্টার যখন দেখে গেছেন, তখন বোট আসতে বাধ্য। প্রদোষ একটা সিগারেট ধরালে চাক্কু সবিনয়ে বলল, সার! একটা দিন না আমাকে। প্রদোষ তার দিকে তাকাল। তারপর একটা সিগারেট ছুড়ে দিল। চাক্কু দুহাতে সেটা লুফে নিল। বংকুবিহারী বললেন, আমি স্মোক করি না। তবে ইচ্ছে করছে। দিন তো মশাই একটা— টেনে দেখি!

boiRboi.blogspot.com

বংকুবিহারী সবে সিগারেট ধরিয়েছেন, ক্লারার চিৎকার ভেসে এল, আবার হত্যা! আবার একটি হত্যা! আপনারা আসুন! সকলে আসুন!

উত্তরপূর্ব কোণে ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে ক্লারাকে দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড হাত নেড়ে চিৎকার করছে, হত্যা! ভীষণ হত্যা!

বংকুবিহারী উঠে দাঁড়ালেন। ঘনশ্যামের কথা ভুলে ধুড়মুড় করে ভাঙা দেয়াল দিয়ে নামলেন, দৌড়ুলেন। রিভলবার বের করেই ছুটে চললেন। ব্রজহরি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, সর্বনাশ! সর্বনাশ! সর্বনাশ! আবার কে গেল? প্রদোষ নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকল। চাক্কু শ্বাস ছেড়ে বলল, হরিপদ গেল!

ব্রজহরি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তারপর হাতপায়ে ভর করে হাঁচড়-পাঁচড় করে নামতে শুরু করলেন। ঘনশ্যামও নেমে গেলেন। তারপর গেল চাক্কু। প্রদোষ একা দাঁড়িয়ে রইল ছাদে।...

উত্তরপূর্ব কোণে বন্যার জলের ধারে হরিপদ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চাপ চাপ রক্ত গলা থেকে বেরিয়ে জলকে লাল করছে। তার পা দুটো ওপরদিকে, মাথাটা জলে। একতারাটা ছিটকে পড়ে আছে। ব্রজহরি, ঘনশ্যাম, চাক্কু ও ক্লারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের দৃষ্টি বন্যার অবাধ জলের দিকে। বংকুবিহারী ও কর্নেলের দৃষ্টি হরিপদর দিকে। কর্নেল আস্তে বললেন, আমি আসার আগেই হরিপদ মারা পড়েছে। বংকুবিহারী এবার ভয় পাওয়া গলায় বললেন, চুল্লু! চুল্লু আছে!

কর্নেল হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, বডিটা তুলে আস্তানাঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার। শকুনগুলো ওত পেতে আছে। আসুন ঘনশ্যামবাবু! ডাক্তারবাবু! চাক্কু! দেরি করা ঠিক নয়। শিগগির!...

ভিজে আগন্তুক এবং তালডোঙা রহস্য

আবার আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে এবং তারপর প্রচণ্ড বৃষ্টি। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন। বজ্রপাত। আস্তানাঘরের বারান্দায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে লোকগুলি। পাশের ঘরে তিনটি কাপড়ঢাকা লাশ এবং তাদের গলা ফাঁক। এবার ঘনিয়ে এসেছে সত্যিকার সন্ত্রাস। ব্রজহরির মতে একজন বেশ্যার মৃত্যু, যত বীভৎস হোক, ততকিছু আতঙ্ক ছড়াতে পারেনি। তার আগে একটি কুকুরের মৃত্যু তো গ্রাহ্য করার মতো ঘটনাই হয়ে ওঠেনি। আর একজন ঘর-পালানো, গ্রাম্য নিম্নবর্গীয় সমাজের মেয়ের মৃত্যু, বারবধূটির মৃত্যুই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু বাউল হরিপদর মৃত্যু জোর ধাক্কা দিয়েছে সবাইকে। ব্রজহরি কাঁপা-কাঁপা গলায় শেষে বললেন, এবার কে? কার পালা?

বংকুবিহারীর হাতে এখনও রিভলবার। একটু নড়ে বসে বললেন, আপনি চুপ করুন। আমাকে ভাবতে দিন!

ঘনশ্যাম ম্রিয়মান কণ্ঠস্বরে বললেন, আমি নাস্তিক। ভূত-ভগবান মানি না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কী একটা আছে— একটা ব্লাইন্ড ফোর্স! নেচারের কতটুকুই বা সায়েন্স ভেবেছে? নেচারের মধ্যে ডায়ালেকটিক্স— মানে দ্বন্দ্ব আছে। বিরোধী শক্তি আছে।

বংকুবিহারী ফের বললেন, আঃ! চুপ করুন তো মশাই!

ক্লারা বলল, চুপচাপ থাকলে আমরা আরও ভয় পাব। দারোগামহাশয়, আমাদের কথাবার্তায় অনুগ্রহপূর্বক আপত্তি করবেন না।

প্রদোষও আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। বলল, আমার একটা স্টোরি মনে পড়ছে— অ্যারাবিয়ান নাইটসের।

ব্রজহরি বললেন, বলুন, বলুন!

প্রদোষ বলল, সিন্দবাদ এপিসোড। সেই যে এক রাক্ষসের হাতে সিন্দবাদ আর তার সঙ্গীরা বন্দী হল, রাক্ষস রোজ সেলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একজনকে বের করে নেয়, খেয়ে ফেলে, তারপর এইভাবে প্রতিদিন একজন করে বন্দী—

ঘনশ্যাম দ্রুত বললেন, একজ্যাক্টলি! ঠিক তাই হচ্ছে। ব্লাইন্ড ন্যাচারাল ফোর্সের হাতে আমরা বন্দী।

ব্রজহরি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেন, এবং একজন করে তার হাতে ধরা পড়ছি আমরা! ওঃ,ভয়াবহ! এবার কার পালা কে জানে!

বংকুবিহারী গলার ভেতর বললেন, আরে মশাই, সেটাই তো ভাবছিলাম! চুল্লু তার সিম্বল। চুল্লু আছে। চুল্লু ছাড়া এসবের কোনো অর্থ হয় না। তিরিশ বছর আমার পুলিশ লাইফ! অনেক মিসস্ট্রিয়াস ব্যাপার দেখেছি। এমন কখনও দেখিনি।

দরবেশে একইভাবে তাঁর ঘরের দরজার সামনে জীর্ণ গালিচায় বসে দুলতে দুলতে জপ করছিলেন এবং বুকে চিমটে ঠুকছিলেন। ঝুম ঝুম চাপা শব্দ তালে-তালে। বলে উঠলেন, চুল্লু! সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। আস্তানা কেঁপে উঠল।

চাক্কু ফিসফিসিয়ে ব্রজহরিকে বলল, দরবেশবাবাকে ধরুন সবাই মিলে। বাঁচলে উনিই বাঁচাতে পারেন।

ব্রজহরি আর্তকণ্ঠস্বরে বললেন, দরবেশবাবা! দরবেশবাবা!

অন্ধ দরবেশ দুলতে দুলতে বুকে চিমটে ঠুকতে ঠুকতে ফের বললেন, চুল্লু! প্রাঙ্গণে, চারদিকের ঘন জঙ্গলে, চাপ চাপ ধ্বংসস্তূপে বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গর্জন— ধারাবাহিক। মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা বাতাসে গাছপালা নড়ে উঠছে। ছাট আসছে বারান্দায়। কর্নেল বর্ষাতিটি ফের গায়ে চড়িয়েছেন এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে শেষপ্রান্তে বসে আছেন। দাঁতে কামড়ানো জ্বলন্ত পাইপ।

banglaboi.blogspot.com

বারান্দার ভেতর আবছায়ায় সন্ত্রস্ত লোকগুলির দিকে মুখ ফেরালেন। আস্তে বললেন, বন্যাটা আবার বেড়ে যাবে হয়তো।

এই কথায় আবার আতঙ্ক ছড়াল। ব্রজহরি প্রাঙ্গণের দিকে ঘুরে চমকানো গলায় বললেন, ওই তো বেড়েছে! কবরগুলো ডুবেছে!

কর্নেল বললেন, না। ওগুলো বৃষ্টির জল।

প্রদোষ ক্ষোভে বলল, হেলিকপ্টারটা আমাদের দেখে গেল। অথচ এখনও বোট পাঠাল না। দু ঘণ্টা— টু আওয়ার্স পাস্‌ড্ অ্যাওয়ে! দিস ইজ ইন্ডিয়া!

দিস ইজ ইন্ডিয়া! সায় দিলেন ঘনস্যাম। ধনতন্ত্রের পোশাকপরা সামন্ততন্ত্রের এটাই নিয়ম।

ব্রজহরিও সায় দিলেন। রেডটেপিজম! মিনিস্টার নবাবগঞ্জের হেলিপ্যাডে নেমে এখন সার্কিটহাউসে বসে গরম-গরম কফি খাচ্ছেন। অফিসারদের হয়তো বলেছেন, জলবন্দী একজন লোকের কথা। এখন ফাইল চালাচালি হচ্ছে। রিলিফ অফিসারের কাছে সেই ফাইল পৌঁছুতে বছর ঘুরে যাবে এবং অবশেষে যখন বোট আসবে, দেখবে আটখানা গলাকাটা ডেডবডি ছিঁড়ে খাচ্ছে একদঙ্গল শকুন!

ব্রজহরির মুখে বীভৎসতা ফুটে উঠেছিল। ঘনশ্যাম চাপা গর্জন করলেন, রেভোলিউশন! বিপ্লব! বিপ্লব না হলে—

বংকুবিহারী পাল্টা গর্জন করলেন, শাট আপ! ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট!

এই সময় চাক্কু হঠাৎ চমকানো গলায় বলল, পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল!

সবাই নড়ে উঠলেন। পাশে ঘরের দরজার ভেতর দৃষ্টি চলে গেল। তিনটি কাপড়ঢাকা লাশের ওপর জল পড়ছে। ছাদ চুঁইয়ে টুপ টাপ...টুপ টাপ। কাপড়ে রক্তের ছোপ ফুটে উঠেছে। ক্লারা বলল, আমি দেখতে চাই। সে উঠতে গেলে প্রদোষ তাকে টেনে বসিয়ে দিল। বংকুবিহারী বললেন, কে ওঘরে? সাড়া না দিলে গুলি ছুড়ব!

কোনো সাড়া এল না। চাক্কু দম আটকানো স্বরে বলল, পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওই তো দাঁড়িয়ে আছে!

চাক্কু পাশের ঘরের দরজার পাশে বসে ছিল। সে কথাটা বলেই সরে গেল ব্রজহরির কাছে। ব্রজহরি সরে গেলেন ঘনশ্যামের কাছে। দরবেশ বলে উঠলেন, চুল্লু! চুল্লু! চুল্লু! আবার বাজ পড়ল কোথায়।

বংকুবিহারী উল্টোদিকের দেয়ালে কর্নেলের পাশে বসে ছিলেন। রিভলবার তুলে বললেন, কে আছ। সাড়া না দিলে সত্যি গুলি ছুড়ব!

ক্লারা ক্ষোভে ফুঁসে উঠল।...আমাদের মতো কেউ কি এই উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না? কেন তাকে গুলিবিদ্ধ করবেন আপনি? আপনি আইনরক্ষক অথবা ঘাতক?

বংকুবিহারী খাপ্পা হয়ে বললেন, দিস ইজ ইন্ডিয়া, নট ইউ এস এ, ম্যাডাম! ডোন্ট ইন্টারভেন।

ক্লারা বলল, আপনি মাতৃভাষায় কথা বলুন। অথবা জার্মান ভাষায় বলুন। আমি জার্মান।

ঘনশ্যাম লাফিয়ে উঠলেন।...তাহলে বুঝুন কে এই মেমসায়েব! কাল বিকেলেই আমি ডাক্তারবাবুকে বলছিলাম— বলছিলাম না ডাক্তারবাবু?

ব্রজহরি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, তক্কাতক্কি নয়, তক্কাতক্কি নয়। বড় দুঃসময়। সবাই কাছাকাছি বসে থাকুন। যে যার ইষ্টনাম জপ করুন। চাক্কু যাকে দেখেছে, সেই চুল্লু! অশরীরী আত্মা। এই দরগার গার্ড। বুঝলেন না আপনারা?

কর্নেল উঠে গেলেন পাশের ঘরের দরজায়। ব্রজহরি হাত বাড়িয়ে তাঁর বর্ষাতি খামচে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু কর্নেল ও-ঘরে ঢুকে পড়েছেন ততক্ষণে।

তারপর কেউ ফুঁপিয়ে উঠল ও-ঘরে।...সার! সার! আমাকে মারবেন না! আমি ঝাঁপুইহাটির লোক। আমার নাম হরমুজ আলি, সার। বড় ঠেকায় পড়ে ঘরে ঢুকেছি!

কর্নেল শান্তভাবে বললেন, বারান্দায় এস। এঘরটা ধসে পড়তে পারে।

কর্নেলের পিছু-পিছু নীল গেঞ্জি আর চেককাটা লুঙ্গিপরা এক যুবক কুঁকড়ে ঢুকল। ভিজে একাকার। ভয়ে কিংবা বৃষ্টিজনিত ঠাণ্ডায় কাঁপছে। বংকুবিহারী গোল চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন। বললেন, তোমাকে চেনা-চেনা ঠেকছে যেন! কোনপথে ওঘরে ঢুকলে? ছাদ ফুঁড়ে, নাকি সিঁদ কেটে? ও-ঘরে তো আর দরজা-জানালা নেই!

জবাব দিলেন কর্নেল। ওপরের বড় ঘুলঘুলিটা লক্ষ্য করেননি কেউ। ওখান দিয়ে দেয়াল ধরে নামা যায়।

ঘুলঘুলি দিয়ে? বংকুবিহারী অবাক হয়ে বললেন। বুঝেছি! আভ্যেস আছে তাহলে। অ্যাই ছোকরা, কী নাম বলছিলে যেন?

সার, আমার নাম হরমুজ আলি। বড়ি ঝাঁপুইহাটি।

ক্লারা বলে উঠল, ওর পোশাক বদলানো দরকার। আমি দিচ্ছি।

প্রদোষ বাধা দিল।...ডোন্ট ডু দ্যাট, বেবি! ইউ আর আ ম্যাড গার্ল!

ক্লারা গ্রাহ্য করল না। নিজের কিটব্যাগ খুলে একটা তোয়ালে ছুড়ে দিল হরমুজ আলির দিকে। তারপর বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। আমার শেষ শাড়িটি দিচ্ছি। আপনি লুঙ্গির মতো পরুন।

কর্নেল ওঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। একটু পরে বললেন, যাও, পরে এস।

হরমুজ লাশ তিনটিকে এড়িয়ে কোণে চলে গেল। একটু পরে ক্লারার জংলিছাপ সূতী শাড়িটি লুঙ্গির মতো পরে তোয়ালে জড়িয়ে বারান্দায় এল।

banglidown.blogspot.com

নিজের ভিজে লুঙ্গি এবং গেঞ্জিটি বারান্দার ধারে গিয়ে নিংড়ে জল বের করল। তারপর শুকনো জায়গায় রেখে ধুপ করে বসে পড়ল কর্নেলের পায়ের কাছে। বংকুবিহারী বললেন, তোমাকে বড্ড চেনা-চেনা ঠেকছে কেন হে?

হরমুজ ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে বলল, সার! আমি পাটের দালালি করি। আগাম দাদন দিয়েছি অনেক গাঁয়ে। ফেলাডে পাটের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলাম। কাজেই দেখে থাকবেন বৈকি আমাকে! কত জায়গায় ঘুরি।

কর্নেল তার পাশে বসলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, তালডোঙাটা কি তোমার?

হঠাৎ একথায় হরমুজ হকচকিয়ে গেল। বলল, সার, আমি—

তালডোঙাটা তোমারই। কর্নেল আস্তে কিন্তু শক্ত মুখে বললেন। কাল বিকেলে তুমি এখানে এসেছ। তাই না?

হরমুজ আগের মতো ফুঁপিয়ে উঠল।...সার, আমি— বলেই সে থেমে গেল। কাঁদতে শুরু করল।

কর্নেল বললেন, কান্নাকাটির কারণ নেই। তুমি কাল তালডোঙা চেপে দরগায় এসেছিলে!

হরমুজ কান্না থামিয়ে বলল, আজ্ঞে সার! সব পাট ডুবে গেছে। বছরকার দাদনের টাকা আটকে গেল। তাই খোঁড়াপিরের দরগায় মানত দিতে এসেছিলাম।

এসে শাওনির পাল্লায় পড়েছিলে! তুমি ওকে চিনতে।

আজ্ঞে সার!

শাওনি তোমকে কী বলেছিল!

চাক্কু লাফিয়ে উঠল হঠাৎ।...দারোগাবাবু! দারোগাবাবু! মিথ্যে বলছে। ওকে চিনতে পেরেছি। ওর নাম কালু! ইসমাইলের সাগরেদ! ওকে সবাই বলে 'গলাকাটা কালু!'

বংকুবিহারী রিভলবার তাক করে বললেন, নড়ো না। নড়লেই মুণ্ড ছ্যাঁদা করে দেব। হুঁ— তাই চেনা-চেনা ঠেকছিল। কালুই বটে!

কর্নেল বললেন, তুমি তাহলে হরমুজ নও, কালু?

কালু কর্নেলের পা চেপে ধরল।...আমাকে বাঁচান সার! কাল থেকে ডোঙা হারিয়ে গাছে লুকিয়ে ছিলাম। শেষে নিজেই ধরা দিতে এলাম দারোগাবাবুর কাছে। বংকুবিহারী ভেংচি কেটে বললেন, ধরা দিতে এলাম? গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে শুওরের বাচ্চা তিন-তিনটে লোকের গলা কেটেছ। তারপর এসেছ ধরা দিতে! নড়ো না। চুপ করে বসে থাকো।

কালু হাঁউমাউ করে বলল, না সার! আমি কাউকে খুন করিনি। পিরের নামে কিরে করে বলছি, আমি খুন করিনি।

কর্নেল বললেন, একটু চুপ করুন দারোগাবাবু! কালু, কান্না থামাও। আমার কথার জবাব দাও। শাওনি তোমাকে কী বলেছিল?

কালু চোখ মুছে বলল, শাওনি বলল এখানে দারোগাবাবু আছে। তারপর বলল, পালিয়ে যাও। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তাই শুনে আমি বললাম, ঠিক আছে। আয়! এমন সময় হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন। আপনার পরনে ওই ডেরেস। ভাবলাম দারোগাবাবু আসছেন। অমনি শাওনিকে বললাম, আঁধার হোক। আমি ছাতিম গাছে লুকিয়ে থাকছি। তাপরে সার, আঁধার হল। কিন্তু নেমে গিয়ে তালডোঙাটা খুঁজেই পেলাম না। সারারাত্তির বিষ্টির মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছি। পাইনি।

রাত্রে শাওনির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি আর?

আজ্ঞে না। কালু দুহাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বলল। ভোরবেলা ঠিক করলাম সাঁতার কেটে পালাব। কিন্তু অথৈ দরিয়া, সার! ভরসা হল না। তারপর আপনাদের আনাগোনা দেখে ফের একটা ঝাঁকড়া গাছে চড়ে লুকিয়ে ছিলাম।

কুকুরটাকে খুন করল কে?

পিরের কিরে সার, আমি দেখিনি।

শাওনিকে?

সার এ কালু খামোকা একটা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না!

শাওনি তোমার কথা দারোগাবাবুকে বলে দিতে পারে— এই ভয়ে তুমি ওকে খুন করেছ!

কালু ফের হাঁউমাউ করে উঠল, আমি ওকে খুন করিনি। খোদার কসম, পিরের কসম! শাওনি আমার কথা বলতে যাবে ক্যানে সার? সেও তো দরগা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। বলুন তাই কিনা?

কেন?

কালু চোখ মুছে বলল, চুল্লুর ভয়ে। চুল্লুর কথা কে না জানে তল্লাটে?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, এখন তুমি ধরা দিতে এলে কেন?

বৃষ্টি। কালু কাতর স্বরে বলল। বৃষ্টি আর সহ্য হল না। তার ওপর কাছেই বাজ পড়ল। এদিকে গায়ে ব্যথা। জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে। তার ওপর না-খাওয়া না-দাওয়া! কতক্ষণ পারে মানুষ, আপনি বলুন সার?

তুমি শাওনি, পুঁতি আর হরিপদর খুনি হওয়া টের পেয়েছিলে!

আজ্ঞে। গাছ থেকে দেখেছি আপনারা লাশ নিয়ে আসছেন।

তাহলে ওদের কে খুন করল তাও নিশ্চয় দেখেছ?

বংকুবিহারী গর্জন করলেন, দেখার কী আছে মশাই! আপনি যেন কোন মহাপুরুষের মতো বুলি আওড়াচ্ছেন। ওর নাম গলাকাটা কালু শুনেও কিছু বুঝতে পারছেন না?

banglainternet.com

কালু কান্নাজড়ানো গলায় বলল, খুন করা আমি দেখিনি। আপনারা একটা করে লাশ বয়ে এনে ও-ঘরে ঢোকাচ্ছেন, ওই টুকুন খালি দেখেছি।

বংকুবিহারীর ধৈর্য চলে গেল। উঠে এলেন রিভলবার উঁচিয়ে। ডাকলেন, চাক্কু, উঠে আয়! আসামিকে পিঠমোড়া করে বাঁধ। হুঁ— ওর লুঙ্গি ছিঁড়ে ফেল। ছেঁড় বলছি হতভাগা!

চাক্কু ভিজে লুঙ্গির সেলাই-বরাবর ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল। লুঙ্গিটা লম্বা করে পাক দিয়ে মোটা রশিতে পরিণত করল। প্রচণ্ড উদ্যমে কালুকে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর ভিজে গেঞ্জিটা দিয়ে দুটো পাও বেঁধে ফেলল। কালু বাধা দিল না। বংকুবিহারী ক্লারার তোয়ালেটা তুলে ছুড়ে দিলেন।...নিন ম্যাডাম। কেচে নেবেন কিন্তু।

ব্রজহরি কাঠ হয়ে দেখছিলেন ব্যাপারটা। ঘনশ্যাম, প্রদোষ এবং ক্লারাও। তারপর শুধু ক্লারা আস্তে বলল, পাশবিক এবং অমানবিক। আমি বিশ্বাস করি না ওই যুবকটি হত্যাকারী।

কর্নেল বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা অনুরোধ। দেখুন তো কালুর সত্যি জ্বর কি না?

ব্রজহরি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, গলাকাটা কালুর নাম আমি শুনেছি। ওকে ছুঁতে ঘেন্না হয়। তবু বলছেন যখন, দেখছি। এথিকস্। ফিজিসিয়ানদের এথিকস্! বলে ব্রজহরি উঠে এসে কালুর গলার কাছে হাত রেখে বিকৃত মুখে বললেন, হুঁ, জ্বর। তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ঘনশ্যাম ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। বৃষ্টিটা এবার কমে এসেছে। শুধু মেঘের ডাক থামছে না।...

ঘনশ্যামের অন্তর্ধান

নেচার আবার আজ খুব হঠাৎ ফুঁসে উঠছিল। কেন জানেন? প্রাঙ্গণে কবরগুলির আনাচে-কানাচে জমে-ওঠা বৃষ্টির জল এড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরের স্ল্যাবে দাঁড়ালেন ব্রজহরি এবং ঘনশ্যামের উদ্দেশে কথাটা বললেন।

ঘনশ্যাম নেমে গিয়ে একটা পাথরের কবরে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, মৃতরা জড় পদার্থমাত্র। তিনি এসব মানেন না। বললেন, কেন?

ব্রজহরি একটু হাসলেন।— খুনীকে ধরিয়ে দেবার জন্য। কী হারে বাজ পড়ছিল, বলুন! বাজের ভয়ে গলাকাটা কালু গাছ থেকে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে কি না? সারেন্ডার করতে হয়েছে কি না তাকে? তারপর দেখুন এখন আবার স্বাভাবিক, মেঘ সরেছে। রোদ্দুর ফুটছে। নেচার ইজ স্মাইলিং!

আস্তানাঘরের পেছনে গাছপালার ফাঁকে বিকেলের ঝলমলে রোদ্দুর পিচকিরির ধারায় উপচে আসছে। তাই দেখিয়ে ব্রজহরি ফের বললেন, নেচার ইজ বিশ্বমাতৃকা। মানুষ কিছু বুঝেও বোঝে না। দুরন্ত অবাধ্য শিশু। তাই মা তাকে কিল থাপ্পাড়টা মেরে থাকেন। এবার দেখুন, সব শান্ত হয়ে গেছে।

ঘনশ্যাম বাঁকা মুখে বললেন, কিন্তু রিলিফের নৌকো কোথায়? কটা বাজছে দেখুন তো ডাক্তারবাবু?

ঘড়ি দেখে ব্রজহরি বলেন, চারটে পাঁচ। তিন ঘণ্টা আগে— উঁহু, সম্ভবত ঘণ্টা চারেক আগে হেলিকপ্টারটা আমাদের দেখে গেছে। অথচ এখনও বোট পাঠাচ্ছে না কেন? সাচরাচর এসব বড় ফ্লাডে আর্মি নামানো হয়। এবার হলটা কী?

ঘনশ্যাম বললেন, আমার ধারণা, ততবেশি নৌকো পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ মহকুমার অসংখ্য গ্রাম ডুবে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং গবাদি পশুর কথা ভাবুন! তাদের চেয়ে আমাদের উদ্ধার ওরা জরুরি মনে করছে না— দিস মাচ আই ক্যান এক্সপ্লেন!

ইউ আর রাইট। ব্রজহরি সমর্থন করলেন। ওরা খবর ঠিকই পেয়েছে মিনিস্টারের মুখে। কিন্তু আগে যারা ভেসে যাচ্ছে, তাদের কথাই ভেবেছে। ইউ আর রাইট! বাট উই আর হাংগ্রি!...

বারান্দায় বসে ক্লারা কান করে শুনছিল। চাপাস্বরে প্রদোষকে বলল, আমার ধারণা, প্রদোষ ওই দু'জন ভদ্রলোক পরস্পরের মধ্যে ইংলিশ বেশি পরিমাণে বলতে শুরু করেছেন। এটা খুব আশ্চর্যজনক।

কর্নেল শুনতে পেয়ে জার্মান ভাষায় বললেন, স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে, ক্লারা! স্বাভাবিক অবস্থায় এদেশের শিক্ষিতেরা পরস্পর ইংরেজিতে বাক্যালাপে অভ্যস্ত।

প্রদোষ জার্মান জানে না। শিখতে চেষ্টা করেছিল মাত্র। ক্লারা তাকে বুঝিয়ে দিল। তখন প্রদোষ বাংলায় বলল, কর্নেলসায়েব! আমার স্ত্রীকে আপনি উল্টো বোঝাচ্ছেন। বরং এদেশের শিক্ষিত লোক উত্তেজনা বা রাগ হলে ইংরেজি বলে। তার মানে যখন স্বাভাবিকতা থাকে না, তখন।

কর্নেল হাসলেন।...আমি ভেবেছিলাম প্রদোষবাবু বাংলা ভুলে গেছেন।

প্রদোষ এ মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হল। স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল, ইংরেজি বলাটা আমার ক্ষেত্রে অভ্যাসের ব্যাপার। দুবছর আমি স্টেটসে ছিলাম।

হতে পারে! বংকুবিহারী মন্তব্য করলেন। তবে কর্নেল যা বলেছেন, ঠিক। আমরা উন্মাদ অবস্থায় ছিলাম। খুনী ধরা পড়ার পর আমরা স্বাভাবিক হতে পেরেছি। বোট এসে গেলে আমরা পুরো স্বাভাবিক হয়ে উঠব। দা সিচুয়েশন ইজ গ্লাজুয়্যালি বিকামিং নর্ম্যাল। দা কিলার ইজ অ্যাট আওয়ার হ্যান্ড অ্যান্ড ইউ আর নাও সেইফ। নো চান্স অফ অ্যানাদার মার্ডার! নো ফিয়ার! আইন রক্ষক সগৌরবে রিভলবার দোলাতে দোলাতে অনর্গল যথেষ্ট ইংরেজি বাক্য উচ্চারণ করতে থাকলেন। তাঁর এবং চাকুর মাঝখানে বন্দী গলাকাটা কালু কুঁকড়ে বসে আছে। তবে ঠকঠক করে কাঁপছে। দরবেশ এখন ঘরে । ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।...

boiRboi.blogspot.com

কর্নেল উঠে বর্ষাতিটা খুলে কালুর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। বংকুবিহারী চোখ কটমটিয়ে তাকালেন। কিন্তু বাধা দিলেন না। কর্নেল প্রাঙ্গণে নেমে গেলেন। তাঁকে আস্তানাঘরের পেছন দিকে যেতে দেখা গেল।

ব্রজহরি তাঁর উদ্দেশে বললেন, নৌকো দেখলে খবর দেবেন কর্নেলসায়েব!

ঘনশ্যাম কান পেতে কী শুনছিলেন। বললেন, কী একটা গুরুগুরু শব্দ শুনছি যেন?

উত্তেজনায় ব্রজহরি চঞ্চল হয়ে বললেন, কই? কই? আমি তো শুনতে পাচ্ছি না! মাই ইয়ার্স আর শার্প।

হুঁ, গুরগুর শব্দ। বলে ঘনশ্যাম পূর্বদিকে— যেদিকে ভাঙা দেউড়ি, পা বাড়ালেন। ব্রজহরি বললেন, যান, যান! দেখে আসুন! গো অ্যান্ড সি!

বংকুবিহারী আপন খেয়ালে ইংরেজিতে কথা বলছেন, লক্ষ্য একান্তভাবে মেমসায়েব ক্লারা। খুনী এবং চোর-ডাকাত ধরার যতরকম মারাত্মক অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছেন। ঘনশ্যামের চলে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি নেই। ব্রজহরি ডেকে তাঁকে বললেন, দারোগাবাবু! কোনও গুরগুর ভয়েজ শুনতে পাচ্ছেন কি? ওই শুনুন! ব্রজহরি লাফিয়ে উঠলেন। ইয়েস! দে আর কামিং! হিয়ার, হিয়ার!

ক্লারা ও প্রদোষ উঠে প্রাঙ্গণে এল। ক্লারা কান করে বলল, হ্যাঁ— তারা আসছেন! আসছেন!

বংকুবিহারীও শুনতে পেলেন। কিন্তু উত্তেজিত হলেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললেন, ডাক্তারবাবু! আপনারা যান! গো অ্যান্ড টেল দেম আই অ্যাম হিয়ার— উইথ থ্রি ডেডবডিজ অ্যান্ড দেয়ার কিলার। গো গো টেল দেম!

ব্রজহরি বললেন, ঘনশ্যামবাবু হ্যাজ অলরেডি গন! আই অ্যাম টায়ার্ড অ্যান্ড হাংগ্রি।

হোয়াট? বংকুবিহারী নড়ে উঠলেন। পরমুহূর্তে ফ্যাচ করে হাসলেন। ...যাক না। একা তো ওকে নিয়ে যাবে না। এতগুলো লোক দেখেছেন মিনিস্টার আকাশ থেকে হি হ্যাজ সিন আস। অ্যান্ড অলসো কিল আ ম্যান ইন দা পোলিস ইউনিফর্ম! ডাক্তারবাবু, অলসো টেল দেম অ্যাবাউট এ পলিটিক্যাল প্রিজনার।

ক্লারা প্রদোষকে টানতে টানতে নিয়ে গেল দক্ষিণে। শব্দটা সেদিক থেকেই শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা বাড়ছিল। ব্রজহরি দাঁড়িয়েই রইলেন। তখন বংকুবিহারী ছেড়ে গলায় চেঁচালেন, ম্যাডাম ক্লারা! টেল দেম, উই হ্যাভ টু ডেঞ্জারাস প্রিজনার্স হেয়ার, অ্যান্ড থ্রি ডেডবডিজ— থ্রি! থ্রি-ই-ই-ই!

ব্রজহরি বারান্দায় গিয়ে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ এবং বর্ষাতিটা উরুর ওপর রেখে বসে রইলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার পর প্রচণ্ড ক্লান্তি তাঁকে পেয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে উঃ ওঃ শব্দ করতে থাকলেন।...

প্রদোষ বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চমকানো স্বরে বলল, হরিবল্! ভালচার্স!

ক্লারা তার কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিল! চোখে রেখে বলল, একটা সামরিক মোটরচালিত ক্ষুদ্র নৌকা একটি বৃহৎ নৌকাকে টেনে আনছে। সামরিক এবং অসামরিক কয়েকজন লোক আছেন।

প্রদোষ তার হাত থেকে বাইনোকুলার নিল। চোখে রেখে দেখতে দেখতে বলল, হোয়াট ডু য়ু থিংক বেবি? আই অ্যাম ড্যাম সিওর দ্যাট মাই আঙ্কল্ হ্যাজ সেন্ট দেম! ইউ নো, মাই ড্যাডি হ্যাড অলরেডি গিভ্ন্ হিম আ ট্রাঙ্ককল মেসেজ দ্যাট উই হ্যাড স্টার্টেড ফ্রম ক্যালকাটা। দা ট্রাংক-কল ডিড দা ম্যাজিক, ইউ নো!

তুমি একটা— ক্লারা হেসে উঠল। সে ফাঁকা জায়গায় একটা উঁচু চাঙড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকল। সে যেন নাচতে সুরু করেছে।

প্রদোষ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল। বলল, তুমি একটা—

মিলিটারি স্পিডবোটের শব্দ ঢিবির পূর্বদিকে এসে থেমে গেল। বংকুবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু রিভলবারটি হাতে। কারণ এ একটা চরম মুহূর্ত। বললেন, চাক্কু! ওকে ধরে থাক। আমি রিসিভ করব ওঁদের।

চাক্কু বলল, যাবে কোথায় শালা? ঘেঁটি ধরে আছি। আপনি যেখানে যাবেন, যান না সার!

বংকুবিহারী প্রাঙ্গণে নেমে বললেন, যাব কোথায়? এখানেই ওয়েট করব। বলে রিভলবারটা সরকারি শালীনতাবশে কোষবদ্ধ করে অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাক্কু চাপা গলায় গল্লাকাটা কালুকে বলল, এই শালা! আমার ড্যাগারখানা কোথায়?

কালু হিঁপিয়ে উঠল।...বিশ্বেস কর— খোদার কসম, পিরবাবারর কসম। আমি খুন করিনি!

চাক্কু ওর পাঁজরে গুঁতো মারল।...বল্ শালা, কোথায় আমার ড্যাগার?

কালু আবার ককিয়ে বলল, বিশ্বেস কর—

ব্রজহরি বিরক্ত হয়ে বললেন, আই চাক্কু! হচ্ছেটা কী? পুলিশের কাজ পুলিশ করবে।

এই শালা পুঁতিকে কেটেছে! চাক্কু ফুঁসে উঠল। এমন অবস্থা না হলে একে আমি এতক্ষণ গলা কেটে পুঁতে ফেলতাম। আমার নাম চাক্কু! আম্মো কম যাই নে। বল্ কালু, আমার ড্যাগার কোথায়? এখনও বল্ বলছি!...

কর্নেল স্পিডবোট এবং নৌকোটি বাইনোকুলারে দেখছিলেন। বাঁদিকে গাছপালার আড়ালে তা অদৃশ্য হলে ঘুরে পা বাড়ালেন। আস্তানাঘরের পেছনে

bengalidownload.com

অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ, ঝোপঝাড় এবং উঁচু গাছপালা। একসময়ে পেছন দিকটাতেও কয়েকখানা ঘর ছিল বোঝা যায়। এদিকটা ঢিবির পশ্চিম অংশ। ঝলমলে বিকেলের সূর্য প্রচুর রোদ্দুর ছড়াচ্ছে। বন্যার জল বাড়বে ভেবেছিলেন, বাড়েনি। বরং এতক্ষণ বৃষ্টিসত্ত্বেও অন্তত একমিটার নেমে গেছে।

পা বাড়াতে গিয়ে পূর্বমুখী হয়েছেন, ডানদিকের গাছে ঝটপট শব্দে কী একটা বসল। দেখলেন, একটা শকুন। ঘুরে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। আবার একটা শকুন এসে বসল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে গাছটা শকুনে ভরে গেল। তারপর গাছটার নিচের দিকে তাকাতেই চোখে ছটা লাগল কিসের। চোখ ধাঁধানো ছটা। কাচের টুকরো কি? রোদ্দুরে কী একটা ঝকঝক করছে ইটের চাঙড়ের নিচে। চাঙড়টার আধখানা জলে ডুবে গিয়েছিল। এখন জল নেমে গেছে। জিনিসটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ছ-সাত ইঞ্চি লম্বা ফলা— একটা ছুরি। স্প্রিংয়ের ছুরি!

দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে স্প্রিংয়ে চাপ দিলেন। ফলাটা বাঁটে ঢুকে গেল। রক্তের চিহ্ন থাকা সম্ভব নয়। বন্যার জলে ধুয়ে গেছে। 'গলাকাটা কালু' ছুরিটা এখানেই ছুড়ে ফেলেছিল তাহলে? ছুড়ে ফেলেছিল, কারণ তার আর কাউকে হত্যার প্রয়োজন ছিল না। কুকুরটা তাকে বিরক্ত করছিল। তাই কুকুরটাকে সে জবাই করেছিল, শাওনি তাকে চিনতে পেরেছিল। হয়তো অভ্যাসবশে শাওনি তাকে দারোগাবাবুর হাতে ধরিয়ে দেবে বলে ব্ল্যাকমেল করেছিল, কিংবা না করলেও সে ভেবেছিল, শাওনির তাকে ধরিয়ে দেবার সম্ভাবনা আছে। তাই শাওনিকে সে জবাই করেছিল। কিন্তু পুঁতি? পুঁতির সামনে সে দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল, অথবা যে-ভাবেই হোক পুঁতি তাকে চিনতে পেরেছিল। তাই সে ঝুঁকি নেয়নি। পুঁতিকেও আচমকা একা পেয়ে জবাই করেছে। হরিপদ? হরিপদও কি তাকে চিনতে পেরেছিল? হুঁ— তাছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে? হরিপদর গানগুলোতে কী যেন আভাস ছিল। নিশ্চয় ছিল। কিন্তু হরিপদ পুঁতির মতোই ভয়ে অথবা ঝুটঝামেলা এড়ানোর জন্য কথাটা খুলে দারোগাবাবু কিংবা অন্য কাউকে বলেনি। এদিকে হরিপদ একটা দারুণ ঝুঁকি খুনীর কাছে। কারণ দু-দুটো খুন কে করেছে, হরিপদ নিশ্চয় টের পেয়েছে। তাই পুঁতির মতো আচমকা পেছন থেকে ধরে ফেলে হরিপদকেও জবাই করেছে। হরিপদর গানই হয়তো তার নিজের মৃত্যুর কারণ। হুঁ, খুব সরল অথচ অভ্যস্ত পদ্ধতিতে হত্যা। আচমকা পেছন থেকে একটা হাত বাড়িয়ে চিবুক খামচে ধরে মাটিতে শুইয়ে একলাফে বুকে বসে গলায় জোরালো একটা প্যাঁচ। চাক্কুর ছুরিটা বিদেশী— ক্ষুরের মতো ধারালো। গতরাতে অন্ধকারে হত্যাকারী বারান্দায় ভিড়ে মিশে গিয়েছিল। চাক্কুর ছুরিটা তখনই চুরি করে থাকবে সে। তবে এও ঠিক, সে জানত চাক্কুর ব্যাগে একটা ছুরি আছে। নিশ্চয় সে দেখেছিল ছুরিটা ঝোপের আড়াল থেকে। চাক্কু বলেছে, তার একটা ড্যাগার

ছিল। কিন্তু তার আগে কি চাক্কু কোনো কারণে ড্যাগারটা বের করেছিল? নিশ্চয় করেছিল।

আবার ঝুপঝাপ শব্দে শকুন এসে বসছে। ব্রজহরি কর্নেলের উত্তেজিতভাবে ডাকছিলেন। কর্নেল ঢাল বেয়ে দ্রুত আস্তানা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার কিছু ঘটল কি?

কিন্তু গিয়ে দেখলেন, জনাতিনেক সৈনিক এবং জনাচার স্বেচ্ছাসেবী যুবক তিনটি মৃতদেহ প্রাঙ্গণে নামিয়েছে। বংকুবিহারী গলাকাটা কালুর পায়ের বাঁধন খুলে তার ঘাড় ধরে নামিয়ে আনলেন। বললেন, বডি ওঠান আপনারা। নৌকোয় নিয়ে যান একে-একে।

স্বেচ্ছাসেবীদের বুকে ব্যাজ। লেখা আছে : 'তরুণ সংঘ, কাঁদরা।' ব্রজহরিকে একজন বলল, আপনিও যে এখানে আটকে আছেন, জানতাম না ডাক্তারবাবু! আমরা ভেবেছিলাম—

বংকুবিহারী তাড়া দিলেন, মেক্ হেস্ট্ ভলান্টিয়ার্স্! পরে সব কথা হবে।

স্বেচ্ছাসেবীদের একজন পুঁতির মুখের কাপড় তুলেই ঢেকে দিল। আঁতকে ওটা স্বরে বলল, বাপ্স্!

মেক হেস্ট! মেক হেস্ট্ প্লিজ! বংকুবিহারী ফের তাড়া দিলেন।

চারজন স্বচ্ছাসেবী পুঁতির মড়াটা ওঠাল— দুজন বুকের কাছে ধরল, দুজন পা দুটো ধরল। চাক্কু ডুকরে কেঁদে কোমরের তলাটা ধরল।

পুঁতিকে নিয়ে গেলে সৈনিক তিনজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর একজন মাথার দিকে, একজন কোমরের তলা, তৃতীয়জন পায়ের দিকটা ধরে অনায়াসভঙ্গিতে নিয়ে গেল একটা মৃতদেহ। বংকুবিহারী তারিফ করে বললেন, কেমন বেস্ট্ হ্যান্ড দেখছেন কর্নেল? সরি, ইউ আর অলসো এ মিলিটারিম্যান!

কর্নেল একটু হাসলেন।...ছিলাম!

বংকুবিহারী কান করলেন না। তৃতীয় লাশটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু! দেখুন তো এটা কে?

ব্রজহরি পা বাড়িয়ে বললেন, আপনি দেখুন। আমি আর ওতে নেই!

হন্তদন্ত চলে গেলেন ডাক্তার ব্রজহরি কুণ্ডু। বংকুবিহারী গুম হয়ে বললেন, নেই বললে চলবে না। এক নম্বর উইটনেস— ডোন্ট ফরগেট দ্যাট!

কর্নেল কাপড় একটু তুলে দেখে বললেন, হরিপদ। তারপর ঢেকে দিলেন।

বংকুবিহারী বললেন, মেমসায়েবকে তো এম এল এর ভাগ্নে টানতে টানতে নিয়ে গেল। যাক্ গে, হরিপদকে নিয়ে গেলে আমাদের ছুটি! এই ভয়ঙ্কর জায়গা ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি!

কর্নেল বললেন, ঘনশ্যামবাবু নৌকোয় গিয়ে বসেছেন বুঝি?

banglaboi.com

নড়ে উঠলেন আইনরক্ষক।...মাই গুডনেস! তা তো জানি না। দেখেছ কাণ্ড? বলে পূবদিকে কড়া চোখে তাকালেন। সেইসময় স্বেচ্ছাসেবীরা দরগার কাছে এসে পৌঁছুলে গলা চড়িয়ে বললেন, নৌকোয় লম্বা নাক, রোগামতো এক ভদ্রলোক আছেন দেখলেন? ধুতি-পাঞ্জাবি পরা— আই মিন, পলিটিকাল লিডার ঘনশ্যাম রুদ্র! একজন স্বেচ্ছাসেবী বলল, ঘনশ্যাম রুদ্র? বলেন কী দারোগাবাবু? তিনি তো শুনেছি আন্ডার গ্রাউন্ডে আছেন। মলোচ্ছাই! বংকুবিহারী খাপ্পা হয়ে বললেন। নৌকোয় তাকে দেখলেন কি না জিগ্যেস করছি! অপর একজন স্বেচ্ছাসেবী বলল, তাকে আমরা দেখিনি। তবে নাম শুনেছি। সে না কি সাংঘাতিক লোক।

অপর একজন স্বেচ্ছাসেবী বলল, ধুস! যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। কত লিডার দেখলাম লাইফে। আয়, হাত লাগা!

চতুর্থ স্বেচ্ছাসেবী হাসলেন। ...ওয়েট! জওয়ানরা আসুক। ওদের ডেকে এসেছি। কী হেভি ডেডবডি মাইরি! আড়াইমণ ওজন যেন।

বংকুবিহারী বললেন, কর্নেল! ওরা বডি আনুক। আসুন, আমরা নৌকোয় গিয়ে দেখি দু নম্বর অসামি আছে না কি! এরা মনে হচ্ছে, খেয়াল করে দেখেনি। চলে আসুন!

কর্নেল বললেন, আপনি চলুন দারোগাবাবু! আমি যাচ্ছি।

ইউ আর স্টিল ম্যাড। বলে ক্রুদ্ধ আইনরক্ষক গলাকাটা কালুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললেন। সৈনিকদের আসতে দেখা গেল ভাঙা দেউড়ির ওখানে। তারা এগিয়ে এলে স্বেচ্ছাসেবী চার যুবক এক গলায় বলে উঠল, কাম অন ব্রাদার্স! কাম অন! সৈনিকরা হাসল। একজন বলল, মুর্দা হোনে সে আদমি বহৎ হেভি হো যাতা!

অন্য একজন কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, উও ডাগদারবাবু কর্নিলসাবকা বাত বোলা। আপ কোন হ্যায়? আপকো তো কর্নিল-উর্মিল নেহি মালুম হোতা। কাঁহা হ্যায় উও কর্নিলসাব?

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড বের করে তার সামনে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে এবং তার দুই সঙ্গী খটাখট্ শব্দ তুলে স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো স্যালুট দিল। স্বেচ্ছাসেবী যুবকরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল বললেন, আপলোগোঁকা মদত্ চাহ্‌তা থোড়া।

ইয়েস স্যার! হমলোগ রেডি। একজন সৈনিক বলল। বোলিয়ে, ক্যা করনে পড়ে গা?

কর্নেল স্বেচ্ছাসেবীদের দিকে ঘুরে বললেন, আপনারা নৌকো বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না?

একজন স্বেচ্ছাসেবী দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বলল, পারব হয়তো— তবে জলে টান ধরেছে। বড্ড স্রোত।

কর্নেল একটু ভেবে বললেন, ঠিক আছে। সোলজার্স! আপলোগ সবকো পঁহুছা দে কর তুরন্ত চলা আইয়ে। ইন্তেজার করুঙ্গা ম্যায়! কিতনা টাইম লাগে গা?

একজন সৈনিক বলল, আধা ঘণ্টা, স্যার! বহৎ কারেন্ট হ্যায়! নেহি তো জলদি আ যাতা।

দ্বিতিয় সৈনিক বলল, আভি যানেকা টাইম উও নাওকে নিয়ে জাস্তি টাইম লাগেগা। স্পিডবোট হ্যায়, স্যার! একেলা আনেসে দশ মিনিট— বাস!

ঠিক হ্যায়! কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন। ও'র শুনিয়ে— যাকে দারোগাবাবু কো বোলিয়ে, উনকা পলিটিকাল প্রিজনারকো পকড়নে চাহতা তো আপকা সাথ ফিরভি আনা পড়ে গা। উনকো সমঝ্ দিজিয়ে ইয়ে বাত।

পলিটিক্যাল প্রিজনার! সৈনিকেরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

কর্নেল বললেন, হাঁ— বহৎ খতরনাক আদমি! ঘনশ্যাম রুদ্র!

একজন সৈনিক বলল, তো কুছ আর্মস ভি ক্যাম্পসে লানা পড়ে গা, স্যার?

নেহি। আর্মসকা কৈ জরুরত নেহি! জলদি কিজিয়ে।

সৈনিকরা আবার কর্নেলকে স্যালুট ঠুকে মৃতদেহে হাত লাগাল। স্বেচ্ছাসেবীরাও হাত লাগানোর ভঙ্গি করল। হরিপদর মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল ওরা। তারপর নির্জন হয়ে উঠলে খোঁড়া পিরের দরগা। বিকেলের রোদ্দুর ক্রমে লালচে হয়ে উঠেছে। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে চারদিকে ঘুরে-ঘুরে গাছপালাগুলো দেখতে থাকলেন। কী একটা পাখি ডাকছে, যার ডাক সব পাখির ডাকের ভেতর আলাদা— শ্রুতিপাখির ধ্বনি যেন ওই ডাকে। কী পাখি ওটা? শেষবেলায় পাখিরা তুমুল কলরব করছে গাছে-গাছে। খুঁজে বের করা কঠিন বটে।

banglaboi.blogspot.com

কর্নেল উত্তর-পূর্ব কোণের ছাতিম গাছটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওখানে হরিপদ খুন হয়েছিল। গিয়েই চমকে উঠলেন। একবুক জলে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম রুদ্র কী একটা টানাটানি করছেন।

কর্নেল হেসে ফেললেন। ঘনশ্যামবাবু!

ঘনশ্যাম হকচকিয়ে ঘুরে কর্নেলকে দেখতে পেলেন এবং করুণ হেসে বললেন, ডোঙাটা—

হ্যাঁ, ডোঙাটা। কর্নেল বললেন। আপনি কী ভাবে টের পেলেন?

ঘনশ্যাম বললেন, জল কমে গেছে তো! কালো রেখার মতো দেখা যাচ্ছিল। একটা ডাল ভেঙে হাঁটুজলে নেমে গিয়ে ডালটা দিয়ে পরখ করে বুঝলাম, তালডোঙাটাই বটে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। উল্টেট গেল তো গেল। কিছুতেই চিত করাতে পারছি না! পারলে তো এতক্ষণ কেটে পড়তাম। বৈঠারও দরকার হত না। হাতদুটোই যথেষ্ট ছিল।

আপনি ওটা ডুবিয়েই রাখুন। উঠে আসুন! দারোগাবাবু চলে গেছেন আসামী নিয়ে।

ঘনশ্যাম দুঃখিতমুখে বললেন, কিন্তু আমি যে আটকে গেছি। প্রচণ্ড ক্ষিদেও পেয়েছে। উঠে আসুন।

দেরি করবেন না। শিগগির!

ঘনশ্যাম আন্ডারপ্যান্ট পরে জলে নেমেছিলেন। বিমর্ষভাবে উঠে এলেন। ঝোপের ভেতর লুকোনো ব্যাগে ধুতি-জামা-গেঞ্জি ছিল। একটা গামছাও। কর্নেলের তাড়ায় ঝটপট গা মুছে ধুতি-গেঞ্জি-পাঞ্জাবি পরে নিলেন আগের মতো। স্যান্ডেল গতকাল খুইয়েছেন বন্যার জলে। খালি পা। ফিসফিস করে বললেন, তা আপনি একা রয়ে গেলেন যে? এক নৌকোয় জায়গা হল না বুঝি?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনাকে ফেলে যাই কী করে? চুন্নুর পাল্লায় পড়ে—

ওসব আমি বিশ্বাস করি না! অশরীরী আত্মা-টাত্মা স্রেফ বাজে কথা। ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠলেন।...তার চেয়ে বলুন, আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য আপনি থেকে গেছেন। আমি তো বুঝতেই পেরেছি, আপনি একজন গোয়েন্দা।

কর্নেল আস্তে বললেন, আপনি জোর বেঁচে গেছেন ঘনশ্যামবাবু! চুন্নু এতক্ষণ আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে ডুবিয়ে মারত। না— গলা কাটত না। কারণ চাকুর ড্যাগারটা এখন আমার হাতে। এই দেখুন!

স্প্রিংয়ের ছুরটা দেখেই আঁতকে উঠলেন ঘনশ্যাম।...সর্বনাশ! কোথায় পেলেন?

দেখাচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে। চাপা স্বরে কথাটা বলে কর্নেল ঘনশ্যামকে অবাক করে তাঁর পাঞ্জাবিটা গলার কাছে খামচে ধরে টানলেন। প্রাঙ্গণের কবরখানায় পৌঁছে দেখা গেল, অন্ধ দরবেশ পিরের দরগার সামনে ভিজে চত্বরে দাঁড়িয়ে বিকেলের নমাজ পড়ছেন। কর্নেল জোরে হাঁটছিলেন। ঘনশ্যামকে বিব্রত ও ভীত দেখাচ্ছিল। আস্তানাঘরের পেছনে গিয়ে দেখা গেল, একদঙ্গল শকুন জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝতে পারছেন ঘনশ্যামবাবু?

ঘনশ্যাম রাগী মুখে বললেন, না তো। কিছু বুঝতে পারছি না। কেনই বা আমাকে আপনি এমন করে টানাটানি করছেন?

কর্নেল তেমনি ফিসফিস করে বললেন, ওখানে একটি লাশ পোঁতা আছে। শকুনগুলো গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু জল নামতে দেরি আছে। আসুন। আস্তানাঘরে যাই।

কর্নেল ঘনশ্যামের জামা ছেড়ে হাত ধরে টেনে আনার ভঙ্গিতে হন্তদন্ত ঢাল বেয়ে উঠে এলেন। অন্ধ দরবেশ দরগার কাছে দাঁড়িয়ে এবার বুকে চিমটে

ঠুকছেন। কর্নেল হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলেন, ঘনশ্যামবাবু! আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পালানোর চেষ্টা করবেন না। চুপ করে বারান্দায় বসুন। যান্—বসুন বলছি।

ঘনশ্যাম সত্যিকার রাগে পাল্টা গলা চড়িয়ে বললেন, যান, যান! আমাকে জাঁক দেখাবেন না! কী সব উদ্ভুট্টে কাজকারবার! তক্ষুণি ভদ্রলোকের মতো কথাবার্তা, আবার তক্ষুণি অপমানজনক ব্যবহার! অদ্ভুত লোক তো মশাই আপনি!

বলে টপাস করে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলেন। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, আপনি বলছিলেন আমি পুলিশের গোয়েন্দা। কাজেই ঘনশ্যামবাবু, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য আপনার নেই। পালাবেন ভেবেছিলেন, তাই না?

ঘনশ্যাম আর কোনো কথা বললেন না। আঙুল খুঁটতে থাকলেন মুখ নামিয়ে। দরবেশের প্রার্থনা শেষ। চিমটে বাড়িয়ে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছিলেন। বারান্দায় উঠে হাঁক ছাড়লেন, চুল্লু! তারপর তালা খুলতে দরবেশ যখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন কর্নেল বললেন, দরবেশ সায়েব! আপনার ওপর আর আমরা জুলুম করব না। এখনই বোট এসে যাবে। এই আসামীকে নিয়ে আমরা চলে যাব। তবে দয়া করে যদি একটু চা খাওয়ান, ভাল হয়। দশটা টাকাই না হয় নেবেন।

দরবেশ আস্তে বললেন, দুধ নাই বাবাসকল মা সকল! খালি চা আর একটুখানি চিনি আছে।

কর্নেল উঠে গিয়ে পায়ের কাছে একটা দশ টাকার নোট রাখলেন। বললেন, টাকাটা নিন!

অন্ধ দরবেশ টাকাটা চিমটে দিয়ে ঠিকই খুঁজে পেলেন এবং চিমটেতে আটকে তুলে নিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের তলা থেকে কেরোসিন কুকার বের করে বললেন, নিন বাবাসকল, মা সকল! জালায় পানি আছে। বারান্দার তাকে কেটলি আছে। ভাঁড় আছে। চা-চিনি দিচ্ছি।

কর্নেল কেরোসিন কুকার ধরানোর সময় স্পিডবোটের শব্দ শুনতে পেলেন। দরবেশ কাগজের পুরিয়ায় চা ও চিনি নিয়ে ডাকলেন, বাবা সকল, মা সকল! চা-চিনি!

চা-চিনি পুরিয়া নিয়ে কর্নেল বললেন, আপনিও খাবেন তো দরবেশসায়েব?

আপনাদের ইচ্ছা বাবাসকল, মা সকল!

তাহলে বসে পড়ুন এখানে। কই, আপনার আসন নিয়ে আসুন!

দরবেশ ঘর থেকে জীর্ণ গালিচাটি বের করে বিছিয়ে বসলেন। বুকে চিমটে ঠুকে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, চুল্লু! চুল্লু চুল্লু! মোটরবোটের আওয়াজ

bengalidownload.com

বাড়ছিল ক্রমশ। বাড়তে বাড়তে একসময় থেমে গেল আওয়াজটা। কর্নেল জালা থেকে জলতুলে কেটলি ভরছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দেখলেন, বারান্দায় ঘনশ্যাম নেই। প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এক পলকের জন্য তাঁকে ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে দেখা গেল। কর্নেলের ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু কিছু বললেন না। কেটলি চাপিয়ে দিলেন কেরোসিন কুকারে।...

চুল্লু! চুল্লু!

সৈনিকেরা ফিরে এসেছে। একজন সশস্ত্র। কাঁদরা থানার ওসি বংকুবিহারী ধাড়া আসেননি। পাঠিয়েছেন থানার সেকেন্ড অফিসার ধরণীধর সমাদ্দারকে। ইনি ঢ্যাঙা, গুঁফো, টানটান গড়নের মধ্যবয়সী মানুষ। সঙ্গে দুজন তাগড়াই কনস্টেবল, হাতে মাস্কেট। সৈনিকদের স্যালুট ঠোকা দেখে তারাও জবুর স্যালুট ঠুকল। ধরণীধরকে।

বড়বাবু বংকুবিহারী ততকিছু বলেননি। তাই নেহাতই নমস্কার করে ফেলেছিলেন কর্নেলকে। সৈনিকদের এবং কনস্টেবলদ্বয়ের স্যালুট ঠোকা তাঁকে বিব্রত করায় তিনিও একখানা স্যালুট ঠুকে বসলেন। কর্নেল মিটিমিটি হেসে পাল্টা স্যালুট ঠুকে বললেন, আপনারা বসুন আগে। একটু চা খান। বৈঠ্ যাইয়ে সব।

ধরণীধর বললেন, কর্নেলসায়েব! কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি?

হবে। কথা হবে। একটু বসুন। কর্নেল হাসলেন। র চায়ে আপত্তি নেই আশা করি। সোলজার্স?

সশস্ত্র সৈনিকটি মুচকি হেসে বলল, জরুর পিয়েঙ্গে, স্যার! হমলোগ বহৎ টায়ার্ড! চায় পিনে কা মওকা মিলা নেহি অভিতক্।

ছোট্ট মাটির ভাঁড়ে একটুখানি করে চিনি মেশানো লিকার ঢেলে বিলি করলেন কর্নেল। দরবেশকে পুরো ভাঁড়ই দিলেন। দরবেশ চিমটে ঠোকা বন্ধ করে ভাঁড় নিয়ে সশব্দে চুমুক দিয়ে হাঁকলেন, চুল্লু!

ধরণীধর একটু অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, চুল্লু এ দরগার পাহারাদার— অশরীরী আত্মা! সেই তো গলাকাটা কালুকে ভর করেছিল। তাই তিন-তিনটে মানুষের প্রাণ গেছে, বুঝলেন তো?

শুনে ধরণীধর হাসলেন।...কালুর নামটাই গলাকাটা। এর আগে সে অনেকের গলা কেটেছে। ইদানিং সে ইসমাইল ডাকুর দলে ভিড়েছে বলে খবর ছিল আমাদের হাতে। যাই হোক, এতদিনে তাকে বড়বাবু হাতেনাতে ধরেছেন। প্রমোশন হয়ে যাবে বড়বাবুর।

সৈনিক আর কনস্টেবলরা বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে দু চুমুকেই চা শেষ করেছে। ভাঁড়গুলো ছুড়ে ফেলায় কিছু আওয়াজ হল। দরগার বনভূমির তলায়

আবছায়া, মাথায় ফিকে গোলাপী রোদ্দুর। পাখিদের হট্টগোল তুমুল বেড়েছে। কর্নেল চটুকু শেষ করে বললেন, হ্যাঁ— কালু বা হরমুজ আলি এর আগেও গলা কেটেছে শুনেছি। কিন্তু এভাবে তিন-তিনটে মানুষ এবং একটা কুকুরের গলা চব্বিশঘণ্টার মধ্যে কখনও কি সে কেটেছে?

ধরণীধর স্বীকার করলেন, না— তা কাটেনি।

তাহলে? কর্নেল গলার ভেতর বললেন, চুল্লু! চুল্লু তাকে ভর করেছিল। দরবেশসায়েব কী বলেন?

দরবেশও ভরাটগলায় বললেন, চুল্লু!

ধরণীধর কালো আলখেল্লা ও কালো পাগড়িপরা দরবেশকে দেখতে দেখতে বললেন, এই দরবেশসায়েবের কথা শুনেছি। ইনি এক সাধক পুরুষ, তাও শুনেছি। তা উনি নাকি কথা বলেন না কারুর সঙ্গে?

কর্নেল বললেন, একেবারে বলেন না, তা নয়। তবে খুব দরকার হলে বলেন। উনি খুব জ্ঞানী মানুষ। গতকাল ওঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়েই বুঝেছিলাম, উনি যা কিছু বলেন, সবই সিম্বলিক। যেমন, ওই চুল্লু! চুল্লু হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এভিলের— মানে, সবকিছু মন্দের উৎস। তার মানে, যা কিছু মন্দ জিনিস, চুল্লু থেকেই বেরিয়ে আসছে।

ধরণীধর একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বললেন, প্লিজ কর্নেলসায়েব! ঘনশ্যাম রুদ্র—

হুঁ, বেলা পড়ে এসেছে। এবার অপারেশন শুরু করা দরকার। কর্নেল উঠে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ফের, ঘনশ্যামবাবুর পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চারদিকে বিশাল মাঠের মাঝখানে এই উঁচু ঢিবি। কাজেই উনি এখানেই লুকিয়ে আছেন— থাকতে বাধ্য। বাই দা বাই, বন্যার জলের গভীরতা কতটা বলতে পারেন?

ধরণীধর বলার আগে একজন সৈনিক বলে দিল, কমসে কম বিশ ফুট হোগা, স্যার!

ধরণীধর সায় দিলেন। তা হবে। হোল এরিয়া একেবারে ফ্ল্যাট ল্যান্ড— সমতলই বটে। কাজেই সর্বত্র জলের ডেপ্‌থ্ একইরকম।

কর্নেল বললেন, আপনারা টর্চ এনেছেন। কাজেই অসুবিধা নেই। তবে একটা কথা। দল বেঁধে খুঁজতে হবে। কারণ, একা-একা কম্বিং অপারেশন চালানো বিপজ্জনক।

ধরণীধর একটু বিরক্ত হয়ে বললনে, তাতে কি লাভ হবে? আমরা চক্কর দেবে, ঘনশ্যামবাবুও চক্কর দিতে থাকবেন। তার চাইতে তিন দলে ভাগ হয়ে তিনদিক থেকে—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, না, না! সাবধান, সাবধান! চুল্লু সত্যি ভয়ঙ্কর। সে যে-কোনও মুহূর্তে হামলা করবে। আসুন, আমরা প্রথমে ঢিবির পশ্চিম দিক থেকে শুরু করি।

boiRboi.blogspot.com

বিরক্তমুখে ধরণীধর কর্নেলকে অনুসরণ করলেন। দিগন্তে সূর্য লালরঙের চাকা হয়ে সবে রঙবেরঙের মেঘের ভেতর লুকিয়ে গেল। বিস্তীর্ণ উত্তরঙ্গে বন্যার জলে একটু লালচে ছটা খেলছে। বাঁদিকে শকুনের দঙ্গল জলের ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ধরণীধর বললেন, মড়াটড়ার আশায় বসে আছে। বন্যা হলে অনেক জন্তু মারা পড়ে। ভেসে এসে ঢিবিতে আটকে যেতে পারে।

কর্নেল আস্তে বললেন, ধরণীবাবু, ওখানে একটা লাশ পোঁতা আছে।

ধরণীধর চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু কর্নেল দ্রুত চুপ্ বলায় থমকে দাঁড়ালেন। চাপাস্বরে শুধু বললেন, সে কী!

কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন, চলুন ধরণীবাবু, এখান থেকে দক্ষিণদিক হয়ে সার্চ করা যাক।

শকুনগুলোকে এড়িয়ে গাছপালা, ঝোপঝাড়ে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর সাতজন লোক কম্বিং অপারেশন শুরু করল। সবার আগে ধরণীধর। একহাতে টর্চ, অন্যহাতে রিভলবার। গাছপালার ভেতর এখনই অন্ধকার জমেছে। টর্চ জ্বেলে গাছের ওপর, ডালপালার ভেতর, ঝোপের আড়াল, ধ্বংসস্তূপ তন্নতন্ন খোঁজা হচ্ছে। দক্ষিণে বটতলায় গিয়ে কর্নেল বাঁদিকে ঘুরে দেখলেন দরবেশ দরগার কাছে নামাজ পড়ছেন। দলটা ঘুরে পূর্বে পৌঁছল। নিচে দুটি সাদা মোটরবোট দেখা গেল আবছায়ার ভেতর। ধরণীধর বুদ্ধিমান। একজন সশস্ত্র কনস্টেবলকে একটা বোটে বসিয়ে রেখেছেন। কর্নেল বললেন, ধরণীবাবু! আপনার প্রশংসা করা উচিত।

ধরণীধর মনে-মনে অসন্তুষ্ট। বিরক্ত। কারণ, এভাবে কম্বিং অপারেশন অর্থহীন। কিন্তু কথাটা শুনে অগত্যা একটু হাসলেন। কেন বলুন তো কর্নেলসায়েব?

আমাদের পলিটিক্যাল প্রিজনার যাতে ওই বোটে করে পালাতে না পারে, আপনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, দেখছি। বলে কর্নেল হঠাৎ হন্তদন্ত সোজা হাঁটতে শুরু করলেন উত্তর দিকে। একজন সৈনিক বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ইয়ে ক্যা হো রাহা?

ধরণীধর চাপা স্বরে বললেন, এর একটা বোঝাপড়া করা দরকার। কোনো মানে হয়?

একজন কনস্টেবল্ বলল, স্যার! বড়বাবু বোলা না, কর্নিলসাব পাগলা আদমি!

হুঁ, বোলা। ধরণীধর শক্ত মুখে বললেন। ছোড় দো উনকো। এক কাম করো। তেওয়ারি, তুম ইয়ে তিন জওয়ানলোগোঁকা সাথ সিধা দরবেশবাবাকা ডেরাকি পিছেসে স্টার্ট করো। সাউথসাইড দেখ লিয়া। ওয়েস্টসে স্টার্ট কারকে ইস্টমে সার্চ করো। হমলোগ ইধারসে নর্থবরাবর ওয়েস্টমে সার্চ করতা। গো! জলদি!

তেওয়ারিজি তিনজন সৈনিককে নিয়ে ভাঙা দেউড়ি দিয়ে সোজা আস্তানার দিকে চলে গেল। ধরণীধর দ্বিতীয় কনস্টেবলকে বললেন, ধনেশ্বর! আও মেরা সাথ।...

উত্তর-পূর্ব কোণে ছাতিমতলায় কর্নেল দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে লম্বা একটা ডাল। উরু পর্যন্ত ভিজে গেছে পাতলুন। ধরণীধর এসেই বললেন, কী ব্যাপার?

সাপ।

ধরণীধর চমকে গেলেন। কই সাপ? কোথায় সাপ?

কর্নেল ডালটা জলে ফেলে দিয়ে বললেন, পলিয়ে গেল। যাই হোক, এই ঢিবিতে কিন্তু প্রচুর সাপ এসে জুটেছে। সাবধান ধরণীবাবু!

ধরণীধর বিরক্ত মুখে বললেন, জানি। দেখেশুনেই পা ফেলছি।

বলে ছাতিম গাছটাতে টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে থাকলেন পালিটিক্যাল প্রিজনার ঘনশ্যাম রুদ্রকে। কনস্টেবল ধনেশ্বর সামনের জঙ্গলে আলো ফেলল। কর্নেল বললেন, আর খুঁজে লাভ নেই। ধরণীবাবু! আপনাদের দ্বিতীয় আসামী পালিয়ে গেছে।

অসম্ভব। ধরণীধর শক্তমুখে বললেন। সাঁতার কেটে পালানোর মতো ক্ষমতা ঘনশ্যাম রুদ্রের নেই। আমাদের রেকর্ডে আছে ওঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা কী। আই অ্যাম সরি, কর্নেল সায়েব! ইউ হ্যাভ মিসলেড আস।

বলেন কী। কর্নেল হাসলেন।

এগেন--- সরি। ধরণীধর পা বাড়ালেন। প্লিজ লেট মি ডু মাই ডিউটি।

দুজনে আলো ফেলতে ফেলতে বাজে শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে গেলেন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। কর্নেল আপনমনে হাসছিলেন। ঘনশ্যামবাবুকে ইচ্ছে করেই যথেষ্ট সময় দিয়েছেন পালানোর জন্য। ডোঙাটি উদ্ধার করে পালাতে পেরেছেন, কারণ ডোঙাটি যথাস্থানে নেই। খুঁজে পাননি কর্নেল।

প্রাঙ্গণের কবরখানায় গিয়ে দেখলেন দরবেশ নমাজ সেরে বারান্দায় গিয়ে বসেছেন। যথারীতি বুকে চিমটে ঠুকছেন। কর্নেল বারান্দায় উঠলে দরবেশ হাঁকলেন, চুল্লু!

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ ও বর্ষাতি বারান্দার ধারে নিয়ে এলেন। পা ঝুলিয়ে বসে কিটব্যাগ খুলে চুরুটের কৌটো বের করলেন। একটি চুরুট জ্বেলে টানতে থাকলেন। একটু পরে ধরণীধরদের দেখা গেল। প্রাঙ্গণে এসে ধরণীধরবাবু নিচু গলায় কী নির্দেশ দিচ্ছেন। এমনসময় কর্নেল ডাকলেন, ধরণীবাবু! এখানে আসুন! জরুরি কথা আছে। শিগগির! ঘনশ্যামবাবু---

'ঘনশামবাবু' শুনেই ধরণীধর সদলবলে প্রায় দৌড়ে এলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, কই? কই? বাট প্লিজ, ডোন্ট মিসলিড এগেন! হোয়্যার ইজ দ্যাট ম্যান?

banglaidownload.com

আপনি শান্তভাবে বসুন। বলছি।

আঃ! আবার—

ধরণীধর, সত্যিই ঘনশ্যামবাবু পালিয়ে গেছেন। বিশ্বাস করুন আমরা কথা।

কিন্তু পালালেন কীভাবে? দেখেছেন আপনি তাকে পালাতে?

দেখেছি বলতে পারেন। নিশ্চয় পারেন।

ধরণীধর খাপ্পা হয়ে বললেন, আশ্চর্য! দেখেছেন, কিন্তু আমাদের বলেননি! ঘনশ্যামবাবু—

আগে আমার কথার জবাব দিন। আমাদের সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, ঘনশ্যামবাবু একটা তালডোঙায় চেপে পালিয়ে গেছেন।

তালডোঙা? ধরণীবাবু ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর নড়ে উঠলেন মাই গুডনেস! বড়বাবু গলাকাটা কালুর তালডোঙাটার কথা বলেছিলেন মনে পড়ছে!

কর্নেল শান্তভাবে বললেন, তালডোঙাটা প্রথমে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু চুল্লু আড়াল থেকে দেখে সেটা দড়ি ছিঁড়ে জলের তলা থেকে উদ্ধার করেছিল। তারপর আজ কোনো এক সময়ে চুল্লু ওটা ছাতিমতলায় জলে ডুবিয়ে রেখেছিল। জল কমে এলে ঘনশ্যামবাবুর সেটা চোখে পড়ে। চুল্লু তাঁকে মেরে ফেলত গলা কেটে নয়, গলা টিপে জলে ডুবিয়ে। দৈবাৎ আমি গিয়ে পড়ায় উনি বেঁচে যান। চুল্লু কেটে পড়ে।

কী খালি চুল্লু-চুল্লু করছেন আপনি! ওসব আমি বিশ্বাস করি না!

চুল্লুকে বিশ্বাস করেন না? নাকি আমার কথা?

তেতোমুখে সিগারেট জ্বেলে ধরণীধর বললেন, দুটোই।

কিন্তু দুটোই নিখাদ সত্যি! চুল্লু সত্যিই আছে!

হ্যাঙেরি! ধরণীধর তাঁর বড়বাবুর ভঙ্গিতে বললেন। আপনার মাথার ঠিক নেই। জলবন্দী অবস্থায় থেকে ক্ষিদের চোটে আপনার সেন্স অফ রিজনিং লোপ পেয়েছে। খালি চুল্লু-চুল্লু করছেন।

অন্ধ দরবেশ হাঁক দিলেন, চুল্লু! তারপর উঠে দাঁড়ালেন। দরজার তালা খুলতে চাবি বের করলেন আলখেল্লার ভেতর থেকে।

কর্নেল বললেন, দরবেশসায়েব! এঁরা চুল্লুর কথা বিশ্বাস করছেন না। দয়াকরে এঁদের বলুন, চুল্লু কে? চুল্লু কে ছিল? কত বছর আগে চুল্লু খাঁ নামে এর জায়গিরদার এই এলাকার মালিক ছিল? দরবেশসায়েব! বলুন তো এঁদের সেই সাংঘাতিক গল্পগুলো! কত খুন খারাপি করেছিল চুল্লু খাঁ, সেইসব কথা বলুন।

দরবেশ সবে তালা খুলেছেন, কর্নেল এক লাফে উঠে গিয়ে পেছন থেকে দুহাতে তাঁকে জাপটে ধরে এক প্যাঁচে বারান্দায় ধরাশায়ী করলেন।...ধরণীবাবু! হেল্প মি! চুল্লুকে ধরে ফেলেছি।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হকচকিয়ে গেছে। ততক্ষণে কর্নেল দরবেশের বুকে চেপে বসেছেন, চিমটেটি তাঁর তলায় লম্বালম্বি হয়ে আছে। বারান্দায় আবছা অন্ধকারে কয়েকটা টর্চের আলোয় দৃশ্যটা চোখে পড়ল। ধরণীধর বললেন, ব্যাপার কী? কর্নেল! কর্নেল! ও কী করছেন?

কর্নেল দরবেশের চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ছুড়ে ফেললেন। তারপর হ্যাঁচকা টানে পাগড়ি উপড়ে ফেললেন। পাগড়ির সঙ্গে পরচুলা ও দাড়িও হাতে উঠে এল। কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ধরণীবাবু! ডাকু ইসমাইলকে কখনও দেখেছেন?

মাই গড! ধরণীবাবু এতক্ষণে লাফ দিলেন। কনস্টেবল দুজন একগলায় চেঁচিয়ে উঠল, ইসমাইল ডাকু! ওহি তো ইসমাইল ডাকু!

কর্নেল চিমটেটি কেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরবেশবেশী ঈসমাইল শুয়েই রইল। তেওয়ারি ও ধনেশ্বর তাকে টেনে ওঠাল। ধরণীধর তার বুকে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বললেন, ধনেশ্বর! হ্যান্ডকাপ হ্যায় তুমহারা পাস। লাগা দো!

দুই কনস্টেবল ইসমাইলের দুটো হত পিঠের দিকে টেনে হ্যান্ডকাপ পরাল। ইসমাইল চুপ। সৈনিকত্রয় বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। ব্যাপারটা তাদের এখনও তত বোধগম্য নয়। কর্নেল ঘরের ভেতর ঢুকে তক্তাপোসের তলায় নিজের টর্চটি জ্বেলে বললেন, ধরণীবাবু! দেখে যান।

ধরণীবাবু দরজার কাছে গুঁড়ি মেরে তক্তাপোসের তলা দিয়ে টর্চের আলো ফেললেন। বললেন, কী কাণ্ড! একটা ফোকর দেখছি!

হুঁ, চিমটে দিয়ে এই সুড়ঙ্গটা খুঁড়েছিল ইসমাইল। ভেতর থেকে যখন-তখন দরজা বন্ধ করার এই হল রহস্য। কর্নেল টর্চের আলোয় ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে বললেন। দরজা বন্ধ করে ইসমাইল এই ফোকর দিয়ে বাইরে বেরুত। আমাদের অলক্ষ্যে সকলের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। গলাকাটা কালু ওর সাগরেদ। একটা তালডোঙা এনেছিল ওকে নিয়ে যেতে। কিন্তু হঠাৎ শাওনি, তারপর আমাকে এবং দরগায় এতগুলো লোকজন, এমন কী স্বয়ং দারোগাবাবুকে দেখে কালু ঝটপট গাছের ডালে লুকিয়ে পড়েছিল। আমি তালডোঙাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম— নেহাত একটা খটকা বেধেছিল বলেই। কিন্তু ইসমাইল মহা ধূর্ত। যেভাবে হোক, ব্যাপারটা দেখেছিল। তারপর কোনো এক সময়, নিশ্চয় গতরাতেই ওটা উদ্ধার করে ছাতিমতলার নিচে লুকিয়ে রেখে এসেছিল।

banglaboi.com

ধরণীধর বললেন, কিন্তু তখনই পালিয়ে যেতে পারতো। কেন পালায়নি?

কর্নেল হাসলেন। পালায়নি, তার কারণ অন্ধ দরবেশের জমানো টাকাকড়ি খুঁজে পাচ্ছিল না। ওই দেখুন, সিন্দুকের ভেতরটা ওলটপালট হয়ে আছে। আর এই দেখুন, এখানে খোঁড়াখুঁড়ির চেষ্টা। আমরা আসার আগেই অন্ধ দরবেশকে সম্ভবত গলা টিপে মেরে—

সর্বনাশ! বলেন কী? ধরণীধর অবাক হয়ে বললেন। তাহলে কি শকুনগুলো যেখানে বসে আছে, ওখানেই অন্ধ দরবেশের ডেডবডি পোঁতা আছে?

আছে। গতকাল এখানে এসে ঘোরাঘুরি করতে করতে জায়গাটা আমার চোখে পড়েছিল। ঘাসের আর কাদামাটির চাবড়া চাপানো দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার। সদ্য কেউ যেন কিছু পুঁতেছে! ব্যাপারটা বোঝার জন্যই আসলে দরগায় থেকে গেলাম। তারপর হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা এসে পড়ল। জায়গাটা ডুবে গেল। ওখানেই ইসমাইল আসল দরবেশকে মেরে পুঁতেছে।

ধরণীধর বারান্দা থেকে পরচুলা আর চিমটেটা কুড়িয়ে নিলেন। বললেন, ইসমাইল ডাকুর ছদ্মবেশ ধরার কথা পুরনো পুলিশ রেকর্ডে আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। অথচ দেখছি, ব্যাপারটা সত্যি। একবার নাকি নবাবগঞ্জ বাজারে ফকির সেজে হাত পেতে বসে থাকত। পুলিশের নাকের ডগায়! ধরণীধর হাসতে লাগলেন।

ধনেশ্বর বলল, স্যার! আর কেতনা দের হোগা?

ধরণীধর কিছু বলার আগে কর্নেল বেরিয়ে এসে বললেন, উসকো লে যাইয়ে! বোটমে যাকে বৈঠিয়ে। সোলজার্স! গো উইথ দেম!

ধরণীধর বললেন, আমাদের আর এখানে থাকার দরকার আছে কি কর্নেলসায়েব?

দরকার আছে, ধরণীধরবাবু! কর্নেল বললেন। আমার ধারণা, এই ঘরে অন্ধ দরবেশের জমানো টাকাকড়ি তো আছেই, আগের আমলের আরও দামী কিছু থাকা সম্ভব। এই দরগায় যুগ যুগ ধরে লোকেরা মানত দিয়েছে। বহু দামী জিনিসপত্রও দিয়ে থাকবে।

গুপ্তধন? ধরণীধর মুচকি হেসে বললেন।

অসম্ভব নয়। এটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক জায়গা। কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি বারান্দার কোণ থেকে উদ্ধার করে লাইটার জ্বেলে ধরালেন। বললেন— তার চেয়ে বড় কথা দরবেশের ডেডবডিটা শকুনের মুখে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না। আপনি বরং এক কাজ করুন। একটা বোটে ওরা আসামী নিয়ে চলে যাক। বাই দা বাই, আপনাদের বোটে যদি কিছু ফুড থাকে নিয়ে আসুন। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত!

রিলিফের জন্য কিছু ফুডপ্যাকেট দেখেছি জওয়ানদের বোটে! নিয়ে আসছি। বলে ধরণীধর সদলবলে চলে গেলেন।

কর্নেল ঘর থেকে খুঁজে দরবেশের লণ্ঠনটি নিয়ে এলেন বারান্দায়। জ্বালতে গিয়ে কয়েকমুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। প্রকৃতই এক অন্ধ দরবেশ এই নির্জন দরগায় এই লণ্ঠনটি জ্বেলে রাত কাটাতেন। হয়তো নিজেকেই সাহস দিতে মাঝে মাঝে হাঁক দিতেন, চুল্লু! চুল্লু! ডাকু ইসমাইল চমৎকার নকল করেছিল এই ডাকটি।

বারান্দার ধারে জ্বলন্ত লণ্ঠনটি রেখে প্রাঙ্গণের কবরখানায় নামলেন কর্নেল। চারপাশে গা ছমছমকরা অন্ধকার বনভূমি ঘিরে আবছা ছলছল বন্যাজলের শব্দের সঙ্গে পোকামাকড়ের ডাক মিশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিভীষিকা একাকার হয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একটা বাতাস এল শনশনিয়ে। যেন ফিসফিস করে উঠলেন অন্ধ দরবেশ, চুল্লু! চুল্লু! চুল্ল!

কর্নেল শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। হুঁ, শকুনগুলো ওত পেতে আছে! বন্যার জল আলগা করে বসানো ঘাসের চাবড়া টেনে নামিয়ে নিয়ে গেলে মাটি গলে দরবেশের লাশ বেরিয়ে পড়বে সারারাত সেই প্রতীক্ষা শকুনদের। ভোরবেলা তারা বাঁকা ধারালো ঠোঁট বাগিয়ে পা বাড়াবে।

তাই এরাতটাও দরগায় কাটাতে হবে। কর্নেল সিদ্ধান্ত করলেন। ধরণীধরকে বলবেন কথাটা, যদি ধরণীধর থাকতে রাজি না হন, একাই থাকবেন কর্নেল। শকুনের মুখ থেকে হতভাগ্য অন্ধ মানুষটির মৃতদেহ রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। কর্নেলের মনে হল, চারপাশ থেকে মৃত মানুষটির অসহায় আর্তনাদ বাতাসে স্পন্দিত হচ্ছে, চুল্লু! চুল্লু! চুল্লু!...

bengalidownload.com

বংকুবিহারীর পুনরাবির্ভাব

বন্দী ইসমাইল ডাকুকে একটি মোটরবোটে পাঠিয়ে দিয়ে ধরণীধর কয়েকটা ফুডপ্যাকেট বগলদাবা করে এনেছিলেন। তিনিও ক্ষুধার্ত। খাওয়া সেরে আস্তানাঘর খুঁজে চা ও চিনির কৌটো পাওয়া গেছে। দুধ সত্যি নেই। কর্নেল চা করেছেন কুকার জ্বেলে। চা খেতে খেতে ধরণীধর বলছিলেন, এমন ভয়ংকর বন্যা নাকি মহকুমায় গত একশোবছরে দেখা যায়নি। আর্মি না নামালে একাধিক মানুষ মারা পড়ত। তবে গৃহপালিত জীবজন্তু বন্যা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। আসার পথে প্রচুর ভেড়াবাছুর দেখলাম। হরিবল্!

এইসময় আবার মোটরবোটের শব্দ। দুজনেই কান পাতলেন। শব্দটা দরগার ঠিক পশ্চিমে শোনা যাচ্ছিল। আওয়াজ বাড়তে বাড়তে কাছে এসে থেমে গেল। আলোর ঝলকানি দেখা গেল। দুজনে প্রাঙ্গণে নেমে গেলেন। তাঁদের ওপর আলো পড়ল। তারপর বংকুবিহারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কণ্ঠস্বর বলা ভুল, গর্জন মিশ্রিত আর্তনাদ যেন, কর্নেল! ধরণীবাবু! ওকে পালাতে দেবেন না। অ্যারেস্ট দ্য ম্যান, দ্যাট দরবেশ।

দুজনে মুচকি হাসলেন শুধু। বংকুবিহারী সদলবলে মাটি কাঁপিয়ে প্রাঙ্গণে এসে বারান্দায় টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, আস্তানাঘরের দরজা খোলা। এক লাফে বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলেন, হোয়ার ইজ দ্যাট বাস্টার্ড? পালিয়ে গেছে? তাকেও পালাতে দিলেন আপনারা? ধরণীধর কিছু বলার আগে কর্নেল বললেন, গলাকাটা কালু নিশ্চয়ই কবুল করেছে কিছু?

হ্যাঁ। বংকুবিহারী হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন। কিন্তু কোথায় সে? কীভাবে পালিয়ে গেল?

কর্নেল হাসলেন।...পালাতে পারেনি। দরবেশরূপী ইসমাইলকে নিয়ে কনেস্টেবলরা এতক্ষণ থানায় পৌঁছে গেছে। আপনি পশ্চিমদিক ঘুরে এসেছেন, সম্ভবত তাই মোটরবোটটি দেখতে পাননি।

তাই? বলে ধপাস করে বারান্দায় বসে পড়লেন বংকুবিহারী। তারপর ফ্যাঁচ করে হাসলেন। আপনি মশাই, সত্যি বড্ড অদ্ভুত মানুষ! খুলে বলুন তো সব, শুনি।

কর্নেল বললেন, কালু কী কবুল করেছে বলুন আগে।

বংকুবিহারী শ্বাস ছেড়ে বললেন, কালু আর ইসমাইল কালীতলা গ্রামে এক সাগরেদের বাড়ি লুকিয়েছিল। আমার হানা দেবার খবর চরের মুখে পেয়ে মাঝরাত্তিরেই কেটে পড়েছিল। দুজনে এই দরগায় গা ঢাকা দিতে এসেছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তদের স্বভাব— এবং লোভ! দরবেশের কাছে লোকেরা টাকাকড়ি সোনাদানাও মানত দেয়। সেগুলোর লোভে দুই ডাকু নিলে বেচারা অন্ধ দরবেশকে গলা টিপে মারে। তারপর ওঁর চিমটেখানি তো দেখেছেন? বেশ মজবুত আর সূচলো।

কর্নেল বললেন, সাধুদের যেমন ত্রিশূল, ফকির-দরবেশদের তেমনি চিমটে থাকে। আসলে আত্মরক্ষার অস্ত্র।

বংকুবিহারী বললেন, ওই চিমটে দিয়ে গর্ত ঘুঁড়ে একখানা লাশ গুম করে দুজনে। তারপর এই ঘরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। দেয়াল, মেঝে সবখানে খোঁড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। দৈবাৎ কোনো লোক মানত দিতে এসে পড়তেও পারে। তাই কালুকে পুবের দেউড়ির ওখানে পাহারা দিতে পাঠায় ইসমাইল। এমন সময় একজন সাদা দাড়িওলা বুড়ো সায়েব— মানে আপনি!

খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন বংকুবিহারী। কর্নেল বললেন, হ্যাঁ— আমি এসে পড়ায় ওদের কাজে বাধা পড়া স্বাভাবিক।

বংকুবিহারী ফের সিরিয়াস হয়ে বললেন, কালু দৌড়ে এসে খবর দেয়। ইসমাইল বলে, তুই পালিয়ে যা এখান থেকে। কালু কেটে পড়ে। আর ইসমাইল দরবেশের আলখেল্লা পরে— বুঝলেন তো? কালু একটা গ্রামে ছিল।

একটা তালডোঙা চুরি করে ওস্তাদকে উদ্ধার করতে আসে। কালু তখন আমাদের যা-যা বলেছিল, সবই শুনেছেন। শুধু একটা কথা চেপে রেখেছিল সে। সেটা হল— দরবেশই ইসমাইল ডাকু!

হ্যাঁঃ! বংকুবিহারী শ্বাসের সঙ্গে বললেন। কিন্তু আপনি মশাই অদ্ভুত! সব জেনেও চুপচাপ ছিলেন! কেন?

কর্নেল হাসলেন। আসলে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। পরিস্থিতিটা বড্ড জট পাকিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেককেই সন্দেহ করা চলে, এমন একটা অবস্থা। অবশেষে চাক্কুর ড্যাগারটা কুড়িয়ে পেয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম। তাই বাই দা বাই, আপনার পলিটিক্যাল প্রিজনার ঘনশ্যামবাবু—

লাফিয়ে উঠলেন বংকুবিহারী। মাই গুডনেস! ওর কথা তো ভুলেই গেছি! তাকে খোঁজা দরকার।

কালুর তালডোঙা উদ্ধার করে ঘনশ্যামবাবু পালিয়ে গেছেন।

বংকুবিহারী হঠাৎ নিস্তেজ ভঙ্গিতে বললেন, মরুক গে। বিপ্লবী না হাতি! পাতি-বিপ্লবী। ওকে নিয়ে আপাতত মাথাব্যথা নেই। ডাকু ইসমাইল ধরা পড়েছে, এতই হইচই পড়ে যাবে। তাছাড়া আমি বড্ড টায়ার্ড।

বলে হাই তুললেন। চলুন, থানায় গিয়ে আপনার বক্তব্য শুনব— ডিটেল্‌স্‌ই শুনব।

কর্নেল বললেন, কিন্তু এখানে লোক থাকা দরকার। দরবেশের ডেডবডিটা পোঁতা আছে। একদঙ্গল শকুন ওত পেতে রয়েছে। ভোরে ওরা হানা দেবে।

ধরণীবাবু থাকুন। কনস্টেবলরা রইল। বংকুবিহারী বললেন। ধরণীবাবু! বি কেয়ারফুল।

ধরণীবাবু বললেন, ঠিক আছে স্যার, মার্নিং-এ শকুনিবধ পর্ব শুরু হবে। ভাববেন না।

কর্নেল বংকুবিহারীকে অনুসরণ করলেন। যেতে যেতে ঘুরে অন্ধকার নিঝুম দরগার দিকে একবার তাকালেন। আবার একটা বাতাস এসেছে। বনভূমি জুড়ে অন্ধ অসহায় এক দরবেশের আত্মা ফিসফিসিয়ে ডাকছে, চুল্লু! চুল্লু!....

BanglaBook.org

বেড়ালের চোখ

কর্নেলের জার্নাল থেকে

এপ্রিলের সেই বিকেলে একটা ক্যাকটাসের প্রতীক্ষায় ছিলুম। তিনটে নাগাদ সেটা পৌঁছুনোর কথা। এদিকে চারটে বাজতে চলল।

এ ধরনের প্রতীক্ষা আমার কাছে অসহ্য। পারিজাত নার্শারিতে ফোন করার জন্য রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছি, ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল। দ্রুত সাড়া দিলুম। তারপর কোনো মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি।'

'শুনুন। পরিতোষদাদু— মানে পরিতোষ দত্ত আপনাকে এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। খুব জরুরি দরকার।'

অবাক হয়ে বললুম, 'পরিতোষ দত্ত? এ নামে তো কাকেও চিনি না।'

'নিশ্চয় চেনেন। আপনার নেমকার্ড দিয়ে তিনি আমাকে বাইরে কোথাও থেকে চুপিচুপি ফোন করতে বললেন। শুনুন! আমাকে পরিতোষদাদু বলেছেন, কর্নেলসাহেব এখানকার ঠিকানা জানেন না। আমি যেন জানিয়ে দিই। বরানগরে গঙ্গার ধারে বাড়িটার নাম বিপ্লবী নিকেতন। ডানলপ ব্রিজ পেরিয়ে সেন্ট্রাল সেরামিক রিসার্চ সেন্টারের পাশের গলি। কাকেও জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দেবে। ছাড়ছি।'

'এক মিনিট, আপনি কে?'

'বিপ্লবী নিকেতনে চাকরি করি।'

'নাম বলুন প্লিজ।'

'ঝর্ণা দাশ। আপনি কিন্তু শিগগির চলে আসুন।'...

লাইন কেটে গেল। ঝর্ণা দাশের কথার মধ্যে আবছা কোলাহল আর গাড়ির হর্নের শব্দ ভেসে আসছিল। বোঝা যায়, বাজার এলাকা থেকে ফোন করছেন। হয়তো কোনো দোকান কিংবা পাবলিক বুথ থেকে।

কিন্তু এ এক উটকো উৎপাত। কিছুতেই পরিতোষ দত্তকে আমার মনে পড়ল না, যাঁকে আমি নেমকার্ড দিয়েছিলুম এবং যিনি থাকেন 'বিপ্লবী নিকেতন' নামে একটি বাড়িতে।

বাড়ির নাম শুনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবাসন মনে হলো। মোটামুটি বড় আবাসন তো বটেই। কারণ ঝর্ণা দাশ নামে এক মহিলা সেখানে চাকরি করেন। সমবায় আবাসন হতেও পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, কোনো এক পরিতোষ দত্ত আমাকে ফোন করতে বলেছেন 'বাইরে কোথাও থেকে চুপিচুপি'। তার মানে, আবাসন অফিস থেকে ফোন করলে দ্বিতীয় পক্ষ জেনে যেতে পারে।

'দ্বিতীয় পক্ষ?'

নিজের সিদ্ধান্ত নিজের কাছেই অদ্ভুত মনে হলো। চুরুট ধরিয়ে ভাবতে থাকলুম কী করা উচিত। একটু পরে মনে হলো, এটা কোনো ফাঁদ নয় তো? আমার জীবনে যত বন্ধু, তত শত্রু।

টেলিফোন গাইড তুলে নিলুম। বিপ্লবী নিকেতন' খুঁজে বের করা যাবে কিনা জানি না। হয়তো ফোন আছে অন্য কোনো নামে। তবু চেষ্টা করা যাক।

এইসময় ডোরবেল বাজল। তারপর ষষ্ঠীচরণ এসে সহাস্যে ঘোষণা করল, 'বাবামশাইয়ের ক্যাকটাস এসে গেছে।'

পারিজাত নার্শারির মালিক স্বয়ং চণ্ডীচরণ পাঠক থলে হাতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'সারা পথ জ্যাম সার! বেরিয়েছি আড়াইটেতে। পৌঁছলুম সাড়ে চারটেতে। আপনার শূন্যোদ্যানে গিয়ে কনেবউয়ের ঘোমটা খুলব। বড় লাজুক। বুঝলেন তো?'

সুরসিক পাঠকমশাইয়ের সঙ্গে তখনই ছাদের বাগানে চলে গেলুম। তারপর ভুলে গেলুম পরিতোষ দত্তের কথা।...

রাতে এবং পরদিন সকালে ছাদের উদ্যান-পরিচর্যার সময় পরিতোষ দত্তের ব্যাপারটা নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামাইনি, তা নয়। কিন্তু কেন যেন উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। কত লোকের সঙ্গে কত জায়গায় পরিচয় হয়েছে এবং নেমকার্ড দিয়েছি। এ ভদ্রলোক তাঁদেরই একজন। দেখা যাক। গরজ থাকলে আবার ঝর্ণা দাশকে দিয়ে তিনি যোগাযোগ করবেন। বোঝাই তো যাচ্ছে, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ— আমার চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি। ঝর্ণা তাঁকে দাদু বলেন। তাছাড়া তিনি নিজে ফোন করতে পারেননি, কাজেই সম্ভবত শয্যাশায়ী কিংবা তত চলাফেরা করতে পারেন না।

বেলা দশটায় খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে আবার একটা চুরুট ধরিয়েছি, টেলিফোন বাজল। সাড়া দিতেই লালবাজার থেকে ডি সি ডি ডি-ওয়ান, আমার স্নেহভাজন অরিজিৎ লাহিড়ীর সম্ভাষণ শুনতে পেলুম। 'মর্নিং বস্। একটু বিরক্ত করছি।'

বললুম, 'ডার্লিং! তুমি বিরক্ত করলে বিপন্ন বোধ করি।'

'আপনি অলরেডি বিপন্ন কর্নেল! আপনাকে পুলিশ ফাঁসাবে। নরেশ ভদ্র যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন এস আই থাকছেন। বরানগর থানার রাধানাথ পালিত।'

boiRboi.blogspot.com

'বরানগর! উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। 'অরিজিৎ! খুনখারাপি নাকি?

'হ্যাঁ। ছাড়ছি বস্। উইশ ইউ গুড লাক।'...

রিসিভার রেখে আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম। কে খুন হয়েছে না জেনেও অপরাধবোধ আমাকে বিব্রত করছিল। ক্যাকটাসটা এসে না পড়লে হয়তো অভ্যাসবশে শেয়াবধি বরানগর ছুটে যেতুম। ক্যাকটাসটা দেখছি বড্ড অলক্ষুণে।

আধঘণ্টার মধ্যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নরেশ ভদ্র এবং সেই রাধানাথ পালিত এসে গেলেন। রাধানাথ বয়সে তরুণ। পরনে পুলিশের উর্দি। নরেশবাবু প্রৌঢ়। প্লেন ড্রেস। তিনি মাঝে মাঝে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের মতো পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলেন। তবে হালদারমশাইয়ের মতো নাটুকে নন। গম্ভীরও নন। সবসময় হাসিখুশি মানুষ।

নরেশ ভদ্র বললেন, 'আমি চুপচাপ কফি খামু। যা কইবার, আমার এই ভাইটি কইবে। নতুন চাকরিতে ঢুকছে। ঢুইক্যাই মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার।' বলে তিনি রাধানাথ পালিতের দিকে তাকালেন। 'স্টার্ট!

এস আই রাধানাথ পালিত যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই : যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃদ্ধ বয়সে আত্মীয়-পরিজনহীন অবস্থায় একা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, সরকার তাঁদের জন্য নানা জায়গায় জমি এবং বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। বরানগরে এক একর জমিতে নয়জনের জন্য নয়টি একতলা বাড়ি করা হয়েছিল। লটারি করে এবং কম দামে নয়জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এই আবাসন প্রকল্পটি দেওয়া হয়। সমবায় সমিতির ভিত্তিতে দেওয়া এই আবাসন প্রকল্পের নাম 'বিপ্লবী নিকেতন'।

প্রতি বাড়িই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘর এবং ল্যাট্রিন। আশ্রমের মতো পরিবেশ। নয়জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মধ্যে একজনের নাম পরিতোষ দত্ত। ভোরবেলায় প্রতিদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে এসে গীতাপাঠ করতেন। আজ তাঁকে কেউ বেরুতে দেখেননি বা তাঁর গীতাপাঠও শুনতে পাননি। তাই আবাসন সমিতির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ ভাদুড়ি তাঁর খোঁজ নিতে যান। বসার ঘরের দরজা খোলা ছিল। গঙ্গাপ্রসাদবাবু ভেতরে উঁকি দিয়ে চমকে ওঠেন। শোবার ঘরের দরজার কাছে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন পরিতোষবাবু। মাথার পেছনটা রক্তাক্ত। হাঁকডাক শুনে সবাই ছুটে আসেন। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খুনী সব ঘর তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজেছে। জিনিসপত্র ওলটপালট হয়ে আছে। পুলিশ আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায়। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিতোষ দত্তের লাশ মর্গে পাঠায়। কিন্তু রাধানাথ পালিত হঠাৎ লক্ষ্য করেন, আমার নেমকার্ড পরিতোষবাবুর হাতের মুঠোয় ধরা আছে। কার্ডটা ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি দেখতে পান, উল্টোপিঠে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে 'কাঠমাণ্ডু'।

যাই হোক, একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে খুন করা হয়েছে, এই খবর পেয়েই এলাকার এক রাজনৈতিক নেতা সরাসরি লালবাজার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অরিজিৎ লাহিড়ী তখনই আই ও রাধানাথবাবুকে কেসফাইল নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন।...

ষষ্ঠী ততক্ষণে কফি এনে দিয়েছিল। নরেশ ভদ্র কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, 'এবারে কর্নেলসায়েব কী কন শুনি।'

বললাম, 'আমার নেমকার্ডটা কি সঙ্গে এনেছেন রাধানাথবাবু?'

নরেশবাবু বললেন, 'এখন কেস আমাগো হাতে।' বলে তিনি বুকপকেট থেকে নেমকার্ডটা বের করে আমাকে দিলেন।

কার্ডটা বিবর্ণ এবং কিনারা ক্ষয়ে বা ফেটে গেছে। অনুমান করলুম অন্তত দশ-বারো কিংবা পনের বছর আগের কার্ড। তারপর উল্টোপিঠের লেখাটা দেখতে দেখতে বললুম, 'কাঠমাণ্ডু নয়। মনে হচ্ছে কাঠমান্টু।'

নরেশ ভদ্র বললেন, 'অ্যাঁ? কাঠমান্টু? মান্টু ক্যান?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতির অন্ধকার অংশে আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল পরিতোষ দত্তের কথা। হ্যাঁ— বছর পনের আগে ওড়িশার জঙ্গলে আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তখন পরিতোষবাবু কাঠের কারবার করতেন। গঞ্জাম জেলার বহরমপুর শহরে কাঠের বাজারকে বলা হতো কাঠমান্টু। সম্ভবত ঝর্ণা দাশকে তিনি এই কথাটিও বলতে বলেছিলেন আমাকে, যাতে আমি তাঁকে চিনতে পারি। বহরমপুরের কাঠমান্টুতে তাঁর কাঠগোলা ছিল।

কিন্তু তিনি যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, সে-কথা আমাকে বলেননি।

নরেশবাবু হাসলেন। 'কর্নেলসায়েবের মুখ বলতাছে, দা মিস্ট্রি ইজ সলভ্‌ড্‌।'

বললুম, 'নরেশবাবু! মিস্ট্রি সলভ্‌ড্‌ হয়নি। বরং প্যাঁচালো হয়ে গেল। কাঠমান্টু ওড়িয়া শব্দ। আসলে হিন্দি মাণ্ডি শব্দের মানে বাজার। শব্দটা নেপালে গিয়ে হয়েছে মাণ্ডু। কাঠমাণ্ডু। আর ওড়িয়া ভাষায় ওটা দাঁড়িয়েছে মান্টু। কাঠমান্টু মানে কাঠের বাজার।'

নরেশবাবু বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু আপনার নেমকার্ডের উল্টোপিঠে ভিকটিম কাঠের বাজার বসাইলেন ক্যান?'

'সেটা বুঝতে হলে আমাকে ঘটনাস্থলে যেতে হয়।' বলে উঠে দাঁড়ালুম।

নরেশ ভদ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওঠ হে রাধানাথ! যা কইছিলাম, মিলল তো?'

বিপ্লবী নিকেতনে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল। সারাপথ আমি চুপচাপ বসে পনের বছর আগে পরিতোষ দত্ত নামক এক কাঠব্যবসায়ীর

banglaidownload.com

সঙ্গে আলাপের স্মৃতিচর্চায় মগ্ন ছিলুম। কিন্তু তাঁর চেহারা আবছা থেকে যাচ্ছিল। শুধু একটা ব্যাপার স্মৃতিতে ভেসে আসছিল। তিনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তবে তা নিয়ে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করিনি। এখন বুঝতে পারছি, ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর পায়ে গুলি করেছিল।

গেটের কাছে যথারীতি একটা পুলিশভ্যান্ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে একজন পুলিশ অফিসার আর জনা দুই কনস্টেবলকে দেখতে পেলুম। আমাদের দেখতে পেয়ে পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এলেন। নরেশ ভদ্র বললেন, 'এই যে কাশিমসায়েব! আপনি এখানে ট্রান্সফার হইলেন কবে?'

কাশিমসায়েব বললেন, 'প্রায় একমাস হয়ে গেল সার?'

'ভাল। কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে আপনার কাছে আশা করতে পারি!'

'না সার! এঁরা সব জেনুইন ফ্রিডম ফাইটার। সত্তর থেকে পঁচাশির মধ্যে বয়স। এ পর্যন্ত কোনো গোলমেলে বা সন্দেহজনক কাজকর্মের খবর আমাদের রেকর্ডে নেই। হ্যাঁ— বাইরে এঁদের অনেককেই সভা-টভায় বিভিন্ন ক্লাব ডেকে নিয়ে যেত। সেটা স্বাভাবিক। বাইরের অনেক লোক মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসত। কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা এ যাবৎ ঘটেনি।'

রাধানাথ পালিত বললেন, 'আটজন আবাসিকের স্টেটমেন্ট আমি সকালেই নিয়েছি। কারো কথায় সন্দেহযোগ্য কিছু পাইনি।'

কাশিমসায়েব বললেন, 'সমস্যা হলো, এঁরা কোনো দারোয়ান বা সিকিউরিটির লোক রাখেননি। রাত দশটায় গেটে ভেতর থেকে তালা এঁটে দেন চেয়ারম্যান মিঃ ভাদুড়ি। কোঅপারেটিভ হাউসিং। তাই নামেই একটা অফিস আছে। ওই ছোট্ট ঘরটাতে। একজন মাত্র ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট। ঝর্ণা দাশ নামে একটি মেয়ে। সে সকাল দশটায় আসে। পাঁচটায় চলে যায়। সেক্রেটারির নাম ভোলানাথ রায়। তিনিও ফ্রিডম ফাইটার এবং আবাসিক। ওই বাড়িটাতে থাকেন। ক্যাশিয়ার গোবিন্দবাবুও তা-ই। তিনি থাকেন ওই শেষদিকের বাড়িতে। খাতাপত্র এবং অডিট রিপোর্ট চেক করেছি। সব অলরাইট।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ঝর্ণা দাশ আজ আসেননি?'

কাশিমসায়েব আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। এতক্ষণে নরেশ ভদ্র আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কাশিমসায়েব অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই কর্নেলসায়েব? নমস্কার সার! আপনার কথা আমি শুনেছি। পরিতোষবাবুকে তো আপনি চিনতেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'ঝর্ণা দাশ কোথায়?

'এসেছিলেন। কান্নাকাটি করছিলেন। চেয়ারম্যান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'আপনারা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

রাধানাথ পালিত বললেন, 'করেছিলুম। কন্নার চোটে অস্থির। জোরে মাথা নেড়ে বলছিল, সে কিছুই জানে না। কাল বিকেলে পরিতোষবাবু তাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিলেন। ওষুধ এনে দিয়ে সে বাড়ি চলে গিয়েছিল।'

'তার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন।'

নরেশবাবু বললেন, 'কেসফাইল আমার হাতে। সব ঠিকানা নেওয়া হয়েছে। মানে, আগে এই ভদ্রলোকেরা কে কোথায় ছিলেন, সে-সব ঠিকানাও রাধানাথ যোগাড় করেছে। আপনি পেয়ে যাবেন। এখন চলুন। ভিকটিমের ঘরে যাওয়া যাক। কাশিমসায়েব! দরজা লক করা থাকলে খুলে দেবেন, চলুন।'

পরিতোষবাবুর বাড়িটা পশ্চিমদিকে শেষ প্রান্তে। বাড়ির সামনে তরুণ গাছপালা আর ফুলের বাগান। ভদ্রলোকের প্রকৃতিপ্রেম ছিল। মনে পড়ে গেল। শুধু এটাই অদ্ভুত, একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ওড়িশায় কাঠের কারবার করতেন!

দরজায় হ্যান্ডকাফ আঁটা ছিল। কাশিমসায়েব খুলে দিলেন। বসার ঘরে ঢুকে দেখতে পেলুম, একটা বইয়ের র‍্যাক থেকে বইগুলো তছনছ করা হয়েছে। জানালাগুলো বন্ধ। শোবার ঘরের দরজার ওধারে মেঝেয় খানিকটা রক্তের ছাপ। বিছানা ওলটানো। বালিশ নিচে পড়ে আছে। ঘরে কোনো আলমারি নেই। একটা পুরনো তোরঙ্গের তালা ভেঙে জামাকাপড় আর কিছু কাগজপত্র বের করে খুনী তল্লাশ চালিয়েছে। কগজপত্রগুলো বেশিরভাগই নানা সংঘের দেওয়া মানপত্র। তার সঙ্গে কিছু চিঠি। চিঠিগুলোতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম। বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের লেখা নিছক কুশল বিনিময়। দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙানো আছে। সেগুলো ঠিকঠাক আছে। গান্ধীজি, নেহরু, নেতাজি এবং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রন্নাঘর, স্নানঘর এবং ল্যাট্রিনেও খুনীর তল্লাশের চিহ্ন স্পষ্ট। বেরিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার জন্য একটা দরজা পরিতোষবাবুর বাড়ির পেছনেই আছে। সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে রাধানাথবাবু বললেন, 'চেয়ারম্যান এবং আরও কজন আবাসিক বলেছেন, দরজাটা ভেজানো ছিল। তার মানে খুনী ওই পথেই পালিয়েছে।'

নরেশবাবু বললেন, 'কিন্তু ঢুকছিল কী ভাবে? কম্পাউন্ড ওয়ালের ওপর তো দেখি কাঁটাতারের বেড়া।'

কাশিমসায়েব আঙুল তুলে গঙ্গার দিকে পাঁচিলের বাইরে একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, 'ওই গাছের একটা ডাল থেকে পা বাড়ালে কাঁটাতারের বেড়া পেরুনো যায়। আমি দেখেছি। পাঁচিলের ওপর একটা ঘষটানো দাগ আছে।'

রাধানাথ পলিত সায় দিলেন। নরেশ ভদ্র বললেন, 'কর্নেলসায়েব দেখবেন নাকি?'

বললুম, 'নাহ্। আমাকে এবার ঝর্ণার ঠিকানাটা দিন।'

boiRboi.blogspot.com

'ওনাগো কিছু জিগাইবেন না?'

'আপনারা স্টেটমেন্ট নিয়েছেন, সেই যথেষ্ট।'...

ঝর্ণার বাড়ি বাগবাজার এলাকায়। নরেশ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর জিপে চেপে ঠিকানাটা খুঁজে বের করলুম। কিন্তু ঝর্ণা বাড়িতে ছিল না। তার মা বললেন, 'ঝর্ণা কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে।'

অগত্যা বাড়ি ফিরতে হলো। নরেশবাবু আমাকে ইলিয়ট রোডে আমার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁকে পরিতোষবাবুর লাশ সম্পর্কে মর্গের ফাইনাল রিপোর্টে কী থাকে তা ফোনে জানাতে বললুম।

প্রায় তিনটে বাজে। তিনতলায় আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিয়ে ষষ্ঠীচরণ আস্তে বলল, 'একটা মেয়েছেলে এসে বসে আছে। এত করে বললুম, কথা শুনল না। জোর করে ঢুকে পড়ল। খুব কন্নাকাটি করেছে মনে হলো।'

ড্রয়িংরুমের সোফায় মাত্র সতের-আঠারো বছর বয়সী একটি মেয়ে বসে ছিল। আমাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি কি কর্নেলসায়েব? আমার নাম ঝর্ণা। কাল বিকেলে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'একটু বসো। আমি ঝটপট খাওয়া সেরে নিই।'

খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বলে অভ্যাসমতো সামান্যই খেলুম। তারপর ষষ্ঠীকে কফি পাঠাতে বলে ড্রয়িংরুমে গেলুম।

ঝর্ণা রুমালে চোখ মুছে বলল, 'আমি আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

'কাঠমান্টু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে সে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না সামলে নিল। তারপর বলল, 'কাল বিকেলে আপনাকে ফোন করে গিয়ে পরিতোষদাদুকে বললুম। উনি আমাকে একখানা বই দিয়ে বললেন, যদি আমার বরাতে কিছু ঘটে, তুমি এই বইখানা কর্নেলসায়েবকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

চটি বইটার নাম 'জনৈক বিপ্লবীর আত্মচরিত'। লেখকের নাম পরিতোষ দত্ত। বইটা গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত। পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখি, এক টুকরো কাগজ ভেতরের পাতা থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে। সেই পাতা উল্টে দেখলুম, ডটপেনে লেখা আছে :

"১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় সত্যকাম রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কাঁথিতে ঝড়বৃষ্টির রাত্রে ট্রেজারি লুণ্ঠনের সময় সে আমার সঙ্গে ছিল। তার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সম্প্রতি বিপ্লবী নিকেতনে যাকে সত্যকাম রায় নামে দেখলাম, সে কখনও সেই সত্যকাম নয়। অথচ

সরকারি তাম্রফলক দেখেছি তার ঘরে। আমি তাকে চার্জ করেছিলাম। সে বলল, একই নামে কি দুজন বিপ্লবী থাকতে পারে না? এদিকে গঙ্গাপ্রসাদ ভাদুড়ি একদিন কথায়-কথায় বলছিলেন, সত্যকামবাবু কাঁথি ট্রেজারি লুণ্ঠনের মূল নায়ক। আমি মুখ বুজে থাকলাম। তাম্রপত্রে এই ঘটনার ঈষৎ উল্লেখ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লোকটি জাল সত্যকাম। নিশ্চয় সে সত্যকামের তাম্রফলক চুরি করেছিল। আমার এই আত্মজীবনীর একটি কপি এনে বাকি কপিগুলি প্রকাশক আমার দূরসম্পর্কের নাতি অজয়প্রকাশের কাছে গোপনে রেখে দিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর তাকে বইটি বাজারে ছাড়তে বলেছি।"

এই পাতায় ছাপা হরফে কাঁথি ট্রেজারি লুঠের বিস্তারিত বিবরণ আছে। কিন্তু এই টুকরো কাগজে পরিতোষবাবুর আঁকাবাঁকা হরফে লেখা ওই কথাগুলোই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

যথেষ্ট। কিন্তু শুধু এই কারণেই কি জাল সত্যকাম তাঁকে খুন করে ফেলবে? নাহ্। খট্‌কা থেকে যাচ্ছে।

ঝর্ণাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি বইটা কি পড়েছ?'

সে বলল, 'কাল রাত্রে পড়েছি।'

'এই কাগজটা?'

'পড়েছি। সত্যকাম রায় বিপ্লবী নিকেতনে আছেন। বদমেজাজি লোক। কারও সঙ্গে তত মেলামেশা করেন না।'

'কিন্তু তুমি পুলিশকে আজ এসব কথা জানাওনি কেন?'

'ভয় পেয়েছিলুম। আমি মোটে মাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাই। আমরা খুব গরিব। মাধ্যমিক পাশ করতে পারিনি। এম এল এ বাবুকে ধরে এই চাকরিটা পেয়েছি।'

'তুমি আবার অফিস যাচ্ছ কবে থেকে?'

'সেক্রেটারি দাদু কাল থেকে যেতে বলেছেন।'

'ঠিক আছে। তুমি কাল থেকে যথারীতি অফিসে যাবে। ঘুণাক্ষরে এ সব কথা কাকেও বলবে না। আর শোনো! দরকার হলে আমাকে ফোন করবে। তোমাকে নেমকার্ড দিচ্ছি না। নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি।'...

ঝর্ণা চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে নরেশ ভদ্র টেলিফোনে জানালেন, মর্গের ফাইনাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভোঁতা কিন্তু একটু সূচালো জিনিস দিয়ে পরপর দু'বার পরিতোষবাবুর মাথার পেছনে আঘাত করার ফলে মৃত্যু হয়েছে।

ভোঁতা। কিন্তু একটু সূচলো জিনিস! সেটা কী হতে পারে?

নরেশবাবুকে আমি কাল সকাল দশটায় আসতে বললুম। তারপর কফি খেয়ে সত্যকাম রায়ের আগের ঠিকানা টালিগঞ্জ এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম।

bengali-boi.blogspot.com

একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে দোতলা বাড়ি। নিচের তলার ভাড়াটে অধীর গাঙ্গুলি বললেন, 'সত্যকামবাবুকে আমি পাশের একটা ঘর সাবলেট করেছিলুম। ক'মাস আগে উনি ঘর ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছেন জানি না।'

অনেক কথাবার্তা বলেও নতুন কোনো তথ্য জানা গেল না। অধীরবাবু তাঁকে ফ্রিডম ফাইটার বলে জানতেন। দেয়ালে তাম্রফলক দেখেছিলেন। সরকার থেকে মাসে এক হাজার টাকা পেনসন পেতেন।

বাড়ি ফিরে পরিতোষবাবুর আত্মজীবনী পড়তে বসলুম। কাঁথি ট্রেজারি লুঠের বিবরণ পড়তে পড়তে একখানে থমকে যেতে হলো। পরিতোষবাবু লিখেছেন, "ট্রেজারি লুণ্ঠনে নগদ টাকা ছাড়াও অনেকগুলি স্বর্ণপিণ্ড হস্তগত হয়েছিল। সেগুলি পরে আমাদের কেন্দ্রীয় কোষাগারে গোপনে রাখা হয়। কিন্তু নভেম্বর মাসে পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়ে স্বর্ণপিণ্ডগুলি উদ্ধার করে। আমরা তখন নানা অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলাম। তবে সত্যের খাতিরে বলছি, একটি কৌটায় একখণ্ড বহুমূল্য রত্ন ছিল। সেটি আমি কৌতূহলবশত নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাত্রে কৌটা খুলে দেখতাম, রত্ন থেকে নীল আভা ঠিকরে পড়ছে। সম্ভবত এটি বৈদূর্যমণি। আমার কোষ্ঠি অনুসারে বৈদূর্যমণি আমার জীবনে হিতকারী রত্ন। সত্যই তাই। পাঁচ বৎসর পরে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলো। আমি ওড়িশার বহরমপুরে কাষ্ঠব্যবসায়ী নিত্যানন্দ জেনার বাড়িতে ছিলাম। তিনিই আমাকে সারাণ্ডা অরণ্যে ঠিকাদারের কাজে সঙ্গী করেছিলেন। ক্রমে আর্থিক সচ্ছলতা আসার পর আমি স্বাবলম্বী হলাম। বৈদূর্যমণিটি কিন্তু আমি বিক্রয় করিনি। গোপনে এমনভাবে তা রেখেছিলাম, কারও সাধ্য ছিল না তা খুঁজে বের করতে পারে। রত্নটি অদ্যাবধি আমার কাছে আছে। তারই গুণে লটারিতে আমার নাম উঠেছিল এবং বিপ্লবী নিকেতনে বাকি জীবনের জন্য ধর্মকর্মে মন দিয়ে শান্তিতে কাটানোর সুযোগ পেয়েছি।...

এ পর্যন্ত পড়েই বইটা বন্ধ করলুম। প্রথমেই সন্দেহ হলো, ঝর্ণা দাশ জাল সত্যকামের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেনি তো? মুখ আর হাবভাব দেখে মানুষের কিছু বোঝা যায় না।

ঘড়ি দেখলুম, রাত নটা বাজে। অরিজিৎকে টেলিফোন করলুম তার বাড়িতে। সাড়া দিয়ে সে বলল, 'বলুন বস্!'

'অরিজিৎ! আজ রাতেই দুটি বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশ করা দরকার।'

'কী ব্যাপার?'

'একটা বৈদূর্যমণি পরিতোষবাবুকে খুনের কারণ।'

'বলেন কী? কিন্তু কোথায় হানা দিতে বলছেন?'

'একই সঙ্গে ঝর্ণা দাশের বাড়ি এবং বিপ্লবী নিকেতনে সত্যকাম রায়ের বাড়িতে। জিনিসটা না পেলেও দুজনকে জেরা করার জন্য আটক করা দরকার। দিস ইজ আর্জেন্ট।'

'ও কে বস। কিন্তু দেখবেন একজন ফ্রিডম ফাইটারকে ধরে টানাটানি করে ফেঁসে না যাই।'

'নাহ্ অরিজিৎ! ভদ্রলোক জাল সত্যকাম রায়।'

'অ্যাঁ? এত সব ব্যাপার?'

'দেরি নয় কিন্তু। রত্নটা না পাওয়া গেলেও জাল সত্যকাম রায় একটা বড় কেস হবে।'

'ঠিক আছে।...

সকালে ফোন এল অরিজিৎ লহিড়ীর। রত্নটত্ন কিছু পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক চাপে ঝর্ণাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেরা করে ঝর্ণার কাছে কিছু জানা যায়নি। ভীষণ কান্নাকাটি করেছে শুধু। তবে সত্যকামের পরিচয় জানা গেছে দাগী ফেরারিদের তালিকা এবং ছবি থেকে। তার নাম ভানু মহন্ত। বাড়ি মেদিনীপুরে। ব্রিটিশ আমলে পুলিশের চর ছিল। আগস্ট বিপ্লবের সময় পুলিশকে সাহায্য করেছিল। জাল বিপ্লবী সেজে সে বিপ্লবীদের দলে ভিড়েছিল কিছুকাল।

বুঝলুম, তা হলে তার পক্ষে পরিতোষবাবুর হাতানো রত্নের খবর জানার একটা সুযোগ ছিল।

কিছুক্ষণ পরে নরেশ ভদ্র এলেন। 'কী যে করেন কর্নেলসায়েব! খামোকা মাইয়াডারে লইয়া টানাটানি। খালি কান্দে আর কান্দে।'

হাসতে হাসতে বললুম, 'তাহলে ঝর্ণার কান্নায় রত্ন ঝরল না?'

'নাহ্। তবে ভানু মহন্তরে এতদিনে খুঁইজা পাইলাম। আপনার ক্রেডিট।'

'চলুন। শেষ চেষ্টা করা যাক।'

'যাবেন কই?'

'বিপ্লবী নিকেতনে।'...

bengalidownload.com

সেখানে গিয়ে দেখি সাতজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জরুরি বৈঠক চলেছে অফিসঘরে। আমাদের দেখে ওঁরা খুব ঘটা করে অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারম্যান উত্তেজিতভাবে বললেন, 'সত্যকামের ওপর আমার বরাবর একটু সন্দেহ ছিল। তাকে আমি শেষবার দেখেছিলুম বারাসতে একটা সভায়। সে প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা। তারপর দেখলুম এখানে। অন্যরকম চেহারা। আসল সত্যকাম ছিল রোগা বেঁটে। আর এই জাল সত্যকাম বেঁটে হলেও রোগা নয়। চুলও তত সাদা নয়। এ কী করে হয়?'

এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে ফাইল ঘাঁটছিলেন। ফ্যানের হাওয়ায় কাগজপত্র উড়ে যাচ্ছে দেখে তিনি পেপারওয়েট খুঁজতে থাকলেন। বললেন, 'মলোচ্ছাই! সেই নতুন পেপারওয়েটটা গেল কোথায়?'

অমনি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'মোটা এবং মাথার দিকটা একটু সূচালো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলে উনি আমার দিকে তাকালেন।

বললুম, 'ওটা সম্ভবত গঙ্গায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ ওটাই ছিল মার্ডার উইপন।'

সবাই নড়ে উঠলেন। তারপর চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, 'তিনটে ভারী পেপারওয়েট ছিল। সেগুলো গোল আর চ্যাপ্টা। কদিন আগে একটা পেপারওয়েট কেনা হয়েছিল। ডিমালো গড়নের এবং বেশ ভারী। নেই সেটা?'

সেই ভদ্রলোক বললেন, 'নাহ্। ঝর্ণা চারটে পেপারওয়েট এই ড্রয়ারেই রাখত দেখেছি।'

নরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেলুম। বললুম, 'চলুন। পরিতোষবাবুর ঘরটা আবার দেখে যাই। দৈবাৎ বেড়ালের চোখ না দেখতে পাই, লেজের ডগাটুকুই যথেষ্ট। বৈদূর্যমণিকে ইংরেজিতে বলে ক্যাট'স আই।'

দরজার কড়ায় যথারীতি হাতকড়া আঁটা ছিল। নরেশবাবু খুলে দিয়ে বললেন, 'রত্ন-টত্ন আর থাকার কথা নয়। মহন্ত মহা ধড়িবাজ ঘুঘু। আর বেড়ালের চোখ কইলেন। মহন্ত কিন্তু নিজেই বেড়ালচোখো।'

পরিতোষবাবুর ঘর তেমনি লণ্ডভণ্ড অবস্থায় থেকে গেছে। দেয়ালে লটকানো বরেণ্য দেশনেতাদের ছবি। গান্ধীজি, নেহরু, নেতাজি এবং রবীন্দ্রনাথ। ভানু মহন্ত কেন কে জানে ছবিগুলোর দিকে নজর দেয়নি। গান্ধীজি এবং নেহরুর ছবি খুলে নেতাজির ছবি খোলার চেষ্টা করলুম। খোলা যাচ্ছিল না। নিচের দিকটা শক্ত হয়ে আটকানো আছে। জোরে টান দিতেই ছবিটা প্রায় উপড়ে এল। নিচের ফ্রেমটা দেয়ালে আটকে থাকল। কিন্তু তখনই চৌকো একটা গর্তে একটুকরো ইট ঢোকানো আছে দেখা গেল। ইটটা টেনে বের করলুম। তারপর ভেতর থেকে খুদে একটা কৌটো বেরুলো। খবরের কাগজে মোড়া সেটা। মোড়ক খুলে দেখি, লাল ভেলভেটে মোড়া পিসবোর্ডের কৌটো। তার ভেতর একটুকরো উজ্জ্বল ধাতু। নীল ছটা ঠিকরে পড়ছিল।

নরেশবাবু বললেন, 'আপনি জানতেন? কী কাণ্ড!'

বললুম, 'নাহ্। তবে আগস্ট বিপ্লব এবং নেতাজি এই দুটো কথা যেন একই কথার দুই পিঠ। তাই চান্সটা ছিল। গতকাল কে জানে কেন, নেতাজির ছবিটা আমার বেশি করে চোখে পড়েছিল।'

নরেশ ভদ্র হেসে উঠলেন। 'এরেই কয় পিওর ম্যাথ। বিশুদ্ধ গণিত।'...

মৃতেরা কথা বলে না

চন্দ্রনাথ দেববর্মন একটা ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন। প্রিন্টটা ঠিক ওরিজিনাল নয়। তবে উজ্জ্বল এবং রঙিন। ছবির শুরুটা এমন স্বাভাবিক আর শালীন যে বোঝা যায় না শেষাবধি কিছু পাওয়া যাবে। একটা সেতুর দৃশ্য। পেছনে পাহাড়ি জঙ্গল। সেতুর ওপর পেছন ফিরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাত তুলে ঘড়ি দেখছে। বিরক্তিকর। রঙ্গনাথন ভুল করেছে, নাকি ইচ্ছে করেই তাঁকে ঠকিয়েছে? লোকটা ধড়িবাজ। হংকংয়ের কারবারি। মাসে অন্তত দু'বার কলকাতা আসে। এলেই একটা করে ক্যাসেট দেয় এবং ফেরার সময় চেয়ে নিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের বয়স ষাট পেরিয়েছে। বেঁটে, শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। মোঙ্গলোয়েড চেহারা। মাকুন্দে মুক। যৌবনে পুনঃপুনঃ প্রেমে ব্যর্থ এবং দু' দফা লিভ টুগেদার করেছেন। এও ব্যর্থতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সহবাসে এমন কিছু থাকতেও পারে, যা কোনও নারীই সহ্য করতে পারে না। এই তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু ক্রমশ রক্তমাংসের নারীর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ জন্মে গিয়েছিল। সে কারণে বাকি জীবন একা কাটাতে চেয়েছিলেন। কাটাচ্ছেনও তাই। তবু অভ্যাস। এখনও ছায়ায় কায়ার উত্তাপ পেতে চান।

ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর মালিক চন্দ্রনাথ। এটা তাঁর নতুন কারবার। এই ব্যুরো কোনও কোম্পানির জোড়ুড় নয়। একেবারে স্বাধীন। কম লোক দিয়ে অনেক বেশি কামানো যায়। ছোট ও মাঝারি কনজ্যুমার গুডস প্রস্তুতকারীরা তাঁর মক্কেল। কোনো মক্কেলের বাজার পাওয়া পণ্যের চাহিদা হঠাৎ পড়তে শুরু করেছে কেন, উপাদানে গণ্ডগোল ঘটছে এবং কেউ বা কারা এটা ঘটাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের কোনও নেতার কারচুপি, নাকি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে ঢুকেছে, কিংবা ডিস্ট্রিবিউটারের বদমাইশি— এসব ছাড়াও নতুন কোনও পণ্যের চাহিদার বাজার কেমন, ইত্যাদি অংসখ্য তথ্য চন্দ্রনাথের ব্যুরোকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রয়োজনে ডিকেটটিভ এজেন্সির সাহায্য নিতে হয়। আজকার ডিটেকটিভ এজেন্সিরও অভাব নেই। চন্দ্রনাথের সম্পর্ক তিনটির সঙ্গে, যাদের নাম দেখে কিছু বোঝা যাবে না। কেয়ারস্, ডিয়ার এসকর্ট এবং ফিনিক্স।

একটা বাস এসে থামল সেতুতে। এক তরুণী নামল। চন্দ্রনাথ হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালেন। বাসটা চলে গেলেই দু'জনে পরস্পরের হাত

pathagar.net

ধরল। মার্কিন উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না চন্দ্রনাথের। বছর তিনেক আমেরিকায় ছিলেন। অনেক পোড় খেয়েছেন এবং অনেক ঘাটের জল।

তরুণ-তরুণী কথা বলতে বলতে হাঁটছে। জলের ধারে একটা পার্ক। পার্ক জনহীন নয়। কমবয়সীরা খেলা করছে। বিরক্তিকর! অন্তত একটি চুমুও—

টেলিফোন বাজল। ফোন তুলতে গিয়ে দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল। রাত দশটা তিরিশ। সাড়া দিলেন অভ্যাসমতো, ইয়া।

মিঃ দেববর্মন? কোনও নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। স্মার্ট ইংরেজি। আপনি কি একা?

চন্দ্রনাথ একটু সতর্ক হয়ে বললেন, হ্যাঁ। আপনি কে?

আপনাকে আমি চিনি।

তাতে কী?

এই যথেষ্ট নয় কি মিঃ দেববর্মন?

কী চান আপনি?

একটু গল্প করতে। না, না মিঃ দেববর্মন। এটা জরুরি।

কেন? বলে পর্দায় চোখ বুলিয়ে নিলেন চন্দ্রনাথ, কিছু মিস করছেন কি না। নাহ্। তরুণ-তরুণী পার্কের শেষ প্রান্ত দিয়ে হেঁটে চলেছে। কখনও ক্লোজ শট, কখনও লং। মৃদু আবহসঙ্গীত এবং পাখির ডাক এবং প্রকৃতি।

মিঃ দেববর্মন! আপনি এখন কি করছেন?

উত্তেজনামেশা কৌতূহল চন্দ্রনাথকে ফোন রাখতে দিল না। একটু হাসির সঙ্গে বললেন, এটা কি কোনও ফাঁদ?

না, না মিঃ দেববর্মন! আমি আপনার শুভাকাঙ্খী।

ঠিক আছে। আনেক ফাঁদ আমি দেখেছি। বলুন।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিন প্লিজ!

আমি টি ভি দেখছি এবং হুইস্কি খাচ্ছি। আপনার কোনও প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব না। বুঝলেন?

মিঃ দেববর্মন! আপনার কি আগ্নেয়াস্ত্র আছে?

আছে।

দরজা ঠিকমতো লক করা আছে?

আছে। কিন্তু কেন এসব কথা? আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন? কে আপনি?

আপনি উত্তেজিত। শান্ত হোন। আর হাতের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি রাখুন।

তরুণ-তরুণী জলের ধারে হাঁটছে। গতি পাহাড়টার দিকে। আছড়ে পড়া জলের শব্দ এবং আবহসঙ্গীত ক্রমে জোরালো হচ্ছে। চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে

বললেন, পুলিশ দফতরে আমার লোক আছে। এখনই আপনার নাম্বার জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আর আমার টেলিফোনে টেপরেকর্ডার ফিট করা থাকে, জানেন তো?

মিঃ দেববর্মন! কেউ দরজায় নক করলেও—

হঠাৎ কথা থেমে গেল। চন্দ্রনাথ কয়েকবার উত্তেজিতভাবে হ্যালো হ্যালো করেও আর সাড়া পেলেন না। কোনও শব্দও শোনা গেল না। একটু অপেক্ষা করে ফোন রাখলেন। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দৃষ্টিতে শূন্যতা ছিল।

তরুণ-তরুণী পাহাড়ি রাস্তার চড়াইয়ে উঠছে। দূরে গাছপালার ভেতর একটা বাড়ির আভাস। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে এতক্ষণে চুম্বন।

কিন্তু চন্দ্রনাথের মনে অন্য উত্তাপ। উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের খুদে রিভলবার বের করলেন। ৬টা গুলি ভরে এগিয়ে গেলেন ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে, যেটা বাইরে যাওয়ার দরজা এবং চওড়া করিডর আছে। দরজা ঠিকমতো লক করা আছে। আইহোলে দেখলেন আলোকিত করিডর নির্জন। দু'ধারে দুটো অ্যাপার্টমেন্ট। বাঁদিকেরটা এক বাঙালি অধ্যাপক দম্পতির। ডানদিকেরটায় থাকেন এক পার্শি বৃদ্ধা মিসেস খুরশিদ এবং তাঁর অ্যাংলোইন্ডিয়ান পরিচারিকা। চন্দ্রনাথ বেডরুমে ফিরে এলেন। এখন তরুণ-তরুণী বাড়িটাতে ঢুকছে। খুব পুরনো কাঠের বাড়ি। এবার তাহলে চরম মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

নাহ্। কাট্ করে একটা রান্নাঘরের দৃশ্য। এক প্রৌঢ়া ওভেনে কিছু রান্না করছেন। বিজ্ঞাপন।

এরা এভাবেই সময় নষ্ট করে। অনেক ঘুরিয়ে তবে ঠিক জায়গায় পৌঁছায়। চন্দ্রনাথের এ বয়সে অত ঘোরপ্যাঁচ অসহ্য লাগে। সোজাসুজি সেক্সের পক্ষপাতী তিনি এবং এসব ব্যাপার পাপ বলে মনেও করেন না। শরীর আছে। কাজেই জৈবতার ধর্ম আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক দান। এত ঢাকঢাক গুড়গুড় করার মানে হয় না। অথচ এই সব ক্যাসেট যারা তৈরি করে, তারা ঝানু ব্যবসায়ী। সেক্সের সঙ্গেও বিজ্ঞাপন। তেল সাবান স্নো, কিংবা রান্নার কড়াই তার সঙ্গেও মিউজিক! অসহ্য!

কিন্তু মেয়েটি কে? কেন ওভাবে হঠাৎ টেলিফোন করে তাঁকে ভয় দেখাল? হঠাৎ থেমে গেলই বা কেন? চন্দ্রনাথ উদ্বিগ্নভাবে হুইস্কিতে চুমুক দেলেন। অটোমেটিক রিভলভারটা হাতের কাছেই বিছানায় রেখে দিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল।

পুলিশকে জানাবেন কি? তাঁর একটা সুন্দর রাত্রি খুন হয়ে গেল। সেক্সে মন বসবে বলে মনে হচ্ছে না। একটা অনুসন্ধান চলছে মনের ভেতর। কে বা কারা

bengalidownload.com

তাঁকে খুন করতে চাইবে? এ ধরনের কারবারে প্রতিপক্ষ অবশ্যই থাকে। তই বলে সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে? অবিশ্বাস্য। ব্যক্তিগত শত্রুতাও তো তাঁর কারও সঙ্গে নেই।

তরুণটিকে আগে নগ্ন করেছে তরুণী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার একটা সিগারেট ধরালেন চন্দ্রনাথ। কিন্তু আবার কাট্ এবং পোশাকের বিজ্ঞাপন।

সেই সময় টেলিফোন বাজল। চন্দ্রনাথ আস্তে টেলিফোন তুলে সাড়া দিলেন, ইয়া!

আপনি তৈরি হয়ে আছেন তো মিঃ দেববর্মন?

একই কণ্ঠস্বর। চন্দ্রনাথ বললেন, হঠাৎ ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

হ্যাঁ। আমার হাতে সিক্সরাউন্ডার। অটোমেটিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, কে বা কারা আমাকে—

আপনি নিশ্চয় জানেন।

জানি না। যতটা সম্ভব শক্ত গলায় চন্দ্রনাথ বললেন। আমি বুঝি না।

তাই বুঝি? ...একটু বিরতির পর শোনা গেল, মুখোমুখি হলে আভাস দিতে পারতাম যেটুকু আমি জানি। ফোনে তা সম্ভব নয়। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

কাছাকাছি।

একটু ভেবে নিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, আসতে চাইলে আসতে পারেন।

আমি জানি আপনি শক্তিমান মানুষ মিঃ দেববর্মন! কিন্তু—

তাহলে ছেড়ে দিন। বিরক্ত করবেন না।

ঠিক আছে। ঝুঁকি নিয়েই আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে রক্ষার দায়িত্ব আপনার।

চন্দ্রনাথ শক্ত গলায় বললেন, আসুন। হ্যাঁ, একটা কথা । আপনি গাড়িতে আসবেন, না হেঁটে আসবেন? এত রাতে সিকিউরিটি স্টাফ আপনাকে ঢুকতে দেবে না।

তা নিয়ে ভাববেন না মিঃ দেববর্মন! আমি এই হাউসিং কমপ্লেক্সের মধ্যেই আছি।

তা-ই? তাহলে আসুন।

টেলিফোন রেখে ক্যাসেট বন্ধ করলেন চন্দ্রনাথ। হুইস্কিতে আরও দুটো চুমুক দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ড্রয়িংরুমে গেলেন। হাতে রিভলভার। দরজার আইহোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দরদর করে ঘামছিলেন রাত-পোশাকের ভেতরে।

এটা তিনতলা। অটোমেটিক লিফ্‌ট আছে। সেটা এখান থেকে দেখা যায় না। বাইরের মুখোমুখি দুটো অ্যাপার্টমেন্টের পর করিডর বাঁদিকে বেঁকেছে। তারপর আবার বাঁদিকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট সবগুলোই প্রায় দেড় হাজার বর্গফুটের বেশি। শুধু চন্দ্রনাথেরটা ৯ শো বর্গফুট। কার্পেট এরিয়ার হিসেব। এটা ১৩ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট। আনলাকি থারটিন।

প্রতীক্ষা— এই ধরনের প্রতীক্ষা বড় অসহ্য। চন্দ্রনাথ আলোকিত নির্জন করিডরের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু নেশা হয়েছে। নেশা এবং উত্তেজনা তাঁর দৃষ্টিকে যেন অস্বচ্ছ করে দিচ্ছে ক্রমশ। দরজা খুলে দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কী? হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি।

লিফটের সামনে ১০ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে গরগর শব্দে মিঃ অগ্রবালের পাজি কুকুরটা গর্জন শুরু করেছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে দরজা খুলে বেরুলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মন। তিনি চিরকালের দুর্ধর্ষ লড়ুয়া...

॥ দুই ॥

ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়ার কথা বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। কিন্তু সেদিনই বিকেলে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জনসভায় ভাষণ দিতে। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সারা পথ পুলিশে ছয়লাপ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনও মাছি গলতে দেয়নি। জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের চিফ এক্সিকিউটিভ শান্তশীল দাশগুপ্ত এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়েই জ্যামে আটকে গিয়েছিল। কোম্পানির লোকাল ব্রাঞ্চের আনকোরা গাড়িতে এয়ারকন্ডিশনিং ছিল অবশ্য। নইলে এই শেষ মার্চেই আবহাওয়া যা তেজী, চামড়া ভাজা-ভাজা হয়। ড্রাইভার নেমে গিয়ে খবর আনল। অন্তত তিন ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু শান্তশীলকে আজ রাতে কলকাতা ফিরতে হবে। কারণ পরদিন সকালেই স্ত্রী মধুমিতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বহরমপুরে যেতে হবে। শ্বশুরমশাই অসুস্থ। তাঁকে নিয়ে সেদিনই যেভাবে হোক কলকাতা আনতে হবে। নার্সিংহোমে বলা আছে। কার্মব্যস্ত একজন জামাইয়ের পক্ষে এটা একটা উটকো ঝামেলা। কিন্তু উপায় নেই। প্রেম করা বিয়ে।

রাত সাড়ে আটটায় রাস্তা মুক্ত হলো। প্লেনটাও প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে বাঙ্গালোরে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে ভুবনেশ্বরে নেমে আবার যখন উড়ল, তখন রাত কাঁটায়-কাঁটায় পৌনে দশটা।

দমদমে পৌঁছে শান্তশীল একটু অবাক হয়েছিল। তার জিপসি মারুতিতে মউ(মধুমিতা) নেই। ড্রাইভার আক্রাম একা এসেছে। সে সেলাম দিয়ে সবিনয়ে জানাল, মেমসাব আসতে পারেননি। কী সব জরুরি কাজ আছে। এবং সে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে গাড়ি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে।

boiRboi.blogspot.com

সানশাইন হাউজিং কমপ্লেক্সের বি-মার্কা বাড়ির দোতলায় শান্তশীলের অ্যাপার্টমেন্ট। ওটার মালিক তার কোম্পানি। মউ দরজা খুলে বলল, এয়ারপোর্টে ফোন করেছি— অন্তত পাঁচবার। কী ব্যাপার?

তার মুখে গাম্ভীর্য ছিল। শান্তশীলের অনুমান, সেটার কারণ মউয়ের বাবার অসুখ। ভুবনেশ্বর যাওয়ার দিন থেকেই এই গাম্ভীর্য এবং অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছে শান্তশীল। এখন সে ভীষণ ক্লান্ত। অল্পকথায় দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার পর সে পোশাক না বদলেই সেলার খুলল। আগে এক চুমুক ব্র্যান্ডি।

মউ আস্তে বলল, প্রায় এগারোটা বাজে। কাল মর্নিংয়ে—

জানি। একটু সামলে উঠতে দাও।

মউ ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকে দেখছিল।

শান্তশীল বলল, কী? আবার কিছু খবর এসেছে নাকি?

নাহ্।

তোমাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মউ!

মউ ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, ও কিছু না। তুমি দেরি করো না। আমি কিচেনে যাচ্ছি।

সে চলে গেল। শান্তশীল দ্রুত ব্র্যান্ডি শেষ করে চাঙ্গা বোধ করল। পোশাক বদলে সে বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ড্রয়িংরুম সংলগ্ন বাথরুম। আরেকটা আছে বেডরুম সংলগ্ন। ড্রয়িংরুমে এবং বেডরুমে দুটো টেলিফোন আছে। বেডরুমেরটার নাম্বার একান্তই প্রাইভেট এবং ডাইরেক্টরিতে ছাপা থাকে না। কোম্পানির ব্যাপারে এটা হটলাইন বলা যায়। ড্রয়িংরুমের ফোনটা বেজে উঠতে শুনল শান্তশীল। এত রাতে কার ফোন? বহরমপুর থেকে ট্রঙ্ককল নাকি?

জ্বালাতন! জৈবকৃত্যের সময় বলেও নয়, প্রেমের দাম বড্ড বেশি আদায় করা হচ্ছে— শান্তশীল ইদানীং মউ সম্পর্কে এরকম ভাবে। অথচ মউকে ছেড়ে বাঁচবে না এমন একটা বিশ্বাসও তাকে ছুঁয়ে আছে যেন। মউকে সে সত্যিই ভালবাসে এবং মউও তাকে প্রকৃতই ভালবাসে, তা নিজের পদ্ধতি অনুসারে সে যাচাই করে নিয়েছে। তবে মউ অভিনেত্রী ছিল, গ্রুপথিয়েটার থেকে কমার্শিয়্যাল থিয়েটার এবং শেষে টেলিসিরিয়ালে চান্স পেয়ে মোটমুটি নাম করেছিল। হিন্দি ফিল্ম অফার এসেছিল। কেরিয়ারের সেই বাঁকে, জিরো আওয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই শান্তশীল তাকে আশ্চর্য দক্ষতায় করায়ত্ত করেছিল। কিংবা এটা প্রেমের চোরাবালিতে মউয়ের আকস্মিক পতন। অবশ্য শান্তশীলের পক্ষ থেকে কোনও বাধা ছিল না। অথচ মউ তাকে ছেড়ে এক পা কোথাও বাড়াতে চায়নি বা চায় না। কী অসামান্য সেই উচ্চারণ, 'বাইরে গেলে আমি নষ্ট হয়ে যাব!'

নাহ্, অভিনয় মনে হয়নি। শান্তশীলের মধ্যে মেলশোভিনিজম আছে, যা সে সাবধানে চাপা দিয়ে রাখে এবং মউয়ের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মানসিকতাসঞ্জাত আত্মসমর্পণের ঝোঁক আছে, শান্তশীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা লক্ষ্য করেছিল। আসলে শান্তশীলের উত্থান ধাপে ধাপে। অনেক ঘা খেয়ে, অনেক অপমান দাঁত চেপে সহ্য করতে করতে এবং অনেক শ্রম-বুদ্ধি-স্মার্টনেসের পরিণাম তার কেরিয়ারিস্ট জীবনের এই অবস্থান। সে নিজেকে মার্কিন ভঙ্গিতে বলে 'ইয়াপ্পি,— ইয়ং আরবান অ্যাম্বিশাস প্রোফেশনাল পার্সন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে জেনিথ ওষুধ সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহক পদে বসা কেরিয়ারিস্ট মধ্যবিত্ত যুবকের পক্ষে একসময় তো অকল্পনীয় ছিল। এখন এটা হচ্ছে। 'তরুণ রক্ত' শিল্প-বাণিজ্য মহলে এখনকার স্লোগান।

কিন্তু মউয়ের উত্থানে আছে পর পর কিছু আকস্মিকতা। সেটা স্বাভাবিক অভিনয় জগতে। হঠাৎ কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি কাজ করে। মউ অভিনয়জগতের প্রভাবশালী কিছু লোকের চোখে পড়ে গিয়েছিল। তারা এখনও কেউ কেউ পিছু ছাড়েনি। কিন্তু শান্তশীলের ঝকমকে এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাদের দমিয়ে দেয়।...

টেলিফোনের রিং বন্ধ হয়েছিল। শান্তশীল দাঁত ব্রাশ করতে করতে (খাওয়ার আগেই এত রাতে দাঁত ব্রাশ করার কারণ আজ ভুবনেশ্বরের ফাইভস্টার হোটেলে এ কাজের সময় পায়নি) পর্দার এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে দেখল, মউ টেলিফোনে কথা বলছে। কণ্ঠস্বর চাপা। তাছাড়া তখনও কোমোডে জলের কলকল শব্দ। কিছু বোঝা গেল না।

banglabook.org

শান্তশীল দাঁত ব্রাশ করে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। ভুবনেশ্বরের যে প্রান্তে তার কোম্পানির নতুন কারখানা এবং অফিস, সেখানে প্রচণ্ড ধুলো। লনের ঘাস বৃক্ষলতাকুঞ্জ ধুলোয় লাল। মার্চের শেষে জোরালো হাওয়া দূরের একটা টিলার গায়ের রাস্তা থেকে ক্রমাগত লাল ধুলো উড়িয়ে নিয়ে আসছিল। ম্যানেজার গোপাল দাস বলেছিলেন 'সাইট সিলেকশন ঠিক হয়নি। আমার বাংলোয় গেলে দেখবেন কী শোচনীয় অবস্থা! হোলি শেষ হয়নি হাঃ হাঃ হাঃ!'

তোয়ালেতে মুখ মুছে ক্রিম ঘষে শান্তশীল বেরিয়ে এল। ড্রয়িংরুমে মউ নেই। খেয়ালবশে অর এক চুমুক ব্র্যান্ডি পান করে ধীরেসুস্থে সে কিচেন-কাম-ডাইনিংয়ে গেল। অবাক হলো, মউ নেই।

সে আস্তে ডাকল, মউ!

কোনও সাড়া পেল না। টেবিলে থালা সাজানো আছে। জলের গ্লাস খালি। খাদ্যের সুদৃশ্য পাত্রগুলি ঢাকা। শান্তশীল বেডরুমের পর্দা তুলল। মউ নেই। ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে সন্দিগ্ধ করল এ মুহূর্তে। এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের পর্দা সরাল। দরজা বন্ধ। সে ডাকল, মউ!

সাড়া না পেয়ে দরজা খুলল। বাথরুমে মউ নেই। এক মিনিট? কিংবা তারও বেশি। শান্তশীল ড্রয়িংরুম থেকে আবার ডাইনিংয়ে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘুরছিল। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ডাইনিং টেবিলে একটুকরো কাগজ রাখা। কাগজটা তখন তার সহজেই চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি। কাগজে খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা আছে:

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো। আমি আসছি। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলেই ই ব্লকের তিনতলায় যাবে। ফিরে এসে সব বলব। ফেরা না হলে—

তোমার মউ

বাক্যগুলির সঠিক মানে বোঝার আগে তন্মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায় শান্তশীলের মুখ দিয়ে অশালীন একটা কথা বেরিয়ে গেল, ফাকিং হোর!

এমন কুৎসিত গাল মউকে সে আড়ালেও দেওয়ার কথা কল্পনা করেনি কোনও দিন। পরমুহূর্তে তার সম্বিৎ ফিরল। বাক্যগুলির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল। এ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। দুঃস্বপ্নের মতো।

অতর্কিতে মউয়ের নেপথ্যজীবন হিংস্র দাঁত বের করেছে যেন। আরও একটু পরে সে বুঝল, 'ফিরে এসে সব বলব' বাক্যটা দ্বিতীয় বাক্য 'আমি আসছি'-র পর লেখা উচিত ছিল। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে গণ্ডগোলটা ঘটেছে। কিন্তু 'ফেরা না হলে—'

মাই গুডনেস! শান্তশীল কাগজটা যেমন রাখা ছিল তেমনিই রেখে ব্রান্ডিতে চুমুক দিল। ইদানীং সিগারেট কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসময়ে সিগারেট জরুরি। সে ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এল। শান্তভাবেই অবস্থার মুখোমুখি হবে স্থির করল।

ইজিচেয়ারে বসে সে সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারল না মউ কখন বেরিয়ে গেছে যে তখন থেকে তাকে পাঁচ মিনিট গুনতে হবে? পাঁচ...চার...তিন...দুই...এক এইভাবে জিরো আওয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। এতক্ষণ জিরো আওয়ার হয় তো পেরিয়ে গেছে। আবার শান্তশীলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফাকিং হোর!

কিন্তু 'তোমার মউ' কথাটা বুকের ভেতর নখের আঁচড় কাটছে টের পেল সে। এই নাটকীয়তার অর্থ কী? ই ব্লকের তিনতলায় কার কাছে এভাবে ছুটে গেছে মউ? ওই ব্লকের কোনও বাসিন্দার সঙ্গে আলাপ নেই শান্তশীলের। মাসতিনেক আগে কোম্পানি তাকে এই অ্যাপার্টমেন্টটা দিয়েছে। তার আগে ক্যামাক স্ট্রিটের একটা পুরনো বাড়িতে ছিল। পদোন্নতির পর এখানে। সে সকাল ন'টায় বেরিয়ে যায়। ফিরতেও রাত প্রায় ন'টা-দশটা হয়ে যায়। মউ একা থাকে। তাই শান্তশীল কিছুক্ষণ অন্তর ফোন করে তাকে। বাড়িতে না থাকলে কাজের মেয়ে ললিতা ফোন ধরে জানায়, মেমসায়েব মার্কেটিংয়ে গেছেন। ললিতা ভোরে আসে এবং সন্ধ্যায় চলে যায়।

'মার্কেটিং'! ললিতা আর কিছু বলতে পারে না। শান্তশীল এতদিন তলিয়ে ভাবেনি। এখন তার কাছে স্পষ্ট, ওটা ললিতাকে মুখস্থ করানো একটা শব্দ মাত্র।

ঠিক আছে! পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলে চরম বোঝাপড়া হবে।

কিন্তু 'ফেরা না হলে—'

নড়ে বসল শান্তশীল। ঘড়ি দেখল। এগারোটা পনেরো। জিরো আওয়ার নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ই ব্লকটা কোনদিকে?

ড্যাম ইট! শান্তশীল সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে উচ্চারণ করল। সে রাত এগারোটা পনের মিনিটের পর ই ব্লকের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে না। কক্ষনো না। চুল খামচে ধরে সে বসে রইল।

এগারোটা কুড়ি মিনিটে সে সিকিউরিটি অফিসে টেলিফোন করল। আমি শান্তশীল দাশগুপ্ত। বি ব্লকের ৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বলছি। ফার্স্ট ফ্লোর। প্লিজ পুট মি টু মিঃ রণধীর সিংহ। দিস ইজ আর্জেন্ট।

সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ এক্স-সার্ভিসম্যান। তাঁর সাড়া এল, বলুন স্যার!

ই ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোরে কি কিছু ঘটেছে? খোঁজ নিন তো!

জাস্ট এ মিনিট স্যার! দয়া করে একটু ধরুন!...এক মিনিট পরে সাড়া এল। আমাদের লোক গেল। আপনার নম্বর জানাবেন?

শান্তশীল নম্বর বলল। তারপর আড়ষ্ট হাতে টেলিফোন রাখল। অবার একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে আনল গ্লাসে। চুমুক দিয়ে চোখ বুজল। হ্যাঁ, জীবনে এই ঘা খাওয়াটা সবচেয়ে জোরালো। সবচেয়ে অপমানজনক। এ অপমান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ একটি মেয়ে তাকে প্রতারিত করেছে এবং বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছে।

bengalidownload.com

কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বাজল। শান্তশীল তাড়াহুড়ো না করে টেলিফোন তুলল।

মিঃ দাশগুপ্ত? ব্লক বি, অ্যাপার্টমেন্ট সেভেন?

হ্যাঁ। বলুন!

আমি রণধীর সিংহ বলছি। ই ব্লকের এক নম্বর লিফটের মধ্যে এক ভদ্রমহিলার বডি পাওয়া গেছে। তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে মারা হয়েছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে। দুঃখিত মিঃ দাশগুপ্ত! আপনার সঙ্গে পুলিশ আসার আগেই আমার কথা বলা দরকার। আমি যাচ্ছি। ঠিক আছে?

কেন আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার মিঃ সিংহ?

অন্যভাবে নেবেন না স্যার! কারণ আপনিই আমাকে ই ব্লকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ। বুঝেছি। আসুন।

টেলিফোনে হাত রেখে বসে রইল শান্তশীল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, এটা একটা বড় স্ক্যান্ডাল এবং এই স্ক্যান্ডাল তার কেরিয়ারের কোনও ক্ষতি করবে কি না! হ্যাঁ। প্রেম ট্রেমের চেয়ে বড় কথা, সে একজন 'ইয়াপ্পি'...

॥ তিন ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আটটা অব্দি ছাদের বাগান পরিচর্যার পর ড্রয়িংরুমে বসে কফি পান করতে করতে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন। সেই সময় ডোরবেল বাজল। একটু পরে তাঁর পরিচারক ষষ্ঠীচরণ একটা নেমকার্ড এনে বলল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এয়েছেন বাবামশাই!

কার্ডে লেখা আছেঃ এস সোম। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। ঠিকানাটা চৌরঙ্গি এলাকার। হুঁ, নামকরা ওষুধ সংস্থা। এদের কয়েকটা লাইফ-সেভিং ড্রাগ বিখ্যাত। দেশের সর্বত্র বিজ্ঞাপনের বিশাল হোর্ডিং দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্নেল বললেন, নিয়ে আয়।

তিরিশের কাছাকাছি বয়স, অমায়িক হাবভাব, সুদর্শন এক যুবক ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করল। পরনে কেতাদুরস্ত টাইস্যুট এবং হাতে ব্রিফকেস। সে সোফায় বসে আস্তে শ্বাস ছাড়ল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। মানে, বাধ্য হয়েই এসেছি।

কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আপনার পুরো নাম বলুন প্লিজ!

শুভ্রাংশু সোম। থাকি লেকগার্ডেনসে। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম আপনার কথা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে—

তারপর নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কর্নেল হাসলেন। যাই হোক, বলুন।

তার আগে একটা অনুরোধ কর্নেল সরকার! প্লি-ই-জ! পুলিশকে আমি এড়িয়ে থাকতে চাই। সেইজন্যই আপনার কাছে আসা। সব শুনলে বুঝতে পারবেন কেন আমি আড়ালে থাকতে চাইছি।

বলুন!

গতরাতে সানসাইন হাউজিং কমপ্লেক্সে আমার খুব পরিচিত এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

কর্নেল লক্ষ্য করলেন, কথাগুলিতে স্বাভাবিক উত্তেজনা ছাড়াও একটা আর্তির সুর স্পষ্ট। যদিও মুখের রেখায় উত্তেজনাই স্পষ্ট। অবশ্য কথাগুলি সে আস্তে উচ্চারণ করল এবং প্রত্যেকটা শব্দের পর বিরতি ছিল। কর্নেল বললেন, জায়গাটা কোথায়?

ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে। চারটে ব্লক নিয়ে হাউজিং কমপ্লেক্স। উচ্চমধ্যবিত্তরাই থাকেন। বেশির ভাগ বিগ কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ছোট কোম্পানির

মালিকরাও— তো যিনি গতরাতে খুন হয়েছেন, তিনি আমার কোম্পানিরই নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের স্ত্রী। নাম মধুমিতা দাশগুপ্ত। বিয়ের আগে অভিনয় করতেন স্টেজে এবং টি ভি ফিল্মে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, কী ভাবে খুন হলেন ভদ্রমহিলা?

শুভ্রাংশু রুমালে মুখ মুছে বলল, ভেরি মিসটিরিয়াস মার্ডার। মউ থাকে বি ব্লকে দোতলায় ৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে।

কর্নেল দ্রুত বললেন, মউ?

মধুমিতার ডাকনাম। শুভ্রাংশুকে একটু নার্ভাস দেখাল। গতরাতে সাড়ে এগারোটায় নাকি ওর বডি পাওয়া যায় ই ব্লকের ১ নম্বর লিফটের ভেতর। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মাথার ডানপাশে গুলি। অশ্চর্য ব্যাপার, নাইটগার্ড বা অ্যাপার্টমেন্টের কেউ নাকি গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। অটোমেটিক লিফ্‌ট। তার চেয়ে আরও আশ্চর্য, মউয়ের স্বামী শান্তশীল ঠিক ওই সময় টেলিফোনে সিকিউরিটি অফিসারকে ই ব্লকে কিছু ঘটেছে কি না খোঁজ নিতে বলেন। সিকিউরিটির লোক গিয়ে মউয়ের বডি আবিষ্কার করে।

তখন লিফ্‌ট কোন ফ্লোরে ছিল?

সেকেন্ড ফ্লোরে। ২ নং লিফ্‌ট খারাপ। ১ নম্বরটা চালু ছিল। সিকিউরিটির দু'জন গার্ড ১ নং লিফ্‌ট দিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে উঠতে চেয়েছিল। লিফ্‌ট নামতেই তারা মউয়ের বডি দেখতে পায়।

ষষ্ঠীচরণ রীতি অনুসারে কফি আনল। কর্নেল বললেন, কফি খান মিঃ সোম। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

শুভ্রাংশু কফির পেয়ালা তুলে নিল, তারপর পুলিশ যায় রাত বারোটা নাগাদ। বুঝতেই পারছেন সানসাইনের বাসিন্দারা সিনিক টাইপ। পরস্পর তত মেলামেশা নেই। তো—

কফি খান।

শুভ্রাংশু কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, এরপর অদ্ভুত ঘটনা সেকেন্ডে ফ্লোরের ১৩ নং অ্যাপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোককে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তাঁর নাম চন্দ্রনাথ দেববর্মন। কী একটা মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর মালিক।

তাঁকে অ্যারেস্ট করল কেন?

দুটো লিফটই ১০ নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। সেখানে থাকেন একজন ব্যবসায়ী। তাঁর অ্যালসেসিয়ান হঠাৎ নাকি খেপে গিয়ে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কুকুরটা এমন করছে কেন তা বোঝার জন্য তিনি দরজার আইহোলে চোখ রাখেন। তিনিই চন্দ্রনাথবাবুকে দেখতে পান। ওঁর হাতে নাকি ফায়ার আর্মস ছিল। চন্দ্রনাথবাবুকে লিফটের সামনে থেকে দ্রুত চলে আসতে দেখেন।

সেই ব্যবসায়ীর নাম কী?

boiRboi.blogspot.com

জানি না।

আপনি কিভাবে এইসব ঘটনা জানলেন?

কর্নেলের প্রশ্নে তীক্ষ্ণতা ছিল। শুভ্রাংশু আরও নার্ভাস মুখে বলল, আমি কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে আজ সাতটায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। সাড়ে সাতটায় ওঁর বাইরে যাওয়ার কথা। খুলে বলি। আমাকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে বদলি করা হয়েছে। বদলি ক্যান্সেল করানোর জন্য ওঁকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম। হি ইজ এ নাইস অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক পার্সন। হি লাইকস মি। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক।

উনিই কি আপনাকে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন?

হ্যাঁ। শুভ্রাংশু কফিতে চুমুক দিয়ে ফের বলল, অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বললেন। আরও অনেক গোপন ব্যাপার থাকতেই পারে, আমাকে যা বলার মতো নয়।

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে দাড়িয়ে ছাই ঝেড়ে বললেন, কিন্তু আপনি আগে থেকেই আমার কাছে আসতে চেয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না!

শুভ্রাংশু একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করার সখ ছিল আমার। সেই সূত্রে মউয়ের সঙ্গে পরিচয়। খানিকটা হৃদ্যতার সম্পর্কও হয়েছিল। কিন্তু মউ ছিল হঠকারী টাইপের। একটু স্বার্থপরও ছিল। টিভি সিরিয়ালে নাম করার পর আমাকে এড়িয়ে চলত। শেষে আমারই কোম্পানির নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ মিঃ দাশগুপ্তকে বিয়ে করে বসল। কিন্তু না কর্নেল সরকার, মউয়ের সূত্রে আমি মিঃ দাশগুপ্তের কাছে কোনও সুযোগসুবিধা নিইনি! ওঁর সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, প্লিজ মেক ইট ব্রিফ!

সরি! শুভ্রাংশু পাংশুমুখে একটু হাসল। গত ২ রা মার্চ রবিবার দুপুরে মউ হঠাৎ আমাকে ফোনে বলেছিল ও বিরাট ভুল করেছে। ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না। মউ তারপর আমাকে অবাক করে বলল, কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ঠিকানা আমার জানা আছে কি না। বললাম কেন? মউ বলল, সে একজন ব্ল্যাকমেলারের পাল্লায় পড়েছে। ফোনে সব বলা যাবে না। তারপর লাইন কেটে গেল। আমি রিং ব্যাক করলাম। কিন্তু রিং হতে থাকল। মউ ফোন ধরল না। পরের ফোন পেলাম ২২ মার্চ রাত ৮ টা নাগাদ। মউ বলল, ব্ল্যাকমেলার এবার পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকে লোকটা? মউ বলল, হংকংয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই কলকাতা আসে। সানশাইনে ওর এক বন্ধু আছে। তার কাছে আসে এবং সেখান থেকে মউয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ২৮ মার্চ রাত ৯ টায় তাকে সেই বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট গিয়ে টাকাটা পৌঁছে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, ব্ল্যাকমেল করে কী ব্যাপারে? মউ শুধু বলল, একটা ভিডিও ক্যাসেট। তারপর লাইন কেটে গেল। আমি আগের মতো রিং করলাম। কিন্তু আর মউ ধরল না।

কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, কিন্তু মউ গতরাতে খুন হয়ে গেছে বলছেন। ব্ল্যাকমেলারের সোনার হাঁস মারা পড়েছে। কাজেই আর ব্ল্যাকমেলের প্রশ্ন থাকছে না!

শুভ্রাংশু উত্তেজিতভাবে বলল, বাট হু কিলড্ মউ? হোয়াই? মিঃ দাশগুপ্ত গতকাল ভুবনেশ্বরে ছিলেন। ওঁর ফ্লাইট দেরি করায় প্রায় রাত পৌনে দশটায় নাকি দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছান। সানশাইনে পৌঁছাতে প্রায় আধঘণ্টা লাগার কথা। ওঁর অ্যালিবাই অবশ্য স্ট্রং। কিন্তু—

বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁর?

হ্যাঁ। তারপর নাকি মউ এখনই আসছি বলে বেরিয়ে যায়। মিঃ দাশগুপ্ত আমাকে শুধু এটুকু বলেছেন।

কর্নেল অ্যাসট্রে থেকে আধপোড়া চুরুট তুলে সযত্নে ধরালেন। বললেন, আপনি আমার কাছে ঠিক কী চাইছেন?

শুভ্রাংশু ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। বলল, কে মারল মউকে। কেন মারল? ব্ল্যাকমেলার নয়, এটুকু বলা যায়। তাই নয় কি কর্নেল সরকার? আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ দাশগুপ্তের অ্যালিবাইয়ে কোনও ফাঁক আছে।

কর্নেল তার চোখে চোখ রেখে বললেন, পুলিশ তো কিলারকে ধরেছে!

আমার মনে হচ্ছে ভুল লোক। কোথায় একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। ই ব্লকের ১০ নম্বরের ব্যবসায়ী লোকটার কথায় পুলিশ ভুল পথে গেছে। আপনিই ঠিক লোককে ধরে দিতে পারেন। আমি জানি।

কী ভাবে জানেন? আমার ঠিকানা কে দিল আপনাকে?

মউয়ের প্রথম ফোন পাওয়ার পর আমি একটা ডিকেটটিভ এজেন্সির খবর পেয়েছিলাম। ফিনিক্স নাম। লাউডন স্ট্রিটে অফিস। ফিনিক্সের মিনিমাম ফি দশ হাজার। ওদের একজন—হ্যাঁ, প্রণয় মুখার্জি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বিনা পয়সায় মিসট্রি সলভ্ করেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছে যান।

কর্নেল হাসলেন। প্রণয় বলেছিল? সে এখনও গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে জালিয়াতির ব্যবসা।

কর্নেল আবার ঘড়ি রেখে বললেন, প্রণয় রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিগুলোতে রিটায়ার্ড পুলিশ আর এক্স-সার্ভিসম্যানদেরই আড্ডা। তবে ওরা সুশ্রী মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগায়।

শুভ্রাংশু কাঁচুমাচু মুখে বলল, কর্নেল সরকার! বুঝতেই পারছেন আমার তেমন কিছু সামর্থ্য নেই। স্মল ফ্রাই। অথচ মউয়ের এই শোচনীয় মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে।

কিন্তু তার স্বামী বিগ গাই! কর্নেল হাসলেন। তাকে সব খুলে বলুন।

banglaboi.blogspot.com

শুভ্রাংশুর ঠোঁটের কোনায় বিকৃতি ফুটে উঠল। মিঃ দাশগুপ্ত নিজেকে 'ইয়াপ্পি' বলেন।

ইয়াপ্পি?

হ্যাঁ। ইউ নো দা টার্ম। আমার মনে হয়েছে, স্ত্রীর ব্যাপারে তত মাথাব্যথা নেই। খুব নির্লিপ্ত। তাই আমার সন্দেহ জেগেছে।

আপনি মউয়ের মুখে একটা ভি ডি ও ক্যাসেটের কথা শুনেছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুভ্রাংশু চাপা গলায় বলল, যদিও আমি মউকে ততটা নিচে দেখার কথা ভাবতে পারছি না— মানে, কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু আমি তার কতটুকুই বা জানতাম? মানি, কেরিয়ার এসব জিনিসের প্রতি তার লোভ তো ছিলই। আপনি বুঝতে পারছেন কী মিন করছি!

হুঁ ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট।

একজ্যাক্টলি! নড়ে বসে শুভ্রাংশু। তবে এমনও হতে পারে মউকে ড্রাগের সাহায্যে— কর্নেল সরকার! আজকাল এমন সব ড্রাগ বেরিয়েছে, যা খাইয়ে দিলে সে জানবে না কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি।

কর্নেল নেমকার্ডটা দিয়ে বললেন, এতে আপনার বাড়ির ঠিকানা নেই। পেছনে লিখে দিন। ফোন নাম্বার দিন। দেখা যাক কি করতে পারি।

শুভ্রাংশু তার ব্যক্তিগত ঠিকানা লিখে দিয়ে কুণ্ঠিত মুখে বলল, আমার কাঁধে মোটামুটি একটা বড় ফ্যামিলির বোঝা। তা না হলে—

হাত তুলে কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, প্রণয় ইজ রাইট মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান! আমি ফি নিই না। আচ্ছা, আপনি আসুন। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

শুভ্রাংশু আড়ষ্টভাবে বেরিয়ে গেল। কর্নেল আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। সানসাইন হাউজিং কমপ্লেক্সে কোনও খুনখারাপির ঘটনা আজকের কাগজে নেই। গভীর রাতের ঘটনা। তাছাড়া নামী কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসারের স্ত্রী। স্ক্যান্ডালের ভয়ে আপাতত চেপে দেওয়ার চেষ্টাও থাকা সম্ভব।

ন'টা দশ বাজে। সাড়ে ন'টার বেহালায় গাঙ্গুলি নার্শারিতে পৌঁছনোর কথা। অভয় গাঙ্গুলি অপেক্ষা করবেন কর্নেলের জন্য। কয়েকটা বিদেশি ক্যাকটাস এসেছে নার্শারিতে।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। সানশাইন হাউজিং কলপ্লেক্সের ই ব্লকের ১ নং লিফটের ভেতর এক যুবতীর মৃতদেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দরী তো বটেই। টেলিসিরিয়ালে নাম করেছিল।

এবং তাকে নিয়ে একটা ব্লু ফ্লিম!

টেলিফোনে গাঙ্গুলিমশাইকে জানিয়ে দিলেন কর্নেল, জরুরী কারণে আজ যেতে পারছেন না। তবে ক্যাক্টিগুলো যেন বেহাত না হয়।

কর্নেল স্মৃতি থেকে শুভ্রাংশু সোমের বিবরণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তার ইন্টারেস্টের কারণ কি নিছক পুরনো প্রেম? মউকে মন থেকে মুছে দিতে পারেনি? মউয়ের স্বামী 'ইয়াপ্পি' বলে নাকি নিজেকে। আজকাল কোন যুবক 'ইয়াপ্পি' নয়? ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কিন্তু শুভ্রাংশুর প্রকৃত ইন্টারেস্ট কি শুধু রহস্যটা জানা? জেনে কী লাভ? সে মউয়ের স্বামীকে যেন সন্দেহ করেছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়িকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে।...

॥ চার ॥

'মৃতেরা কথা বলে না!' হঠাৎ এই বাক্যটা মাথায় ভেসে এল শান্তশীলের। ড্রয়িং রুমের পাশের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে সে যন্ত্রের মতো কাজ করছিল। অফিসেরই কাজ। আজ এবং আগামিকাল তার অফিস যাওয়ার কথা ছিল না। মউকে নিয়ে বহরমপুর যেত। আগামীকাল ফিরে আসত অসুস্থ শ্বশুরমাশাইকে নিয়ে। কিন্তু মউ মরে গেল।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে তার হটলাইনে সংক্ষেপে জানিয়েছে ঘটনাটা। বলেছে, আপাতত তার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। হলে তা অবশ্যই জানাবে। ভুবনেশ্বরের রিপোর্ট দুপুরের মধ্যেই তৈরি করে ফেলবে। দুটোর মধ্যে কেউ যেন এসে নিয়ে যায়।

সেই রিপোর্ট তৈরি করতে করতে অদ্ভুতভাবে লাইনটা মাথায় ভেসে এল, 'ডেডস ডু নট স্পিক।'

কোথায় পড়েছিল স্মরণ হলো না। দেওয়ালে পিকাসোর একটা প্রিন্টের দিকে তাকিয়ে রইল শান্তশীল। ছবিটা 'উইপিং উওম্যান'। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা এবং অসহায়তা চোখে বেঁধে। ছবি বোঝে না শান্তশীল। এটা কোম্পানিরই ডেকরেটারদের সাজিয়ে দেওয়া। এ মুহূর্তে কয়েকরকম রঙ এবং কালো মোটা রেখা ছাড়া ওই বোধটা ধরা দিল না তার চোখে। মউ বলতো, ছবিটা অসহ্য। সে কি ছবি বুঝত?

নাহ্। ফিল্মের ছবি ছাড়া অন্য কোনও ছবিতে মউয়ের আগ্রহ ছিল না। বেডরুমে সেই পপুলার টেলিসিরিয়ালের কয়েকটা স্টিল কালার প্রিন্ট বাঁধিয়ে রেখেছিল। ড্রয়িংরুমেও বড় করে বাঁধানো আছে একটা। সবই মউয়ের বিভিন্ন মুডের ফটোগ্রাফ। সেগুলো কিছুক্ষণ আগে নামিয়ে প্যাকেটে বেঁধে একটা আলমারির মাথায় রেখে দিয়েছে শান্তশীল। মউ হঠাৎ গতরাত থেকে একটা দুঃসহ স্মৃতি হয়ে গেছে তার কাছে। ব্যর্থতার স্মৃতি। কিংবা একটা পতনের ছবি।

banglaboi.org

'মৃতেরা কথা বলে না।' আবার ভেসে এল বাক্যটা। কাজের মেয়ে ললিতাকে আজ এবং আগামীকাল দু' দিনের ছুটি দেওয়া আছে। ললিতা কোথায় থাকে, জানে না শান্তশীল। জানার দরকার মনে করেনি। পরশু ললিতা এলে পুলিশকে জানানোর কথা আছে। পুলিশ তাকে জেরা করবে। কারণ চন্দ্রনাথ দেববর্মনের খুনের কোনও মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। ই ব্লকের কেউ কোনওদিন মউকে ওখানে দেখেনি বলেছে।

কিন্তু একমাত্র ললিতাই বলতে পারে মউয়ের গতিবিধির কথা। মউ মৃত। সে কথা বলবে না। কিন্তু তার হয়ে কথা বলার লোক নিশ্চয় আছে। প্রথম লোক ললিতা।

শান্তশীল আবার কম্পিউটারে মন দিতে গিয়ে বুঝল তার হাত ঠিক মতো কাজ করছে না। এ ঘরে সে সিগারেট খায় না। উঠে ড্রয়িংরুমে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। স্মৃতির দিকে পিছু ফিরতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ঘুরল। ড্যাম ইট! জীবনে কতবার ভুল জায়গায় পা ফেলেছে। তারপর সামলেও নিয়েছে। কিন্তু এই ভুলটা একেবারে অন্য ধরনের। খুবই অপমানজনক।

ডোরবেল বাজল। আবার পুলিশ নাকি? বিরক্ত হয়ে শান্তশীল দরজায় গেল। আইহোলে দেখল সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে লম্বা চওড়া এক বৃদ্ধ— ফাদার ক্রিস্টমাস ধরনের চেহারা। বিদেশি বলে মনে হলো। কী ব্যাপার?

শান্তশীল দরজা খুলে বলল, বলুন মিঃ সিংহ!

রণধীর বললেন, ইনি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান স্যার! আপনাকে বিরক্ত করায় দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়। যাই হোক, ইনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার সুপরিচিত।

শান্তশীল বলল, আসুন!

কর্নেল ভেতরে ঢুকলেন। রণধীর বললেন, আমি কাছাকাছি থাকছি কর্নেল সায়েব! আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

রণধীর স্যালুট ঠুকে চলে গেলেন। শান্তশীল দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল কর্নেলকে। নিজে বসল ইজিচেয়ারে। কর্নেল ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বসলেন। তারপর অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনাকে এখন বিরক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান

শান্তশীল আস্তে বলল, আপনি বাঙালি?

কর্নেল পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দিলেন।

শান্তশীল কার্ডটা পড়ে বলল, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। তলায় ছাপানো আছে নেচারিস্ট। তো আমার কাছে কী? আমি নেচার-টেচার বুঝি না। আমি নেচার-লাভার নই। যাই হোক, বলুন!

আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কী বিষয়ে?

কর্নেল হাসলেন। নাহ্ নেচার বিষয়ে নয়। আপনার স্ত্রীর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড—

তা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন জানতে পারি?

আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী মিঃ দাশগুপ্ত!

ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা পুলিশ দেখছে। আপনি কেন এতে নাক গলাতে চান? বলেই শান্তশীল সংযত হলো। সরি!

কর্নেল আস্তে বললেন, ৭ মার্চ হোটেল কন্টিনেন্টালে আপনার কোম্পানি একটা পার্টির আয়োজন করেছিল। যেখানে আপনি সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

শান্তশীল তাকাল। সো হোয়াট?

সেই পার্টিতে হংকংয়ের এক বড় ব্যবসায়ী রঙ্গনাথনের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল!

শান্তশীল কথাটা বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। একটু পরে বলল, হয়ে থাকতে পারে। নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

কর্নেল চুরুটকেস বের করে একটা চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, আপনি কি চান না আপনার স্ত্রীর কিলার ধরা পড়ুক?

সে তো ধরা পড়েছে! শান্তশীল সোজা হয়ে বসল। কট উইদ দা মার্ডারউইপন।

হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ দেববর্মনের একটা পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের রিভলভার পাওয়া গেছে। লাইসেন্স্ড্ আর্মস। এক রাউন্ড ফায়ার করেছিল সে, তা-ও সত্য। কর্নেল শান্তশীলের চোখে চোখ রেখে বললেন, কিন্তু মিঃ দাশগুপ্ত, মর্গের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আপনার স্ত্রীর মাথার ভেতর যে গুলিটা আটকে ছিল, তা পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে ছোড়া থ্রি নট থ্রি বুলেট।

শান্তশীল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উত্তেজনা দমন করে বলল, মর্গের রিপোর্টের কথা এখনও আমি জানি না। বাট নাও আই মাস্ট আস্ক দ্য কোয়েশ্চান, হু আর ইউ?

কর্নেল একটু হাসলেন। সেটা ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির কাছে জেনে নেবেন। তবে আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

শান্তশীল কর্নেলকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে একবার দেখে নিয়ে বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না। এবার বলুন, ৭ মার্চ রাত্রে হোটেলে কন্টিনেন্টালের পার্টিতে রঙ্গনাথন এবং আপনার স্ত্রীকে কি একান্তে কথা বলতে দেখেছিলেন? স্মরণ করার চেষ্টা করুন প্লিজ!

banglaboi.com

শান্তশীল একটু ভেবে নিয়ে বলল, মউ— আমার স্ত্রী, টেলিসিরিয়ালে হিরোইন হিসাবে নাম করেছিল। সেই পার্টিতে সি ওয়াজ ন্যাচারালি অ্যান অ্যাট্রাক্টিভ ফিগার। অনেকেই তার অটোগ্রাফ আর ছবি নিচ্ছিল। আর রঙ্গ নাথন? তিনিও মউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পার্টিতে যেভাবে পরস্পর কথা বলে, সেইভাবে।

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, এবার একটা গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন।

বলুন!

পার্টি শেষ হবার পর আপনার স্ত্রীর মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন কি?

সি ওয়াজ টায়ার্ড, ফেরার পথে বলেছিল, এ সব ন্যাস্টি ভিড় তার ভাল লাগে না। আর সে কোনও পার্টিতে যাবে না।

আর কিছু?

নাহ্। আমি জানতাম তার অভিনয় জীবন যে কোনও কারণে হোক, আর ভাল লাগছিল না। বোম্বের হিন্দি ফিল্মওয়ালাদের অনেক বড় অফার সে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আপনার সঙ্গে কখন কোথায় মধুমিতা দেবীর প্রথম আলাপ হয়?

শান্তশীল আস্তে শ্বাস ফেলে বলল, আমার কোম্পানির স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব একটা নাটক করেছিল। লাস্ট অক্টোবরে। তারিখ মনে নেই। ক্লাবের নাটকে হিরোইনের রোলে মউকে ওরা হায়ার করে এনেছিল। নাটকের আগে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান হয়। আমি ছিলাম চিফ গেস্ট। ওদের অনুরোধে আমাকে নাটকের শেষ অব্দি থাকতে হয়েছিল।

আপনি মধুমিতা দেবীর অভিনয় দেখে নিশ্চয় মুগ্ধ হয়েছিলেন?

অস্বীকার করছি না। গ্রিনরুমে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করি। তাকে আমার নেমকার্ডও দিয়েছিলাম।

শুভ্রাংশু সোমকে তো আপনি চেনেন!

শান্তশীল তাকাল। একটু পরে বলল, হ্যাঁ। নাইস চ্যাপ। আপনি চেনেন নাকি ওকে?

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, বাই এনি চান্স শুভ্রাংশু কি মধুমিতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল কোনওদিন?

আমি বুঝতে পারছি না কেন এ কথা জানতে চাইছেন?

প্লিজ অ্যানসার দিস কোয়েশ্চান!

ইজ ইট ইমপর্ট্যান্ট ইন দিস কেস?

মে বি। আমরা অনেক সময়েই জানি না যে আমরা কী জানি।

শান্তশীল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, শুভ্রাংশু কী একটা গ্রুপথিয়েটারেও অভিনয় করে। সেই দলে মউও অভিনয় করত একসময়। সো মাচ আই নো—

শুভ্রাংশু বলেছিল অবশ্য। তো হ্যাঁ, ইউ আর রাইট। শুভ্রাংশু মউকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের দলের স্যুভেনিরের বিজ্ঞাপনের জন্য বার দুই এসেছিল। এটা হতেই পারে সে মউ সম্পর্কে আমরা দুর্বলতা টের পেয়েছিল। আমাকে এক্সপ্লয়েট করার উদ্দেশ্য থাকতেই পারে। কিন্তু আমি কোম্পানির ইন্টারেস্ট দেখি। বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতেই পারে। তবে কোনও এমপ্লয়ির এফিসিয়েন্সিই আমার কাছে একমাত্র বিবেচ্য। এনিওয়ে, ওদের স্যুভেনিরে আমার কোম্পানির ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছিলাম।

শান্তশীল হঠাৎ থেমে গেল। কর্নেল বললেন, চন্দ্রনাথ দেববর্মনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

নাহ্। মর্নিংয়ে ওকে জগিং করতে দেখেছি। একসময় আমারও অভ্যাস ছিল।

ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে আপনার কোম্পানির যোগাযোগ আছে?

শান্তশীল কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরো—এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তবে আমাদের নিজস্ব মার্কেটিং রিসার্চ সেকশন আছে। তারা অনেকক্ষেত্রে বাইরেকার হেল্প নেয়। খোঁজ নেব। কেন?

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, আপনার স্ত্রী পার্সোন্যাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকার কথা!

শান্তশীল কর্নেলের দিকে তাকাল। একটু পরে বলল, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো কর্নেল সরকার?

মিঃ দাশগুপ্ত, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার মানে, আপনি আপনার স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর পর নিশ্চয় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কাগজপত্র দেখেছেন। কিছু সন্দেহজনক লেনদেন ওতে লক্ষ্য করেছেন কি না, সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

শান্তশীল একটু উত্তেজিতভাবে বলল, মউ টেলিসিরিয়ালে এবং ছোটোখাটো অনেক ফিল্ম থেকে তত বেশি টাকা পায়নি। কিন্তু ওর কাঁধে একটা বোঝা ছিল। বহরমপুরে ওর বাবা-মা থাকেন। দুই ভাই আর এক বোন থাকে। আমরা শ্বশুরমশাই রিটায়ার করে ওখানেই বাড়ি করেছেন। আমি কখনও যাইনি সেখানে। আজ দুজনে যাওয়ার কথা ছিল। শ্বশুরমশাই অসুস্থ— বলে সে দম নিল। জোরে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, হ্যাঁ। মউয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমি দেখেছি।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, গত দু-তিন মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ড্র করেছিলেন কি মধুমিতা?

মোটা অঙ্ক মানে দু'বার দশ হাজার টাকা তুলেছিল। ফেব্রুয়ারি এবং এ মাসে। এটা স্বাভাবিক। শ্বশুরমশাই গতমাস থেকে অসুস্থ।

এখন একজ্যাক্ট ব্যালান্স কি পঞ্চাশ হাজারের ওপরে? নাকি নিচে?

boiRboi.blogspot.com

শান্তশীল হতাশ ভঙ্গিতে বলল, দিস ইজ টু মাচ! পুলিশও আমাকে এত প্রশ্ন করেনি। দে নো মাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস! মাই পজিশন! অ্যান্ড ইউ আর আস্কিং মি দিজ ননসেন্স কোয়েশ্চানস! কে আপনি তাও এক্সপ্লেন করছেন না। আপনি কি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছেন আমাকে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেল ইজ দা রাইট ওয়ার্ড মিঃ দাশগুপ্ত! আপনার স্ত্রীকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল।

শান্তশীলের চোখে একমুহূর্ত চমক ঝিলিক দিল। তারপর শান্তভাবে বলল, প্লিজ এক্সপ্লেন ইট— ইফ সো মাচ ইউ নো।

আমার ধারণা, আপনার স্ত্রীর ব্যাঙ্ক পঞ্চাশ হাজারের অনেক নিচে।

থার্টি সিক্স মতো। কিন্তু কে মউকে ব্ল্যাকমেল করছিল? কেন করছিল? করলে আমাকে সে গোপনই বা করবে কেন? আমার ক্ষমতা সে জানত। শান্তশীল দ্রুত একটা সিগারেট ধরাল। হ্যাঁ— তার অতীত জীবনে স্ক্যান্ডালাস কিছু থাকতেই পারে। আমি জানি অভিনেত্রীদের অনেকের জীবনে কী সব ঘটে থাকে। মউ ভালোই বুঝত, আমি তার আগের জীবনে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে রাজি নই। আই অ্যাম এ মর্ডান ম্যান অ্যান্ড সি নিউ ইট ওয়েল।

মিঃ দাশগুপ্ত! তবু আপনি একজন পুরুষমানুষ। চূড়ান্ত মডার্ন হয়ে ওঠা ওয়েস্টেও কোনও পুরুষমানুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্ম বরদাস্ত করতে পারে না— দ্যাট আই ক্যান অ্যাসিওর। আপনি আফটার অল ভারতীয়।

ব্লু ফিল্ম বললেন? শান্তশীল ভুরু কুঁচকে তাকাল।

হ্যাঁ ব্লু ফিল্ম।

ইউ মিন, মউকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্ম?

ধরুন তা-ই।

সরি কর্নেল সরকার! আমি বিশ্বাস করি না। ক্ষমা করবেন, এ সব উদ্ভট কথাবার্তা শোনার সময় আমার নেই। আমার হাতে জরুরি কাজ আছে। দেড়টা বাজে।

শান্তশীল উঠে দাঁড়াল। কর্নেল অগত্যা উঠলেন। তারপর দেওয়ালে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ওখানে একটা বড় ছবি ছিল সম্ভবত। আপনার স্ত্রীর ছবি হতেই পারে। হ্যাঁ, ওই টেবিলে একটা ছিল। চিহ্ন লক্ষ্য করছি। স্ত্রীর স্মৃতি আপনার পক্ষে আপাতত অসহনীয় হতেই পারে। তবে শিগগির ভুলেও যাবেন। থ্যাঙ্কস্। চলি।

শান্তশীল নিষ্পলক তাকিয়ে শুনছিল। কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার পর এগিয়ে গিয়ে জোরে দরজা বন্ধ করল।...

॥ পাঁচ ॥

সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ একটা ফলে ভরা গুলমোহরের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে ওয়াকিটকি। কার সঙ্গে ওয়াকিটকিতে কথা বলছিলেন। কর্নেলকে দেখে কথা বন্ধ করে স্যালুট করলেন। তারপর কর্নেল কাছে গেলে আস্তে বললেন, কথা হলো?

কর্নেল বললেন, স্ট্রং নার্ভের মানুষ। সত্যিই ইয়াপ্পি।

ওঁর অ্যালিবাইও স্ট্রং। কিন্তু চিন্তা করুন স্যার! স্ত্রী অমন একটা সাংঘাতিক চিঠি লিখে গেছেন। অথচ উনি নিজে খোঁজ নিতে না গিয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। পুলিশ যাই বলুক, আমার খটকা লেগে আছে। চিঠিটা সম্পর্কে কী বললেন উনি?

চিঠিটার কথা তুলিনি। বলে কর্নেল চারিদিকটা দেখে নিলেন। ই ব্লক কোনটা?

ওই তো! বি ব্লকের পেছনে। পাশে একটা ছোট পুকুর আছে। একসময় পুরো তিন একর জলা ছিল। ভরাট করে এই হাউজিং কমপ্লেস গড়া হয়েছিল। পুকুরটা তার চিহ্ন।

চলুন। স্পটটা একটু দেখে যাই।

এ এবং বি ব্লকের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ রাস্তা। দুধারে কেয়ারি কার গুল্মলতা। রাস্তাটা গিয়ে বেঁকেছে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে। সুদৃশ্য এ-কালীন স্থাপত্য। তবে অন্য ব্লকের বাড়িগুলোর তুলনায় এটা ছোট। বোঝা যায়, পুকুরটা টিকিয়ে রাখার প্ল্যান বাড়িটাকে ছোটো করেছে। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড উর্দি পরে ঘাসে বসেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল। একটা বিশাল নাগকেশরের গাছ ছায়া ফেলেছে সামনের লনে।

কর্নেল বললেন, এটা শেষ প্রান্ত?

রণধীর বললেন, হ্যাঁ স্যার! ওই দেখুন বাউন্ডারি ওয়াল। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে আসা যায় না। দেওয়াল যথেষ্ট উঁচু এদিকটায়।

দেওয়ালের ওপারে কি আছে?

মাছের ভেড়ি। কাজেই খুনী বাইরের লোক হতেই পারে না। আপনাকে আগেই বলেছি রাত ন'টার পর সিকিউরিটি চেকিং ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না সানশাইনে। এদিকে আসুন!

বাড়ির নিচের তলায় গাড়ির গ্যারাজ এবং পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। একপাশে দুটো লিফ্‌ট। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে কর্নেল চারদিক দেখছিলেন। মাত্র দুটো গাড়ি। তেরপলের কভারে একটা গাড়ি ঢাকা। অন্যটার গায়ে হেলান দিয়ে উর্দিপরা ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন মনে খৈনি ডলছিল।

রণধীর বললেন, ২ নং লিফ্‌ট আগামীকাল সারাতে লোক আসবে। আজ এসেছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের কাজ করতে দেয়নি।

bengalidownload.com

১ নং লিফ্‌ট ওপরে তিনতলায় আছে। কারণ ২ নম্বরে লাল আলো। কর্নেল বোতাম টিপলেন। লিফ্‌ট নেমে এল। রণধীর বললেন, একটুখানি রক্ত ছিল, ধুয়ে ফেলা হয়েছে। মিসেস দাশগুপ্তের মাথার ডানদিকে গুলি করা হয়েছিল। লিফটের বাঁ-কোনায় কাত অবস্থায় বডি ছিল। সেকেন্ড ফ্লোর?

কর্নেল মাথা দোলালেন।

তিনতলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েই কর্নেল লিফটের দিকে তাকালেন। সেই সময় উল্টোদিকের ঘরে কুকুরের গর্জন শোনা গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে কর্নেল বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে লিফটের ওপরটা, দুই পাশ এবং নিচের অংশ লক্ষ্য করলেন। তারপর বাঁদিকে সিঁড়ির কাছে গেলেন। দেওয়ালে চৌকো সিমেন্টের ঝরোকা। ফাঁক দিয়ে বিশাল ভেড়ি চোখে পড়ে। ঝরোকার একটা ফাঁকে ইঞ্চিটাক জায়গা খসে গেছে। কর্নেল তিন ধাপ নেমে সেখানটা ছুঁলেন।

রণধীর একটু হেসে বললেন, মিঃ দেববর্মন সত্যিই এক রাউন্ড ফায়ার করেছিলেন। তাঁর ফায়ার আর্মসের গুলি এখান দিয়ে বেরিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তার মানে, খুনীকে তিনি সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে পালাতে দেখেছিলেন।

কিন্তু ১০ নম্বরের অগ্রবালজি কোনও গুলির শব্দ শোনেননি!

কুকুরের গর্জন। তাছাড়া তাঁর মন ছিল কুকুরের দিকে। ওই তো শুনছেন! আমার মতে কুকুরটার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার। ভদ্রলোককে বলবেন।

রণধীর গম্ভীরমুখে বললেন, বলব।

অগ্রবালজির কীসের কারবার জানেন?

ল্যাক এক্সপোর্ট করেন শুনেছি। আপনি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে—

নাহ্ কুকুরটা বড্ড বাজে। নিশ্চয় কোনো অসুখে ভুগছে। আর কুকুর সম্পর্কে আমার অ্যালার্জি আছে।

রণধীর হাসলেন। আমি কিন্তু ডগ-লাভার সোসাইটির মেম্বার স্যার!

কর্নেল সিঁড়ি থেকে উঠে করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন। করিডর বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ১৩ নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। নেমপ্লেটে লেখা আছে সি এন দেববর্মন। বাঁদিকেরটায় লেখা মিসেস আর খুরশিদ। ডানদিকেরটাতে প্রোফেসর এস কে রায়, এম. এ, পি-এইচ. ডি। লকে একটা কালো প্লেট ঝোলানো। তাতে লেখা আছে 'প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব।'

কর্নেল ভাবছিলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনের স্টেটমেন্টের কথা। অরিজিৎ লাহিড়ির মুখে সেটা শুনেছেন। মিলে যাচ্ছে। চন্দ্রনাথ মিথ্যা কিছু বলেননি। কিন্তু মউ কেন তাঁকে টেলিফোন করেছিল এবং কেনই বা ছুটে এসেছিল প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে— তাঁকে বাঁচতে? এই জটটা ছাড়ানো যাচ্ছে না। চন্দ্রনাথ তাকে নাকি চিনতেনই না। বলেছেন, দেখে থাকতে পারি, আলাপ ছিল না।

রণধীর বললেন, পুলিশ মিঃ দেববর্মনের ঘর সিল করে গেছে।

হুঁ! দেখতে পাচ্ছি। তো এই প্রোফেসর ভদ্রলোকের বয়স কত— আনুমানিক?

ওঁকে খুব কম দেখেছি। ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই হবে। খুব দাম্ভিক টাইপ।

একা থাকেন?

না স্যার! ওঁর স্ত্রী সানশাইন কালচারাল কমিটির সেক্রেটারি। নাচ গান নাটক এসব নিয়ে থাকেন। এ ব্লকে কালচারাল কমিটির অফিস। এখন ঘরেই থাকার কথা। আলাপ করবেন?

কর্নেল কালো প্লেটটার দিকে আঙুল তুলে সকৌতুকে চাপাস্বরে বললেন, প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব।

এই সময় বাঁদিকে মিসেস খুরশিদের ঘর থেকে জিনস ব্যাগি শার্টপরা এক তরুণ বেরুল। হঠাৎ দেখলে সাহেব মনে হয়। সে কর্নেলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রণধীরকে বলল, হাই সিনহা!

হাই কুমরো!

সে হাসল। মাই গ্র্যান্ডমা ইজ ওয়েট।

ও নটি বয়! সি ইজ অ্যান অনারেবল লেডি, মাইন্ড দ্যাট!

ম্যান! ইউ আর কিলিং লাভ্‌লি গার্লস— হোয়াটস হার নেম, আই থিংক্ সি ওয়াজ আ ফিল্মস্টার— ইজ ইট? ও কে! বাই!

সে চলে গেল শিস দিতে দিতে। রণধীর বিকৃত মুখে বললেন, ডার্টি জেনারেশন!

মিসেস খুরশিদ পার্শি মহিলা।

হ্যাঁ স্যার! বড় ব্যবসা আছে। ছেলেরা চালায়। বৃদ্ধা মাকে এখানে রেখেছে। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা তাঁর দেখাশুনা করেন।

কর্নেল ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আশ্চর্য তো!

কী স্যার?

কলকাতার পার্শিরা নিজস্ব এরিয়া গড়ে নিয়েই বাস করেন। তাঁদের নিজস্ব সোসাইটি আছে। অথচ এখানে এই বৃদ্ধা মহিলাকে নির্বাসনের মতো রাখা হয়েছে কেন? উনি চলাফেরা করতে পারেন?

হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। পায়ের অসুখ আছে।

আমরা এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব।

ও কে।

সিঁড়িতে নামতে নামতে কর্নেল বললেন, সিঁড়ি ধোয়া হয়েছে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ স্যার! তবে গত রাতে আমি নিজে থরো চেক করেছিলাম। পুলিশও করেছিল। সিঁড়িতে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। নাথিং।

ফার্স্ট ফ্লোরটা একটু দেখতে চাই।

pathagar.net

এ ফ্লোরে কোনও অ্যাপার্টমেন্ট নেই। ন'টা ঘর আর একটা কমন বাথরুম আছে। সারভ্যান্টস রুম। কোনওটাতে কারও ড্রাইভারও থাকে। আসলে অফিস হিসেবে ভাড়া দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু কর্পোরেশন হাউজিংয়ের প্ল্যানেই স্যাংশন করেছে। কাজেই—

বুঝেছি।

নিচের লনে পৌঁছে রণধীর বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার লাঞ্চ আমার কোয়ার্টারে সেরে নিলে কৃতার্থ হব।

থ্যাঙ্কস্! আরেকদিন হবে। আজ চলি।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রণধীর বললেন, আমাকে একটু মনে রাখবেন স্যার! তাই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল হিয়ার।

বুঝতে পারছি।

রাতের ঘটনার পর সিকিউরিটি কঠোর করা হয়েছে। বড় রাস্তায় একটা পুলিশভ্যানও দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলকে খাতায় ফের নাম সই করে ডিপারচার টাইম লিখে বেরুতে হলো। কয়েক পা এগিয়েই একটা ট্যাক্সি পেলেন। কোনও খালি ট্যাক্সি এ পর্যন্ত তাঁকে না করে না।

ইলিয়ট রোডে তিনতলায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলে ষষ্ঠী বলল, নালবাজারের নাহিড়িসায়েব ফোং করতে বলেছেন।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, করছি ফোং। তুই খাবার রেডি কর।

টেলিফোনে অরিজিৎকে পেয়ে বললেন, নতুন কিছু ঘটেছে?

রঙ্গনাথনকে ট্রেস করেছি।

কোথায়?

হোটেল কন্টিনেন্টালে। তবে নজর রাখা হয়েছে মাত্র।

কত নম্বরে?

সুইট নাম্বার ১২৭। সিক্সথ ফ্লোর। আমি বলি কী, প্রথমে আপনি গিয়ে কথা বলুন।

ঠিক আছে। শোনো! সানশাইনে গিয়েছিলাম। এখনই ফিরছি।

খবর পেয়েছি। কিছু পেলেন নাকি?

নাহ্।

ওঃ ওল্ড বস! হাতের কার্ড এখন শো করবেন না জানি। ও কে!

আমি ক্ষুধার্ত, ডার্লিং!

সরি। ছাড়লাম...

খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ড্রয়িংরুমে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। শান্তশীলকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কেন সে অমন সাংঘাতিক চিঠি পেয়েও নিজে ছুটে যায়নি ই ব্লকে এবং সিকিউরিটি অফিসারকে বলেছিল খোঁজ নিতে?

সন্দেহের তালিকায় এখন সে এক নম্বরে উঠে এল। চিঠিটা পাওয়ার পর ছুটে গিয়ে বউকে গুলি করে মেরে ভালমানুষ সেজে সে সিকিউরিটিতে ফোন করে থাকবে। তার কোনও লাইসেন্স্‌ড্‌ আর্মস নেই, তা ঠিক। কিন্তু তার বউ প্রাক্তন ফিল্মস্টার। চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ থাকতেই পারে। মেলশোভিনিস্ট টাইপের ইয়াপ্পি। সুন্দরী মেয়েদের সে কেরিয়ারের অংশ হিসেবেই করায়ত্ত করতে পারে এবং গণ্য করতে পারে এও অর্জিত সম্পদ বলে।

তার ড্রাইভার আক্রাম বলেছে, সকালে সায়েব-মেমসায়েবের বহরমপুরে যাওয়ার কথা ছিল। এটা অবশ্য শান্তশীলের একটা চাল হতেও পারে। ভুবনেশ্বরে বসেই বউকে কোনও ছলে খুন করার প্ল্যান ছকে থাকতেও পারে।

শুধু ওই চিঠিটা—

কিন্তু হঠাৎ চিঠিটা শান্তশীলকে খুন করার দৈবাৎ সুযোগ দেয়নি তো? মার্ডার-উইপন পাঁচিলের পেছনে ছুড়ে ফেললেই ভেড়ির অগাধ জলে তালিয়ে যাবে।

কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলোচ্ছিলেন। একসময় চোখ খুললেন। নাহ্‌। ইয়াপ্পিরা খুন-খারাপির পথে কদাচ হাঁটে না। এ যুগের এক প্রজন্মের এই বিচিত্র মানসিকতা! তা শুধু পেশাগত দক্ষতাকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবলম্বন গণ্য করে। পেশাগত দক্ষতাই তার মূলধন। আগের দিনের নিষ্ঠাবান কারিগরদের মতো সে ক্রমাগত কুশলী হতে চায়।

শান্তশীল বলছিল ভুবনেশ্বরের রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যস্ত সে। এটাই প্রকৃত ইয়াপ্পির চরিত্রলক্ষণ। নাহ্‌। কর্নেলের চোখে এযাবৎকাল দেখা অতি ধূর্ত খুনীর আদলেও মেলানো যায় না এক ইয়াপ্পির মুখের।

সন্দেহের তালিকা থেকে নেমে গেল শান্তশীল।

এবার প্রশ্ন, চন্দ্রনাথ কি সত্য কথা বলছেন পুলিশকে? যাকে চেনেন না, সে কেন তাঁকে বাঁচানোর জন্য অত ঝুঁকি নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যাবে?

চন্দ্রনাথের জামিন পেতে অসুবিধে হবে না। কোটিপতি লোক। তাছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটার পুলিশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জামিনে আপত্তি করবেন না সম্ভবত। তিনি আপত্তি না করলে ম্যাজিস্ট্রেটেরও আপত্তির কথা নয়। চন্দ্রনাথ সিগগির জামিন পেলেই ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বললে কোনও সূত্র মিলতেও পারে। তার আগে—

কর্নেল টেলিফোন তুলে হোটেল কন্টিনেন্টাল ডায়াল করলেন। মহিলা রিসেপশনিস্টের মিঠে গলা ভেসে এল। কর্নেল বললে, প্লিজ পুট মি টু সুইট নাম্বার ওয়ান টু সেভেন।

প্লিজ হোল্ড অন, স্যার।

ওকে!

কিছুক্ষণ পরে রিসেপশনিস্ট বলল, সরি স্যার! রিং হচ্ছে কেউ ধরছেন না।

কর্নেল ফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন। পোশাক বদলাতে গেলেন পাশের ঘরে।...

banglaboi.blogspot.com

॥ ছয় ॥

হোটেল কন্টিনেন্টাল নতুন পাঁচতারা হোটেল। কর্নেল লাউঞ্জে ঢুকে দেখলেন ইতস্তত সাজিয়ে রাখা সুদৃশ্য আসনে নানা বয়সের পুরুষ এবং মহিলা বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে সাদা পোশাকে পুলিশও থাকার কথা। পাশে কাচের দেওয়ালের ওধারে বার। রিসেপশন কাউন্টারে সায়েব-মেমসায়েবদের দঙ্গলও ছিল। কর্নেল গিয়ে এক মহিলা রিসেপশনিস্টকে মৃদুস্বরে বললেন, সুইট নাম্বার ওয়ান টু সেভেনে মিঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

জাস্ট আ মিনিট স্যার! বলে মহিলা পেছনে বোর্ড দেখে নিলেন। তারপর ফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, রিং হয়ে যাচ্ছে।

উনি বেরিয়ে যাননি তো?

না স্যার! বেরিয়ে গেলে কি বোর্ডে চাবি দেখতে পেতাম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, উনি ডাইনিংয়ে থাকতে পারেন কি?

সম্ভবত না। এক মিনিট প্লিজ! ফোনে কান রেখে তরুণী রিসেপশনিস্ট পাশের এক যুবককে বলল, সুজিত! মিঃ রঙ্গনাথনের ঘরে কি লাঞ্চ পাঠানো হয়, নাকি উনি ডাইনিংয়ে খেতে আসেন? আমি তো জানি উনি ডাইনিংয়ে খেতে আসেন না। তা ছাড়া এখন— সরি! সাড়ে তিনটে বাজে।

যুবকটি কর্নেলের দিতে তাকিয়ে বলল, মিঃ রঙ্গনাথন জানিয়েছিলেন লাঞ্চ পাঠাতে হবে না শরীর ভাল না।

কখন জানিয়েছিলেন?

অনেকক্ষণ আগে। আপনি কি ওঁর পরিচিত?

হ্যাঁ। বলে কর্নেল নিজের নেমকার্ড দিলেন।

রিসেপশনিস্ট ফোন নামিয়ে রেখে অন্য কাজে মন দিল। যুবকটি বলল, মিঃ রঙ্গনাথন মর্নিংয়ে বেরিয়েছিলেন। এগারোটা নাগাদ ফিরে আমাকে বলে যান শরীর খারাপ। কেউ এলে যেন ওঁর ঘরে পাঠিয়ে দিই। আপনি যেতে পারেন। সিক্সথ ফ্লোর। ওয়ান টু সেভেন।

কর্নেল লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেলেন। লিফটের সামনে ছোট্ট লাইন ছিল। লিফ্‌ট ছিল এইট্‌থ ফ্লোরে। এবার নামতে শুরু করেছে। কর্নেলের পেছনে একজন এসে দাঁড়াল। কর্নেল ঘুরে দেখেই হাসলেন। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর বিমল হাজরা। হাজরা খুব আস্তে বললেন, সামথিং রং স্যার। বলছি'খন।

সিক্সথ ফ্লোরে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে হাজরা বললেন, এক ঘণ্টা আগে আমি মিট করতে চেয়েছিলাম। রিসেপশনিস্ট বলল, রিং হচ্ছে। ফোন ধরছেও না কেউ। আপনি না এলেও এবার আমি চেক করতাম।

১২৭ নম্বর সুইটের দরজায় ল্যাচকি সিস্টেম। হাজরা দরজায় নক করলেন। কোনও সাড়া এল না। আবার কিছুক্ষণ নক করলেন। সাড়া এল না। পশ্চিমি

বীতি মেনে চলা হয়েছে সুইটে। কোনও ডোরবেল নেই। এই হোটেলে বিদেশিরাই এসে থাকেন। বেশির ভাগ লোক ব্যবসায়ী।

কর্নেল বাধা দেওয়ার আগেই উত্তেজিত হাজরা ল্যাচকিয়ের হাতল ঘোরালেন। দরজা খুলে গেল। তাহলে খোলাই ছিল দরজা!

প্রথমে বসার ঘর। পেছনে কাশ্মীরি নকশাদার কাঠের পার্টিশান। তার ওধারে চওড়া বিশাল বেডরুম। জানালার দিকে ভারি পর্দা। মেঝেয় পা দেবেযাওয়া কার্পেট। ইজিচেয়ার। কোনায় একটা বড় টি ভি।

বিছানার ওধারে মেঝেয় রক্তিম কার্পেটের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে মধ্যবয়সী বেঁটে একটা লোক। পরনে টাইস্যুট, পায়ে জুতো। শ্যামবর্ণ লোকটার মুখে পুরু গোঁফ আছে। তার ঝাঁকড়া চুল রক্তে লাল। কর্নেল, ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে মাথার ডানদিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করা হয়েছে মিঃ হাজরা! মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। রিসেপশনের নাম্বার ফোনের চার্টে পেয়ে যাবেন। নিজের পরিচয় দিয়ে ম্যানেজারকে আসতে বলুন। না— অন্য কোনও কথা নয়। শুধু বলুন, এটা আর্জেন্ট।

হাজরা বিছানার পাশে নিচু টেবিলে রাখা ফোনের কাছে বসলেন। ডায়াল করলেন।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা দেখছিলেন। মেঝের কার্পেট জায়গায় জায়গায় এলোমেলো হয়ে আছে। রক্তের ছোপ লক্ষ্য করতে করতে বসার ঘরে গেলেন। সোফায় রক্তের ছিটে আছে। কথা বলতে বলতে লোকটাকে খুনী গুলি করেছে। তারপর টানতে টানতে বেডরুমের ওপাশে নিয়ে গেছে।

হাজরা তাঁর পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে করিডরে দাঁড়ালেন। কর্নেল মেঝে থেকে একটা নেমকার্ড কুড়িয়ে নিলেন। 'রঞ্জন রায়। ভিডিওজোন। ২৮/সি সাউদার্ন রো, কলকাতা-১৭।' ওপরে ডানকোণে একটা টেলিফোন নম্বর। টেবিলে একটা হুইস্কির বোতল। বিদেশি হুইস্কি। দুটো গ্লাস কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। কর্নেল নেমকার্ডটা পকেটে ভরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাথরুমে কেউ নেই।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে ম্যানেজার এলেন। লম্বা সুদর্শ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মুখে প্রচণ্ড উদ্বেগ থমথম করছে। এনিথিং রং স্যার?

হাজরা তাঁকে ইশারায় ঘরে আসতে বললেন। তারপর ম্যানেজার প্রায় আর্তনাদ করলেন, ও মাই গড!

কর্নেল দ্রুত বললেন, প্লিজ হইচই করবেন না। যা করার পুলিশ করবে। আপনি ততক্ষণ আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি হোটেল কন্টিনেন্টালের ম্যানেজার? আপনার নাম বলুন প্লিজ!

ব্রিজেশ কুমার। বাট—

আপনি চিনতে পারছেন বডিটা কার?

মিঃ রঙ্গনাথনের। বড় ব্যবসায়ী। হংকংয়ে ওঁর কারবার। কলকাতা এলে আমাদের এখানেই ওঠেন।

boiRboi.blogspot.com

হাজরা স্থানীয় থানায় ফোন করার পর লালবাজারে ফোন করতে ব্যস্ত হলেন।

কর্নেল বললেন, মিঃ কুমার! আপনাদের কোন বোর্ডারের সঙ্গে কে দেখা করতে আসছে, তার রেকর্ড থাকে কি?

না— মানে, রিসেপশনে কেউ এসে কোনও বোর্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁর ঘরে রিং করে জেনে নেওয়া হয়। বোর্ডার হ্যাঁ করলে পাঠানো হয়। তবে ওই দেখুন নোটিশ। রাত ন'টার পর কোনও একা মহিলা বা পুরুষ বোর্ডারের ঘরে কোনও পুরুষ বা কোনও মহিলা ভিজিটারের প্রবেশ নিষেধ।

মিঃ রঙ্গনাথন কি এমন কোনও নির্দেশ কখনও দিয়েছিলেন কিছু ঘটলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

হ্যাঁ স্যার। ওটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মিঃ রঙ্গনাথনের রেফারেন্স আমি রেকর্ড দেখে জানাতে পারি।

আজ শেষবার কখন আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল?

সকাল ন'টায়। উনি বেরুনোর সময় আমাকে বলে গিয়েছিলে, ১০ টার পর ফিরবেন। কেউ এলে যেন জানিয়ে দিই। অবশ্য তারপর কখন ফিরেছিলেন আমি জানি না। রিসেপশনে জানা যাবে।

উনি কবে হংকং ফিরবেন বলেছিলেন আপনাকে?

৩১ মার্চ সকালের ফ্লাইটে।

উনি এখানে ওঠেন কোন তারিখে এবং কখন?

২৭ মার্চ ইভনিংয়ে। হংকং থেকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। বরাবর তা-ই করেন।

আপনার হোটেলে সিকিউরিটি সিস্টেম কী রকম?

ভেরি স্ট্রং স্যার। প্রত্যেক ফ্লোরে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড আছে। তাদের ওয়াকিটকি আছে। তবে— ম্যানেজার কষ্ট করে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। তবে ইউ নো স্যার, দিস ইজ আফটার অল ইন্ডিয়া। আমি ওয়েস্টের হোটেলের সিস্টেম দেখেছি। আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র— মানে, কর্তব্যবোধে শৈথিল্য আছে, তা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এই ফ্লোরের গার্ডদের কাছে কৈফিয়ত চাইব। কারণ এতে হোটেলের সুনাম হানি শুধু ঘটল না, নিরাপত্তার প্রশ্নও—

ম্যানেজার নার্ভাস হয়ে থেমে গেলেন। এয়ারকন্ডিশনড ঘরেও তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা। আড়ষ্ট হাতে রুমালে মুখ মুছলেন।

কর্নেল বললেন, মিঃ হাজরা। আমি মিঃ কুমারের সঙ্গে রিসেপশনে যাচ্ছি।

আচ্ছা স্যার...

ব্রিজেশ কুমারকে লিফ্‌টে ঢুকেই কর্নেল বলেছিলেন, রিসেপশনে এখনই কাকেও কিছু জানাবেন না যেন। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশন, লাউঞ্জে এবং

বাইরে রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন আছে। পুলিশ যা করার করবে। তার আগেই আমাকে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেবেন। ডোন্ট ওয়ারি প্লিজ!

কিন্তু রিসেপশন কাউন্টারে ম্যানেজারের চেহারা দেখে কর্মীরা একটা কিছু আঁচ করেছিলেন। কর্নেল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লাউঞ্জের এক কোণে নিরিবিলি জায়গায় বসলেন। লক্ষ্য করলেন, কর্মীরা কেমন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটু পরে মিঃ কুমার কর্নেলের কাছে এলেন। হাতে একশিট কাগজ। বসে চাপাস্বরে বললেন, মিঃ রঙ্গনাথনের রেফারেন্স কম্পিউটারাইজড্ করা ছিল। এই নিন। সুজিত চৌধুরি নামে রিসেপশন কাউন্টারে একটি ছেলে আছে। সে বলল, এগারোটায় রঙ্গনাথন ফিরেছিলেন। শরীর খারাপ। লাঞ্চ খাবেন না।

জানি। রঙ্গনাথনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি না?

ওঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে উঠতে দেখেছিল সুজিত।

আপনি সুজিতবাবুকে ডাকুন।

সুজিত তাকিয়েছিল এদিকে। ম্যানেজারের ইশারায় চলে এল। কর্নেল বললেন, রঙ্গনাথনের সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর চেহারা মনে আছে আপনার?

সুজিতকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল, দাড়ি ছিল। চোখে সানগ্লাস। মোটামুটি ফর্সা।

পোশাক?

জিনস, লাল শার্ট—

কী বয়সী?

সুজিত একটু ভেবে বলল, অত লক্ষ্য করিনি। তবে আমার বয়সী—

আপনার বয়স কত?

২৮ বছর স্যার!

রঙ্গনাথনের সঙ্গীর হাতে কিছু ছিল?

হাতে? নাহ্। দেখিনি?

আপনি সিওর?

হ্যাঁ স্যার।

ঠিক আছে। আপনি আসুন।

সুজিত চলে যাওয়ার পর মিঃ কুমার বললেন, কন্টিনেন্টালে এই প্রথম মিসহ্যাপ। আমার কেরিয়ারের ক্ষতি হবে। আমার আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। বললেন, কেন?

ব্রিজেশ কুমার বিব্রতভাবে বললেন, রঙ্গনাথন হংকংয়ের ব্যবসায়ী। রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে, বিশেষ করে হংকং থেকে আসা লোকেদের সম্পর্কে যেন ওঁদের খবর দিয়ে রাখি। আগে যতবার রঙ্গনাথন

bengalidownload.com

এসেছেন, খবর দিয়েছি। এবারই দিইনি। কারণ ভদ্রলোককে আমার অনেস্ট বলে মনে হয়েছিল। খুব মিশুকে মানুষ ছিলেন। খুব আমুদে।

কর্নেল কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনের নাম ঠিকানা লেখা আছে। কাজেই সানশাইনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের যোগ আছেই। লাউঞ্জে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা। শুধু রিসেপশনের কর্মীদের মধ্যে কেমন চাপা চাঞ্চল্য। ওরা এদিকে বারবার তাকাচ্ছে।

কর্নেল বললেন, মিঃ কুমার! আপনি নিজের জায়গায় যান।

ম্যানেজার আড়ষ্টভাবে বললেন, আপনার পরিচয় পেলে খুশি হতাম স্যার!

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড দিলেন। ব্রিজেশ কুমার চলে গেলেন। এতক্ষণে পুলিশ এল। বেশ বড় একটা দল। অমনই লাউঞ্জে চমক খেলে গেল। যে যেখানে ছিল চুপ করল। পুলিশের দলটি লিফটে উঠে যাওয়ার পর কর্নেল বেরিয়ে পড়লেন।...

ইলিয়ট রোডে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ষষ্ঠীকে কফি করতে বললেন। জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে টেলিফোন তুললেন।

একটু পরে ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির সাড়া এল। হাই ওল্ড বস! আপনি আমাকে ডোবাবেন দেখছি! আচ্ছা, সত্যি কথাটা বলুন তো? আপনি কি রক্তের গন্ধ পান ইলিয়ট রোডের তিনতলা থেকে?

তুমি আমাকে অবশ্য ব্লাডহাউন্ড বলে সম্মান দিলে ডার্লিং! জয়ন্ত চৌধুরী আমাকে শকুন বলে!

হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার প্রোতেজে ভদ্রলোক কোথায়?

মাস তিনেকের জন্য ইওরোপে ঘুরতে গেছে। ওর কাগজের খরচে।

পিটি! দৈনিক সত্যসেবক একটা বড় রহস্য মিস করল।

অরিজিৎ! চন্দ্রনাথ দেববর্মন কি লকআপে?

নাহ্। ওঁকে ছাড়া হয়েছে। অন কনডিশন, অব কোর্স!

কোর্ট সঙ্গে সঙ্গে জামিন দিল?

কোর্ট? হাসালেন বস! সঙ্গে সঙ্গে আসামি কোর্টে তোলে পুলিশ? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে অবশ্য তুলতে হয়। কিন্তু সেটা কাগজকলমের ব্যাপার। পুলিশ এ ধরনের সিরিয়াস জটিল কেসে ঝটপট কোর্টে তোলে না আসামিকে। জেরা, দরকার হলে থার্ড ডিগ্রি— না! মিঃ দেববর্মনেকে মর্গের রিপোর্ট পেয়েই সসম্মানে ছাড়া হয়েছে। প্রসিকিউশন উইটনেস তিনি। ব্যাপারটা বুঝলেন কি? ইউ আর নট সিটিং আইড্‌ল্।

রাখছি অরিজিৎ! পরে কথা হবে।...

কর্নেল এবার টেলিফোন করলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনকে। রিং হলো অনেকক্ষণ। সাড়া পেলেন না। তখন ফোন করলেন রণধীর সিংহকে। রণধীরকে চন্দ্রনাথ

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, লকআপ থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রলোক ফিরে এসেছিলেন। কলকাতার বাইরে যাবেন বলে বেরিয়েছেন। ওঁর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে গেছেন। তবে রণধীরের ধারণা, বেশি দূরে যাননি চন্দ্রনাথ। কারণ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। কালই ফিরবেন।

॥ সাত ॥

টিনা মুখার্জি বিকেল সওয়া পাঁচটায় মেট্রো সিনেমার উল্টোটা দিকে তার ক্রিমরঙের মারুতি দাঁড় করাল। সানগ্লাস খুলে দেখে নিল ওদিকটা। এখনও পৌঁছয়নি রঞ্জন। টিনার পনের মিনিট দেরি হয়েছে পর-পর দু'জায়গায় জ্যামের জন্য। রঞ্জনও সাউথ থেকে আসবে। তাই তাকেও জ্যামে পড়তে হয়েছে।

এই ভেবে টিনা তার গাড়ি পার্ক করল সানগ্লাস পরেই বসে রইল ড্রাইভিং সিটে। রঞ্জনের ট্যাক্সি করে আসার কথা। ওর গাড়িটা নাকি গ্যারাজে।

টিনার বাবা অনির্বাণ মুখার্জি খ্যাতিমান ডাক্তার। নিজের নার্সিংহোম আছে নিউ আলিপুরে। টিনা একমাত্র সন্তান। টিনার মা ঋতুপর্ণা সমাজ সেবায় ব্যস্ত স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সারাক্ষণ নিজের-নিজের ব্যাপারে মেতে থাকলে যা হয়। টিনা 'স্পয়েল্ড চাইল্ড' হিসেবে বেড়ে উঠেছে। দার্জিলিঙে একটা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী ছিল। প্রায়ই না বলে পালিয়ে আসত। তারপর আর লেখাপড়ায় তাকে ভেড়ানো যায়নি। হিন্দি ফিল্মের হিরোইনরা তার জীবনের আদর্শ। আয়নায় নিজেকে সে সুন্দর দেখে। অন্যেরা তার রূপের প্রশংসা করে। কিছুদিন আগেও তার এক নেপালি বয়ফ্রেন্ড ছিল। সে তাকে ডায়না বলত। কিন্তু একদিন অতর্কিতে চুমু খেয়ে ফেলায় টিনা তাকে চড় মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাভ ফানস, বাট নট এনি সেক্স।

রঞ্জনের সঙ্গে টিনার আলাপ হয়েছিল তাদেরই বাড়িতে। মাঝে মাঝে রঞ্জন তার বাবার কাছে আসত। কেন আসত টিনা জানে না। একদিন কথায় কথায় রঞ্জন বলেছিল, আপনার ফটোজেনিক ফেস। ভয়েস সো সুইট! অভিনয় শিখে নিলে আপনার সাকসেস অনিবার্য!

এইভাবে টিনার একটা স্বপ্ন দেখার সূচনা। রঞ্জনকে দেখলেই সে স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে যায়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় রঞ্জন টেলিফোনে জানিয়েছিল, একটা যোগাযোগ ঘটে গেছে। হংকংয়ের এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তিনি বিদেশের জন্য টেলিফিল্ম করছেন। বড়রকমের উদ্যোগ। কিন্তু নতুন মুখ চান। ২৮ মার্চ টিনার সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবে। সেদিনই সকালে সে টিনাকে রিং করে সময় জানাবে।

তারপর গতকাল ২৮ মার্চ সারাদিন প্রতীক্ষা করেও রঞ্জনের পাত্তা নেই। তার নাম্বারও জানা ছিল না টিনার। আজ বেলা একটায় রঞ্জনের ফোন। টিনা! আমি দুঃখিত। মিঃ রঙ্গনাথন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। আজ বিকেল ৫ টায় তোমার সময় হবে কি?

boiRboi.blogspot.com

টিনা কিছু না ভেবেই বলেছিল, কেন হবে না? আমার তো গাড়ি আছে।

তাহলে তুমি মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে ঠিক পাঁচটায় আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার গাড়ি গ্যারাজে। ট্যাক্সি করে যাব। আর একটা কথা। তুমি শাড়ি পরে যাবে কিন্তু!

ঠিক আছে কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

কেন? মিঃ রঙ্গনাথনের কাছে।

কোথায়?

হোটেল কন্টিনেন্টালে উনি উঠেছেন।

ক'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

সন্ধ্যা ৬ টায়।

আমি হোটেলের কোনও ঘরে ঢুকব না কিন্তু!

ওঃ টিনা! আমি জানি তুমি খুব সাবধানী মেয়ে। তবে ভয়ের কিছু নেই। ফাইভস্টার হোটেল। তুমি নিশ্চয় নাম শুনেছ!

আমি লাউঞ্জে বসে কথা বলব।

ও কে! ও কে টিনা তবে উনি ব্যস্ত মানুষ। যদি তখনই তোমার স্ক্রিন টেস্ট করার ব্যবস্থা করেন এবং তুমি যদি পিছিয়ে যাও, তাহলে আমি কিন্তু অপ্রস্তুত হব। ভেবে দেখ।

কোথায় স্ক্রিন টেস্ট হবে?

পার্ক স্ট্রিট এরিয়ায় ওঁর স্টুডিও আছে।...টিনা? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? দেখ, আমি তো সঙ্গেই থাকছি তোমার। আমাকে তোমার বাবা চেনেন। এ একটা বড় সুযোগ টিনা! তোমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করো।

এ সব কথা ইংরেজিতেই হয়েছে। টিনা বাংলা বলে কদাচিৎ। সে রঞ্জনের এই শেষ কথাটাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।...

ঘড়ি দেখল টিনা। পাঁচটা কুড়ি বাজে। ফিরে যাবে নাকি?

সেই সময় হঠাৎ তার মনে হলো, রঞ্জন তার গাড়ি চিনতে না-ও পারে। অজস্র রঙবেরঙের গাড়ি পার্ক করা আছে। একই রঙের মারুতিও কম নেই। টিনা গাড়ি থেকে বেরুল। তারপরই দেখতে পেল রঞ্জনকে। এদিকে-ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বেচারা। টিনা হাসল।

একটু পরে টিনাকে দেখতে পেল রঞ্জন। হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলল, কতক্ষণ এসেছ?

অনেকক্ষণ।

আমি তো খুঁজে হয়রান। শিগগির।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণে ঘোরালো টিনা। কিছুক্ষণ পরে মোড় পেরিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাস করল, হোটেল কনিটেনেন্টাল এ জে সি বোস রোডে না?

হ্যাঁ। কিন্তু মিঃ রঙ্গনাথন শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন ওঁর স্টুডিওতে দেখা হবে।

পার্ক স্ট্রিট?

ওই এরিয়ায়। সামান্য একটু ভেতরে। তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। আমি আছি।

পার্ক স্ট্রিটে রঞ্জনের নির্দেশমতো একটা সংকীর্ণ ঘোরালো রাস্তায় ঢুকল টিনা। তারপর রঞ্জন একখানে বলল, এখানেই রাখো।

গলি রাস্তা আলো কম। কোনও রকমে দুটো গড়ি পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে। গাড়ি লক করার পর টিনা বলল, এ কোথায় আনলে আমাকে?

ওঃ টিনা! একটু সাহসী হও। এস।

বাঁদিকে মিটমিটে আলোয় একটা চওড়া দরজা এবং সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। রঞ্জন বলল, লিফ্‌ট নেই কিন্তু। আমার হাত ধরতে পারো। দোতলায় স্টুডিও। দেখো, সাবধানে।

আমি পারব।

ও কে!

দোতলায় একটা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে রঞ্জন বলল, এখনও এসে পৌঁছাননি দেখছি! আমাকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছেন। চলো, অপেক্ষা করা যাক।

টিনা দেখল দরজার মাথায় ফলকে লেখা আছে 'ভিডিওজোন'। রঞ্জন দরজা খুলে বাংলায় বলল, আরে বাবা! বাঘের গুহা নয়, রীতিমতো স্টুডিও। দেখতে পাচ্ছ না? সে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

টিনা একটু দ্বিধার সঙ্গে ঢুকল। রঞ্জন দরজা বন্ধ করে বলল, উটকো লোক ঢুকে পড়তে পারে। দরজা বন্ধ করাই ভাল। ওই দেখ, ক্যামেরা রেডি করা আছে পাশের ঘরে। সে পাশের ঘরের পর্দা তুলে দেখাল। দরজা খোলা ছিল ওঘরের।

দুটো ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা। দেওয়ালে অজস্র ছবি সাঁটা আছে। সবই দেশি-বিদেশি চিত্রতারকাদের ছবি। মাঝে মাঝে কয়েকটা ন্যুড ছবিও।

এ ঘরে সোফাসেট, অফিসের মতো সাজানো চেয়ার টেবিল আলমারি। পাশের ঘরে শুধু একটা ডিভান। সেটা শেষ প্রান্তে রাখা। অন্য প্রান্তে একটা ম্যুভি ক্যামেরা। স্ট্যান্ডে চাকা লাগানো।

রঞ্জন বলল, যে কোনও মুহূর্তে মিঃ রঙ্গনাথন এসে পড়বেন। তুমি ওই ডিভানে বসো।

টিনা একটু আড়ষ্টভাবে বসল।

রঞ্জন হাসল। প্রচণ্ড আলো ফেলা হবে তোমার ওপর। সহ্য করতে পারবে তো? দেখাচ্ছি।

সে পটাপট কয়েকটা সুইচ টিপে দিতেই এক হাতে চোখ ঢাকল টিনা।

সে কী! হাত নামাও! বি স্মার্ট অ্যান্ড বিউটিফুল! একটা পোজ নিয়ে বসো।

boiRboi.blogspot.com

ভীষণ গরম লাগছে!

ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছি। বলে সে সুইচ টিপে ফ্যান চালিয়ে দিল।

তবু বড্ড গরম।

ওটা কিছু না। সয়ে যায়। তুমি কখনও সুটিং দেখনি মনে হচ্ছে?

নাহ্!

শোনো! তোমার কি ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস আছে? কখনও ড্রিঙ্ক করেছ?

কেন?

একটু ব্র্যান্ডি বা ওয়াইন খেলে তোমার আর গরম লাগবে না। আড়ষ্টতাও কেটে যাবে। দু'এক চুমুক খেয়েই দেখ। আরে বাবা! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আলোগুলো নিভিয়ে রঞ্জন ফের বলল, ওই দেয়ালে কত স্ক্রিন টেস্ট করা মেয়েদের ছবি। প্রথম-প্রথম ওরা ঠিক তোমার মতো বিহেভ করে। তারপর দিব্যি স্মার্ট হয়ে যায়। দু-তিন চুমুক ড্রিঙ্ক যথেষ্ট। নেশা হয় না। কিন্তু আড়ষ্টতা কেটে যায়।

রঞ্জন দেয়ালের সেলার খুলে একটা গ্লাস এবং একটা ব্র্যান্ডির বোতল বের করল।

টিনা আস্তে বলল, আই লাইক ব্র্যান্ডি!

সো নাইস গার্ল ইউ! সো বিউটিফুল! টেক ইউ ইজি! একটু জল মিশিয়ে দিই। কেমন?

রঞ্জন একটা বোতল থেকে জল ঢেলে দিল গ্লাসের ব্র্যান্ডিতে। তারপর গ্লাসটা টিনার হাতে তুলে দিল। টিনা চুমুক দিল। তারপর দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে থাকল। বলল, ওরা কি চান্স পেয়েছে?

সবাই পায়নি। এই যে দেখছ, নীতা সেন। তার প্রথম স্ক্রিন টেস্টের ছবি এটা।

টিনা চোখ বড় করে বলল, নীতা সেন? ইউ মিন—

ইয়া! হাসল রঞ্জন। এখন যার বাজারদর সেভেনটি ফাইভ টু এইট্টি লাখ! বাট মানি ইজ নট দা কোয়েশ্চান!

টিনা পর-পর দুবার চুমুক দিল। তারপর হাসল। লাইট প্লিজ! নাও লেট মি সি, হোয়াট আই ফিল।

রঞ্জন সুইচ টিপলে সেই জোরালো আলোগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল টিনার ওপর। এবার সে চোখ ঢাকল না। রঞ্জন বলল, একটু কাত হয়ে বসো তো! লেন্সে দেখে নিই। হ্যাঁ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো, তোমার হ্যান্ডব্যাগটা ডিভানের ওপাশে নামিয়ে রাখো। দ্যাট লুকস অড!

সে এগিয়ে টিনাকে একপাশে কাত করে বসিয়ে দিল। তারপর ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে বলল, লেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকো। হাসি চাই! ওয়েলডান! এবার গ্লাসে চুমুক দাও!...ও কে!...এবার হ্যাঁ, লজ্জার কিছু নেই। আঁচলটা এমনভাবে ফেলে দাও, যেন নিজে থেকে খসে যাচ্ছে। আই মিন, তুমি তোমার শরীর থেকে

মনকে আলাদা করে দাও। কিপ দেম সেপারেট। ও কে?...নাও, ওপেন দা ব্লাউজ! ইয়েস! শো ইওর ভিগারাস— র‍্যাদার আই সে ডেঞ্জারাস বডি! অ্যান্ড নাও থিঙ্ক! ইওর মাইন্ড ইজ ইওর বডি। ও কে? ওপেন দা ব্রা! ইয়া! গুড! ওয়ান্ডারফুল!...নাও ওপেন ইওরসেল্‌ফ অ্যাজ ইফ এ ফ্লাওয়ার ইজ ব্লসমিং। আন্ডারস্ট্যান্ড?...ও কে! ফাইন!...নাও লাই ডাউন অন দা ডিভান কিপ দা লেফ্‌ট নী আপ!...আপ! আপ! আপ! ওকে!

মুভি ক্যামেরার সুইচ অন করে রেখে রঞ্জন তৈরি হলো। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কামেরার দিকে পেছন ফিরে সে এগিয়ে গেল ডিভানের দিকে। কোনও বাধা পেল না। টিনার চোখ বন্ধ।

একটু পরে রঞ্জন উঠে এসে ক্যামেরা বন্ধ করল। ফিল্মের ক্যাসেটটা বের করে নিল। এটা আসলে ভি ডি ও ক্যামেরা। পোশাক পরে সে জোরালো আলোগুলো নিভেয়ে দিল। টিনার কাছে গিয়ে প্যান্টি, ব্রা, সায়া, ব্লাউজ এবং তারপর শাড়িটা পরানোর চেষ্টা করল। পারল না। শাড়িটা কোনও রকমে জড়িয়ে দিল একুশ বছরের তরুণীর শরীরে।

তারপর সে স্ট্যান্ড থেকে ক্যামেরাটা খুলে একটা ব্যাগে ভরল। কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল স্টুডিও থেকে। দরজা ভেজিয়ে রেখে সাবধানে নেমে গেল নিচে।

গলি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে রঞ্জন ট্যাক্সি খুঁজতে থাকল।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। কিছুক্ষণ বাজার পর বন্ধ হয়ে গেল। আবার স্তব্ধতা। শিলিং ফ্যানটা শোঁ শোঁ শব্দ করলেও সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিওর গভীর স্তব্ধতা সেই শব্দকে গ্রাস করছে। এয়ারকন্ডিশনড্ করার প্ল্যান ছিল রঞ্জনের। কিন্তু রঙ্গনাথন মৃত। মৃতেরা কথা বলে না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে টিনা জাগল। খুব দুর্বল বোধ হলো শরীর। কোথায় শুয়ে আছে বুঝতে পারল না সে। কী একটা স্বপ্ন দেখছিল যেন, ঠিক ফিল্মে যেমন হয়। তার মাথার ওপর একটা ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সচকিত হলো।

উঠে বসার চেষ্টা করল টিনা। কিন্তু মাথা টলমল করছে। দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা। সে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। ক্রমে তার স্মৃতি ফিরে এল। রঞ্জন রায় তাকে এখানে এনেছিল। এই ডিভানে বসে সে কয়েক চুমুক ড্রিঙ্ক করেছিল। তারপর?

তারপর আর কিছু মনে পড়ছে না। তবে পরনের শাড়ি, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি, ব্লাউজ যে ঠিক মতো সে পরে নেই, এটা বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে আরও কী ঘটেছে।

টিনা সহসা নিজের ওপর খেপে গেল। সেই ক্ষিপ্ততা তার চেতনা প্রখর করল ক্রমশ। এবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা হিংস্র কণ্ঠস্বরে বলল, রঞ্জন! ইউ ডার্টি সোয়াইন! সন অফ এ বিচ!

boiRboi.blogspot.com

সে পোশাক গুছিয়ে পরে নিল। তারপর দেখল ক্যামেরার স্ট্যান্ডটা আছে মাত্র। তা হলে সে একটা ফাঁদে পা দিয়েছিল।

কিন্তু এখন আর অনুশোচনার মানে হয় না। সাবধানে পা ফেলে টিনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় মনে পড়ল হ্যান্ডব্যাগটার কথা। ওতে তার গাড়ির চাবি আছে।

ডিভানের ওপাশে মেঝে থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল টিনা। নিচের রাস্তায় নেমে তার গাড়ির কাছে গিয়ে সে দম নিল। তারপর লক খুলে গাড়িতে ঢুকল। এতক্ষণে সে সুস্থবোধ করল।

কিন্তু টিনা মুখার্জি হয়তো তত সুস্থ ছিল না। তার পায়ের চটি ফেলে এসেছে স্টুডিওতে। চটি আনতে যাওয়ার অবশ্য মানে হয় না।...

॥ আট ॥

কর্নেল ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে সাতটা বাজে প্রায়। হোটেল কন্টিনেন্টাল থেকে সোজা গিয়েছিলেন 'ভিডিওজোন'-এর ঠিকানায়। দরজায় তালা দেওয়া ছিল। অন্যপাশে কয়েকটা ছোট কোম্পানির অফিস। খোঁজ নিয়েছিলেন। কেউ জানে না ওই ঘরটা কার, তবে মাঝে মাঝে কেউ-কেউ আসে। পুরুষ এবং মহিলা। ওটা ছবি তোলার ঘর, নাকি ক্যাসেটে গান রেকর্ডিংয়ের, সে-বিষয়ে নানা মত। শুধু একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, বেশির ভাগ সময় ঘরটা বন্ধই থাকে। বাড়ির মালিক থাকেন বোম্বেতে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাঁর নামে ভাড়া জমা দেয় ভাড়াটেরা।

কর্নেল ফিরে এসে একবার পাঁচটা পনেরোতে এবং একবার প্রায় সাতটা নাগাদ ফোন করেছিলেন। রিং হচ্ছিল। কেউ ধরেনি। তারপর লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর নরেশ ধরকে ঠিকানা দিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছেন।

এখন নরেশবাবু কী খবর দেন, তার প্রতীক্ষা। কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চন্দ্রনাথ দেববর্মন ছাড়া পেয়ে হঠাৎ কোথায় গেলেন? কেন? প্রাণভয়ে গা ঢাকা দিলেন কি— আততায়ী তাঁর চেনা লোক বলেই?

টেলিফোন বাজল।

কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর নরেশবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।...আমি ধর কইতাছি স্যার!

বলুন নরেশবাবু।

ভিডিওজোন থেক্যা কইতাঁছি। আইয়া দেখি, ডোর ইজ ওপেন। কিন্তু মানুষ নাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

আচ্ছা!

তিনখান পাও লইয়া স্ট্যান্ড খাড়াইয়া আছে। ক্যামেরা নাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

বলেন কী! তারপর?

ফ্যান ঘুরতাছে! হাওয়া খাওনের মানুষ নাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

হুঁ। আর?

ট্যার পাইয়া কাটছে আর কি! হ্যাঁ— একখান গ্লাস কাত হইয়া আছে কার্পেটে। এইটুকু খানি তরল পদার্থ আছে গ্লাসে। অ্যাঁ? হোয়াট ইজ দিস? লেডিস জুতা? দুইখান জুতা!

নরেশবাবু! শুনুন প্লিজ।

কন স্যার!

গ্লাসটা দরকার। গ্লাসের তরল পদার্থ ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট! বুঝলেন?

হঃ! আর জুতা?

জুতা জোড়াও নিয়ে যান। ওটাও ইমপর্ট্যান্ট।

ভেরি ইমপর্ট্যান্ট! অ কাশেম মিয়া! জুতাজোড়া প্যাকেটে বান্ধো! ওই তো কত পেপার।

নরেশবাবু! দরজা সিল করে দেবেন যেন!

হ্যান্ডকাফ পরাইয়া দিমু। হাঃ হাঃ হাঃ!

ডি সি ডি ডি সায়েবকে এখনই গিয়ে রিপোর্ট দেবেন। ছাড়ছি।...

ফোন রেখে কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী? আর এক কাপ কফি দিয়ে যা বাবা।

সাদা দাড়ি আঁকড়ে ধরলেন কর্নেল। একটু ভুল হয়ে গেছে। হোটেলের ঘরে রঞ্জন রায়ের কার্ড পেয়েই পুলিশকে ওই ঠিকানায় নজর রাখতে বলা উচিত ছিল।

হঠাৎ মনে হলো শুভ্রাংশু সোম অভিনয় করে। ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে তার চেনাজানা থাকা সম্ভব। তাকে জিজ্ঞেস করা যায় রঞ্জন রায় এবং 'ভিডিওজোন' সম্পর্কে খবর রাখে কি না।

ষষ্ঠী কফি এনে দেওয়ার পর কর্নেল শুভ্রাংশুর কার্ড দেখে টেলিফোন করলেন। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল, হ্যালো!

শুভ্রাংশু সোম আছেন কি?

দাদা নেই। বাইরে গেছে। আপনি কে বলছেন?

চিনবেন না। আপনি কি শুভ্রাংশুবাবুর বোন?

হ্যাঁ। আপনার নাম বললে দাদা ফিরে আসার পর জানাব। দাদার বলা আছে কেউ ফোন করলে—

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এক মিনিট। লিখে নিই।...হ্যাঁ, বলুন!

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনার— তোমার নাম কী ভাই?

boiRboi.blogspot.com

সুস্মিতা সোম।

বাহ্। আচ্ছা, তোমার দাদা কখন বাইরে গেছেন?

দাদাকে তো প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ।

আজ কখন গেছেন?

দুপুরে অফিস থেকে ফোন করে বলল, বাইরে যাচ্ছে। আজ না-ও ফিরতে পারে।

কোথায় যাবেন বলেননি?

নাহ্। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের যখন তখন বাইরে যেতে হয়। ছাড়ছি।...

কর্নেলের অনুমান, শুভ্রাংশুর বোন কিশোরী। কফিতে চুমুক দিয়ে 'ভিডিওজোন'-এর কথা ভাবতে থাকলেন। মেঝেয় গড়িয়ে পড়া গ্লাস, একটা ডিভান, দু পাটি লেডিজ জুতো, খালি ক্যামেরাস্ট্যান্ড এবং শিলিং ফ্যানটা ঘুরছিল।

শুভ্রাংশুর কথাগুলো মনে ভেসে এল এবার। মউ তাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল, হংকংয়ের এক ব্যবসায়ী মউকে ব্ল্যাকমেল করে। আর একটা ভিডিও ক্যাসেট তার ব্ল্যাকমেলের অস্ত্র। ওঁ, ব্লু ফিল্ম। শুভ্রাংশুর দৃঢ় বিশ্বাস, মউকে নিয়ে সেই ব্লু ফিল্ম তোলা হয়েছিল।

শুভ্রাংশু একরকম ড্রাগের কথা বলছিল। কেউ সেই ড্রাগের ঘোরে থাকলে বোঝা যায় না সে কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে। শুভ্রাংশু এই কথাটা বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি।' কেন সে পড়াশোনা করেছে এ বিষয়ে? জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে সে চাকরি করে। এই কোম্পানি কি গোপনে সেই ড্রাগ তৈরি করে এবং শুভ্রাংশু তা জানতে পেরেছিল?

কর্নেল কফি শেষ করার পর টেলিফোন তুললেন ফের। ডায়াল করলেন। সাড়া এল।

মিঃ দাশগুপ্ত?

কে বলছেন?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনাকে একটু বিরক্ত করছি।

একটু পরে শান্তশীল বলল, হ্যাঁ, বলুন!

রঞ্জন রায় নামটা কি আপনার পরিচিত?

হু ইজ দ্যাট গাই?

ফিল্মমেকার।

চিনি না।

নামটা কি কখনও আপনার স্ত্রী কাছে শুনেছেন? প্লিজ, একটু স্মরণ করুন।

নাহ্। শুনিনি।

'ভিডিওজোন' শব্দটা?

হোয়াটস্ দ্যাট?

কখনও শুনেছেন কি না কথাটা?

শুনিনি।

সিওর?

ড্যাম ইট!...সরি! আমি ওরকম কোনও শব্দ শুনিনি কারও কাছে।

মিঃ দাশগুপ্ত, একটা অনুরোধ! আপনার স্ত্রীর কাগজপত্রের মধ্যে— কোথাও যদি রঞ্জন রায়ের নেমকার্ড বা 'ভিডিওজোন' মার্কা কোনও কাগজ খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

জানাবো।

আর একটা কথা মিঃ দাশগুপ্ত! আপনি একটা নামী ওষুধ কোম্পানির কর্মকর্তা। মেডিসিন, তার মানে, যে-কোনোরকম ড্রাগ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকার কথা। কী উপাদানের কী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এ বিষয়েও মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত।

সো হোয়াট?

এমন ড্রাগ থাকা খুবই সম্ভব, যা কেউ খেলে টের পাবে না সে কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে।

ওটা নার্কোটিক্স। নিষিদ্ধ ড্রাগ। উই ডু নট সেল দোজ ডার্টি থিংস।

বলছি না। আমি জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইছি, অমন ড্রাগ থাকা সম্ভব কি না?

খুবই সম্ভব। এল এস ডি-জাতীয় ড্রাগ তো এখন আউট অব ডেট হয়ে গেছে।

মিঃ দাশগুপ্ত! শুনেছি, বহু নিষিদ্ধ ড্রাগ আজকাল ছদ্মনামের আড়ালে বিক্রি হয় তাই না?

হতেই পারে। হয়। বাট ইউ ডু নট প্রোডিউস অর সেল দেম। জেনিথের রেকর্ড ক্লিন। ইউ হ্যাভ পোলিস-কন্ট্যাক্ট কর্নেল সরকার। ইউ মে আস্ক্ দেম। বাট হোয়াই—

প্লিজ মিঃ দাশগুপ্ত! অফেন্স নেবেন না। আমি আপনার সহযোগিতা চাইছি শুধু।

ওরকম কোনও ড্রাগের ব্যাপারে আমার সহযোগিতা আশা করবেন না।

কর্নেল হাসলেন। না, না মিঃ দাশগুপ্ত! আমি আপনার স্ত্রীর খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য আপনার সহযোগিতা চাইছি।

মউয়ের মার্ডারের সঙ্গে নার্কোটিকসের কী সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না।

আছে। বাই দা বাই, আপনার কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শুভ্রাংশু সোম—

তাকে চেনেন নাকি?

চিনি। আজ সকালে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আমাকে বলেছে। সে-ও চাইছে আপনার স্ত্রীর খুনি ধরা পড়ুক।

bengalidownload.com

একটু পরে শান্তশীল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আই ডু নট লাইক হিম।

আজ শুভ্রাংশুকে বাইরে কোথায় পাঠানো হয়েছে জানেন?

ওটা আমার জানার কথা নয়। কেন?

ওকে একটু দরকার ছিল। ওর বাড়িতে শুনলাম বাইরে গেছে হঠাৎ।

সেটা স্বাভাবিক।...ও কে! আমি একটু ব্যস্ত কর্নেল সরকার!

সরি! রাখছি। ধন্যবাদ।...

কর্নেল টেলিফোন রেখে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। শুভ্রাংশুকে খুবই দরকার ছিল এ মুহূর্তে। সে নিশ্চয় ওরকম কোনও ড্রাগের খবর রাখে। তার কাছে এটা জানা গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যাবে। হংকংবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী যে সত্যিই ব্লু ফিল্মের কারবারি, তাতে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সে খুন হয়ে গেছে। শুভ্রাংশুর কথামতো সে মধুমিতার ব্ল্যাকমেলার ছিল। কিন্তু নিছক ব্লু ফিল্মের কারবারি ব্ল্যাকমেল করবে কেন? তাহলে তো তার কারবারই বন্ধ হবে যাবে।

একটু চঞ্চল হলেন কর্নেল। রঞ্জন রায়ের সাহায্যে রঙ্গনাথন ব্লু ফিল্ম তৈরি করতেন তা স্পষ্ট। রঞ্জন কি সেই ফিল্মের কপি হাতিয়ে বিত্তবান এবং বিশিষ্ট লোকেদের ব্ল্যাকমেল করে এসেছে? এ সব ঘটনা গোপনে ঘটে থাকে। স্ক্যান্ডালের ভয়ে কেউ পুলিশকে জানাতে চায় না। সম্ভবত রঞ্জন এবার এমন কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল, যার সঙ্গে কোনও সুত্রে রঙ্গনাথনের ঘনিষ্ঠতা আছে। রঙ্গনাথন রঞ্জনের কুকীর্তি টের পেয়ে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো খুন হয়ে গেলেন। আর একটা পয়েন্ট। ১২৭ নং সুইটে কোনও ফিল্মের ক্যাসেট পাওয়া যায়নি। তবে রঙ্গনাথনকে হত্যার এই মোটিভটা যুক্তিযুক্ত বলা চলে।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন।

কর্নেল সরকার! দাশগুপ্ত বলছি। শান্তশীল দাশগুপ্ত!

বলুন? আপনার স্ত্রীর কাগজপত্রের মধ্যে তাহলে—

না কর্নেল সরকার! আপনার সঙ্গে একটু আগে কথা বলার পর হঠাৎ আমার মনে হলো, আপনার সঙ্গে বসা দরকার। অনেক কথা বলা দরকার। কাল মর্নিংয়ে আপনার সময় হবে কি? আমি যেতে চাই আপনার কাছে।

আমিই বরং আপনার কাছে যাব। দ্যাটস দা বেস্ট প্লেস টু টক। অন দা স্পট।

বাট কর্নেল সরকার, ডেডস ডু নট স্পিক, ইউ নো!

কী বললেন?

মৃতেরা কথা বলে না।

কর্নেল হাসলেন। আসাধারণ উক্তি মিঃ দাশগুপ্ত। কিন্তু আমার কাজটাই হলো মৃতদের কথা বলানো। ডেডস স্পিক টু মি।

ও কে! আপনি আসুন। আমি অপেক্ষা করব। শুধু সময়টা জানিয়ে দিলে ভাল হয়।

সকাল ন'টা।

দ্যাটস ও কে। ছাড়ছি।...

ফোন রেখে কর্নেল বুক-শেলফের কাছে গেলেন। নার্কোটিকস্ সংক্রান্ত একটা বই তাঁর সংগ্রহে আছে। তবে সেটা নার্কোটিকস্ স্মাগলিংয়ের রেকর্ড। বলা চলে, অপরাধবৃত্তান্ত। তবে ওতে নানা ধরনের নিষিদ্ধ ড্রাগ এবং তার গুণাগুণেরও উল্লেখ আছে।

বইটা এনে ইজিচেয়ারে বসলেন। টেবিলবাতি জ্বেলে দিলেন। কিছুদিন থেকে রিডিং গ্লাস ব্যবহার শুরু করেছেন। চোখের দোষ নেই। বয়স থেমে থাকে না।

পাতা ওল্টাতে গিয়ে শান্তশীলের কথাটা মাথায় ভেসে এল, মৃতেরা কথা বলে না। হুঁ, এটা সব হত্যাকারীই ধরে নেয়। কিন্তু মৃতেরা কথা বলে। চুপিচুপি কথা বলে। অরণ্যে মর্মরধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর।...

॥ নয় ॥

ঋতুপর্ণা দরজা খুলে আস্তে বললেন, আমি সন্ধ্যা ছটায় এসে অপেক্ষা করছি। এখন ন'টা বাজে। তাছাড়া হঠাৎ একটু আগে টিনা এসেছে।

টিনা এখানে আসে নাকি? চন্দ্রনাথ একটু হকচকিয়ে বললেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো সুগন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর ওপর। ফের বললেন টিনা—

আসে। ওর কাছে এ ফ্ল্যাটের একসেট চাবি আছে। ঋতুপর্ণা শ্বাস ফেলে বললেন, ভেতরে এস।

চন্দ্রনাথ একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, নাহ্। থাক।

ঋতুপর্ণার চোখ উজ্জ্বল লাগল। মুখে কড়া প্রসাধন। কিন্তু চোখের ওই উজ্জ্বলতা তীব্র ক্ষোভের। ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল। বললেন, তুমি আমার তিনটে ঘণ্টা নষ্ট করেছ। দাম দিয়ে যাও।

কথা হচ্ছিল ইংরেজিতে। চন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে বললেন, আসার পথে আমার অ্যাডভোকেটের বাড়ি হয়ে এলাম। আড়াই ঘণ্টা আটকে রাখল সে। ছারপোকা! যাই হোক, আমার একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ হয়েছে।

তোমার জীবনটাই তো মিসহ্যাপে ভর্তি। বলে ঋতুপর্ণা কোণের দিকে সোফায় বসলেন। বলো!

হাল্কা স্যুটকেসটা পাশে রেখে চন্দ্রনাথ মুখোমুখি বসলেন। টিনা কী করছে?

কিছু ঘটে থাকবে, কিংবা কারো পাল্লায় পড়ে ড্রিঙ্ক করে সামলাতে পারেনি। নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে আমাকে পায়নি। তারপর— তো ওকে একটা সেডাটিভ দিয়েছি। কিছু খেতে চাইল না। ঘুমোচ্ছে! ঋতুপর্ণা একটা সিগারেট ধরালেন। তোমার কথা বলো।

টি ভি-র শব্দ কমিয়ে দাও।

bengalidownload.com

ঋতুপর্ণা শব্দ কমিয়ে বললেন, আমি ওয়াইন খাচ্ছিলাম। হুইস্কি আছে, খাবে?

এনেছি। জনি ওয়াকার। চন্দ্রনাথ সুটকেস থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন। আইসকিউব আনো।

কোথায় পেলে?

রঙ্গনাথনের উপহার। কিন্তু আজ বেচারা হঠাৎ খুন হয়ে গেছে। পরে বলছি। উত্তেজিত হয়ো না।

ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে আলো কম। কিন্তু তাঁর চোখে চমক ছিল। একমুহূর্ত চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ডাইনিং-কাম-কিচেনে ঢুকলেন। সঙ্গে সুগন্ধ নিয়ে ঘুরছেন ঋতুপর্ণা।

চন্দ্রনাথ তাঁর সিগারেট প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলেন। সিগারেট ধরিয়ে ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। সল্টটলেকের এই ফ্ল্যাটে এক মাস আগে একদিন এসেছিলেন। তেমনই সাজানো আছে। কোণে প্রায় তিন ফুট উঁচু নগ্ন যক্ষীর ভাস্কর্য নির্লজ্জ দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে একটা ফ্রেস্কো। চুম্বনরত দুটি মুখ। ঈষৎ বিমূর্ত। ডাঃ মুখার্জি কি এই ফ্ল্যাটে কখনও আসেন? নিশ্চয় সময় পান না। একবার একটা পার্টিতে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা। অবশ্য বলেননি— বলা সম্ভবও ছিল না, চন্দ্রনাথ দেববর্মনের সঙ্গে ঋতুপর্ণা বাইশ বছর আগে লিভ টুগেদার করেছিলেন।

ঋতুপর্ণা এলেন সোডা, আইসকিউব এবং গ্লাস নিয়ে। টেবিলে একটা প্লেটে কিছু স্ন্যাক্স ছিল আগে থেকে। নিপুণ হাতে জনি ওয়াকারের ছিপি খুলে গ্লাসে ঢেলে দিলেন ঋতুপর্ণা। সোডাওয়াটার এবং তিন টুকরো আইস দিয়ে একটু হাসলেন। আমার লোভ হচ্ছে। কিন্তু নাহ্। এ বয়সে আর কেলেঙ্কারি শোভা পায় না। তবে ওয়াইন আমার রাতের বন্ধু! আমার স্বামী বিদেশি ওয়াইন উপহার পায়। এটা ইতালির জিনিস। স্কচ দিয়ে আমাকে ডাঁট দেখাতে পারবে না কিন্তু!

চন্দ্রনাথ গ্লাস তুলে বললেন, কাল সারারাত ঘুমোইনি। আজ সারাদিনও একটু বিশ্রাম পাইনি।

চিয়ার্স! ঋতুপর্ণা তাঁর গ্লাস দিয়ে চন্দ্রনাথের গ্লাস স্পর্শ করলেন। তুমি তো আমার স্বামীর চেয়েও বেশি ব্যস্ত মানুষ।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, কাল দুপুর রাত থেকে আজ বিকেল অব্দি আমি পুলিশ হাজতে ছিলাম।

সে কী! কেন?

খুনের দায়ে।

ঋতুপর্ণা উঠে এসে কাছে বসলেন। রঙ্গনাথন খুন হয়েছে বলছিলে। তুমি খুন করেছ নাকি?

সব বলছি পর্ণা! আমাকে একটু চাঙ্গা হতে দাও!

ঋতুপর্ণা উত্তেজিতভাবে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, তুমি আমাকেও নোংরা খুনখারাপির ব্যাপারে জড়াবে। পুলিশ তোমার ওপর নজর রেখেছে কি না তুমি নিশ্চিত?

জানি না।

ঋতুপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করলেন, ও ডনি! এভাবে তোমার আসা উচিত ছিল না। তুমি জানো আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। আমার ইমেজের দাম তোমার জানা উচিত, ডনি!

উত্তেজিত হয়ো না পর্ণা! আগে সব শোনো।

বলো! উত্তেজনায় ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের একটা হাত আঁকড়ে ধরলেন। চিরোল রক্তিম নখ চন্দ্রনাথের কবজির চামড়ায় বিঁধে গেল যেন। তবে চন্দ্রনাথের চামড়া অনুভূতিহীন।

হুইস্কিতে কয়েকটা চুমুক দেবার পর চন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠস্বরে গতকাল রাত দশটা পনের থেকে যা-যা ঘটেছে, সব বললেন। কিছু গোপন করলেন না। পুলিশ তাঁকে রঙ্গনাথনের লাশ সনাক্ত করতে নিয়ে গিয়েছিল। তা-ও বললেন। তিনি যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, তা বলতেও দ্বিধা করলেন না।

ঋতুপর্ণা জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ওই মহিলার বডি তো তখনও লক্ষ্য করোনি বলছ। শুধু একটা লোককে লিফ্‌ট থেকে বেরুতে দেখেছিলে। কিন্তু দেখামাত্র তাকে গুলি করতে গেলে কেন?

banglainternet.com

করিডরের বাঁকে যেতেই দেখি, সে লিফ্‌ট থেকে বেরুচ্ছে। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আসলে ওই মহিলা মিসেস দাশগুপ্ত আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ আমাকে খুন করতে আসছে। তাছাড়া লোকটা আমার অচেনা। তাই তাকে দেখামাত্র রিভলভার তাক করেছিলাম। অমনই সে সিঁড়ির দিকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গেল। আমি গুলি ছুড়লাম। তাকে মিস করলাম। বলে চন্দ্রনাথ হুইস্কিতে চুমুক দিলেন।

ঋতুপর্ণা সোজা হয়ে বসে বাঁকা হাসলেন। ডনি! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ওই মহিলা তোমার অচেনা। এটা তোমার বানানো গল্প। আলবাৎ সে তোমার প্রেমিকা। চালাকি করো না ডনি! আমি তোমাকে চিনি।

চন্দ্রনাথ কষ্ট করে হাসলেন। আমি বুড়ো হয়ে গেছি পর্ণা! ভদ্রমহিলা সুন্দরী যুবতী।

কিন্তু তুমি চিরকালের শিকারি, ডনি! চিরযুবক।

চন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আমি সেক্সের জন্য আসিনি।

তুমি নির্বোধ! অসভ্য! জানোয়ার!

পর্ণা! কোনও-কোনও সময় বুঝতে পারি, আমি একা একা! তাই—

চুপ করো! তোমার টাকার অভাব নেই। এ বয়সেও তুমি অনায়াসে কোনও

তরুণীকে বিয়ে করতে পারো। বলো! তুমি চাইলে আমি আমার অনাথ আশ্রমের কোনও তরুণীর সঙ্গে বিয়ের ঘটকালি করতে পারি। চাও?

আহ্! এই দুঃসময়ে বড্ড বাজে তামাশা করছ!

ঋতুপর্ণা তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি এখানে সত্যিই রাত কাটাতে এসেছ?

ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমার মেয়ে এসে গেছে।

টিনা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাছাড়া ওকে সেডাটিভ দিয়েছি। ঘুম ভাঙতে দেরি হবে। তুমি খুব ভোরে চলে যেতে পারো। ওয়াইনে চুমক দিয়ে ঋতুপর্ণা আস্তে ফের বললেন, কোনও-কোনও সময়ে আমিও এত একা হয়ে পড়ি! জীবনের মানে খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, তোমার জন্য ডিনার এনে রেখেছি। দুজনে একসঙ্গে খাব।

তুমি খেয়ে নাও। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

প্রিয় ডনি! আমার প্রাণ! ঋতুপর্ণা সহসা সরে এসে চুম্বন করলেন চন্দ্রনাথকে। নাহ্ কোনও কথা শুনব না। তুমি আমার সঙ্গে খাবে।...

চন্দ্রনাথ ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু অন্যমনস্কতা তাঁকে খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করল। ঋতুপর্ণার শরীর বরাবর যেন একই সুরে বাঁধা। মেদহীন, ঋজু এবং শীর্ণ। কড়া প্রসাধনে কৃত্রিম মানবী দেখায় যদিও। মৃদু আলোয় সহসা যুবতী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু একটু পরে বয়সের ছাপ ধরা পড়ে যায়। মূল্যবান সেন্ট্ একটা গোপন আর্তি মনে হয়।

খাওয়ার পর রাত-পোশাক পরে এলেন ঋতুপর্ণা। চন্দ্রনাথ একটু দ্বিধার পর তাঁর রাত-পোশাক পরে নিয়েছিলেন ড্রয়িংরুমে। সোফায় প্যান্ট শার্ট রেখেছিলেন। ঋতুপর্ণা তা গুছিয়ে রাখলেন। পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললেন, আর হুইস্কি খেও না।

চন্দ্রনাথ হাসলেন। নাহ্। বলে তাঁর স্যুটকেসের ভেতর থেকে সেই ব্লু ফিল্মের ক্যাসেটটা বের করলেন। কাল রাতে পুরোটা দেখা হয়নি। তোমার 'ভি সি আর'-টা আছে তো?

আছে। তোমার দেখার মতো ফিল্মও আছে। তবে তোমারটা দেখা যাক। একঘেয়ে লাগলে আমার একটা চালিয়ে দেব। ঋতুপর্ণা ক্যাসেটটা নিয়ে টি ভি-র কাছে গেলেন। তারপর ঘুরে বললেন, এটাই কাল রাতে দেখছিলে নাকি?

হ্যাঁ। রিমোটটা আমাকে দাও। গোড়ার দিকটা বাজে। তেমন কিছু নেই। ঋতুপর্ণা হাসলেন। তুমি এখনও সেই অভ্যাসটা ছাড়তে পারোনি দেখছি। সরাসরি ঝাঁপ দিতে চাও!

দেখছ তো, দিচ্ছি না। আজকাল আমার শরীর কেন জানি না বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা। আমি আসলে জীবিতদের মধ্যে এক মৃত মানুষ।

ফিল্মটা রিওয়াইন্ড করে পাশে এসে বসলেন, ঋতুপর্ণা। চন্দ্রকান্তের কাঁধে হাত রাখলেন। চন্দ্রকান্ত রিমোটের বোতাম টিপে রিওয়াইন্ড বন্ধ করে দিলেন। ফাস্ট ফরোয়ার্ড বোতাম টিপলেন। বললেন, তোমাকে বললাম না? গোড়ার দিকটায় কিছু নেই।

ঋতুপর্ণা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, আমারও আজকাল এসব অসহ্য লাগে। কিন্তু অভ্যাস!

চন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বোতাম টিপে পর্দায় দেখে নিচ্ছিলেন কী ঘটছে। হঠাৎ বললেন, এ কী!

কী?

ছেলে-মেয়ে দুটো বদলে গেল। দৃশ্যও আলাদা। ভারতীয় মনে হচ্ছে। লক্ষ্য করো! বাঙালি চেহারা না? অবশ্য একটা ক্যাসেটে শর্ট ফিল্মও থাকে। কিন্তু মেয়েটিকে চেনা মনে হচ্ছে!

ঋতুপর্ণা চমকে উঠলেন। বললেন, ছেলেটিকেও আমার চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, ও তো রঞ্জন।

তুমি চিনতে পারছ?

হ্যাঁ। রঞ্জন। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে।

চন্দ্রনাথ বললেন, মেয়েটিকে চিনতে পারছি। কাল রাতে যার বডি লিফটে পড়ে ছিল। হ্যাঁ— সেই। চেহারায় তত পরিবর্তন হয়নি। আশ্চর্য! কিন্তু রঞ্জন কে?

বললাম তো! আমার স্বামীর কাছে মাঝে মাঝে আসে। টিনা ওকে পছন্দ করে। একদিন গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়েছিল। তুমি তো জানো, আমি আমার স্বামীর বা মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাই না। তবে টিনাকে ওর সম্পর্কে সাবধান করে দেব। আশ্চর্য! রঞ্জনকে প্রথম দেখার পরই মনে হয়েছিল, বাজে ছেলে।

আমার অবাক লাগছে। জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের চিফ এক্সিকিউটিভের স্ত্রী— চন্দ্রনাথ ফিল্ম বন্ধ করে উত্তেজিতভাবে বললেন, পর্ণা! আমি যার দিকে গুলি ছুড়েছিলাম, সে তোমার চেনা রঞ্জনই। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মুখটা দেখেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত। এই ছবিতে যাকে দেখলাম, তারই মুখ আমি দেখেছি। আমি একটা টেলিফোন করতে চাই।

ঋতুপর্ণা তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এই সুন্দর রাতটাকে নষ্ট করো না। সব ভুলে যাও। হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছি। আমিও এক চুমুক খাব। প্রিয় ডনি। আমার প্রাণ!

চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এবার বুঝতে পেরেছি ওই শুওরের বাচ্চা আমার কাছে এই ক্যাসেটটা হাতাতেই আসছিল। মিসেস দাশগুপ্ত জানত তার উদ্দেশ্য কী। তাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে গ্রাহ্য করছি না বুঝতে পেরে সে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসছিল। লিফ্‌টে ওঠার পর ওই শুওরের

banglaboi.blogspot.com

বাচ্চা তাকে গুলি করে মুখ বন্ধ করে দেয়। এর পর সে আমার ঘরে আসছিল। আমার হাতে রিভলভার না থাকলে সে আমাকেও গুলি করে— ওঃ!

ঋতুপর্ণা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলেন। সোডা এবং আইসকিউবসহ চন্দ্রনাথের হাতে গ্লাসটা তুলে দিলেন। তারপর নিজের গ্লাসেও একটু হুইস্কি ঢাললেন।

চন্দ্রনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিয়ার্স করে হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, রঞ্জন কেমন করে জানতে পারল এই ক্যাসেটে তার এবং মিসেস দাশগুপ্তের মিলনদৃশ্য আছে? রঙ্গনাথন আমাকে ক্যাসেটটা দিয়েছিল। রঞ্জন কি রঙ্গনাথনের পরিচিত? রঙ্গনাথন কি তাকে বলেছিল এই ক্যাসেটটা এখন আমার কাছে আছে?

তুমি চুপ না করলে আমি গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব ডনি!

অগত্যা চন্দ্রনাথ ঋতুপর্ণার কাঁধে হাত রেখে আলতোভাবে চুম্বন করলেন। বললেন, ঠিক বলেছ! সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্যই তোমার কাছে এসেছি পর্ণা!

ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে সুইচ টিপলেন। একটু হেসে বললেন, রঞ্জনের কীর্তি দেখি! তুমিও দেখ। কানও-কোনও সময় সেক্স জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। প্রকৃতির উপহার। তাই না প্রিয় ডনি?

ইয়া।

দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। ঋতুপর্ণা চাপা চঞ্চল কণ্ঠস্বরে বললেন, ড্রিঙ্ক শেষ করো শিগগির! আমার ঘুম পাচ্ছে। হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

কথাটা চন্দ্রনাথ বুঝলেন। ঋতুপর্ণা এই বয়সেও একই আছে। এই আতিশয্যই চন্দ্রনাথের কাছে বাইশ বছর আগে লিভ টুগেদারকে অসহনীয় করে ফেলেছিল। এখন চন্দ্রনাথ নিরুত্তাপ। নিজের শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেছেন দিনে দিনে। হঠাৎ অসহায় বোধ করলেন। কিন্তু ইচ্ছে করেই বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকেছেন।

ছবিটা বন্ধ করে ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রনাথকে টেনে ওঠালেন। চন্দ্রনাথ বলতে চাইছিলেন, ক্যাসেটটা বের করে নিই। বলার সুযোগ দিল না। বাঘিনী শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইছে আড়ালে।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বাজল। ঋতুপর্ণা খাপ্পা হয়ে একটা অশালীন শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, রিং হোক। একটু পরে থেমে যাবে। কিন্তু বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, তখনও রিং হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রনাথ বললেন, তুমি এখানে আসছ তোমার স্বামী জানেন?

না।

অন্য কেউ?

মলিনা জানে। এখানে এলে তাকে বলে আসি। বিশ্বাসী মেডসারভ্যান্ট্। টিনা তার কাছে শুনেই এখানে এসেছে।

মনে হচ্ছে, তোমার মেডসারভ্যান্টের জরুরি ফোন। তা না হলে এখনও রিং হতো না। ফোনটা ধরো।

আমার মেজাজ নষ্ট করে দিল! কী এমন জরুরি যে— আমি মেয়েটাকে তাড়াব।

ফোনটা ধরো। বাইরের ফোন হলে থেমে যেত। তা ছাড়া এখন রাত সাড়ে দশটা বাজে।

ঋতুপর্ণা ফুঁসতে ফুঁসতে ড্রয়িংরুমে গেলেন। চন্দ্রনাথ তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

ঋতুপর্ণা ফোন তুলেই ধমকের সুরে বললেন, মলি?

পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সরি টু ডিসটার্ব ইউ ম্যাডাম!

হু দা হেল ইউ আর?

আমি নিউ আলিপুর পুলিশ স্টেশন থেকে অফিসার-ইন-চার্জ শোভন চ্যাটার্জি বলছি। আপনি কি মিসেস ঋতুপর্ণা মুখার্জি?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার? চমকে উঠে ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন।

আপনাকে একটু কষ্ট করে আপনাদের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে আসতে হবে ম্যাডাম। একটু অপেক্ষা করুন। পুলিশভ্যান পাঠিয়েছি। আপনাকে এবং আপনার মেয়েকে এসকর্ট করে আনবে।

ঋতুপর্ণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন? কী হয়েছে? পুলিশভ্যান এসকর্ট করতে আসছে কেন?

ডাঃ মুখার্জি— আই মিন, ইওর হাজব্যান্ড ইজ ডেড।

মুহূর্তে ঋতুপর্ণা অস্বাভাবিক শান্ত এবং শক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিকৃত। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, ডেড? ইউ মিন—

হ্যাঁ ম্যাডাম! ডাঃ মুখার্জি ফেস্‌ড অ্যান আনন্যাচারাল ডেথ। আই অ্যাম সরি টু—

সুইসাইড করেছে?

হি ইজ মার্ডারড্।

হো-য়া-ট? দ্যাটস ইমপসিবল! অনির্বাণকে কে মার্ডার করবে? কেন করবে?

আমি জানি আপনার নার্ভ স্ট্রং। হ্যাঁ, আধঘণ্টা আগে কেউ ওঁকে খুন করেছে। আপনার মেয়েকে কথাটা বলার দরকার নেই। আপনি অপেক্ষা করুন। পুলিশভ্যান না পৌঁছালে আপনি যেন বেরুবেন না, প্লিজ!

ঋতুপর্ণার হাত থেকে চন্দ্রনাথ ফোন কেড়ে নিয়ে রেখে দিলেন। তারপর দ্রুত প্যান্ট-শার্ট পরে নিলেন। রাত পোশাক স্যুটকেস ভরলেন। ভি সি আর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে এলেন। স্যুটকেসের ভেতর ঢুকিয়ে রিভলভার বের করলেন। অস্ত্রটা প্যান্টের পকেটে ভরে একটু ভাবলেন। স্কচের বোতল, সিগারেট প্যাকেট, লাইটার পড়ে আছে। সেগুলো যথাস্থানে ভরে নিয়ে নিজের হুইস্কির

engloudownload.com

গ্লাসটা ডাইনিংয়ের বেসিনে ধুলেন। গ্লাসটা টেবিলে রেখে এসে দেখলেন, ঋতুপর্ণা পাশের ঘরে মেয়েকে জাগানোর চেষ্টা করছেন।

এখন সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন অবান্তর এবং বিপজ্জনক। পুলিশভ্যান আসছে মা-মেয়েকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে। আর একমুহূর্ত দেরি করা ঠিক নয়। চন্দ্রনাথ বেরিয়ে গিয়ে ডান হাতে পকেটের রিভলভার স্পর্শ করলেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

নিচের গ্যারাজের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন। এখনও বাড়িটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। সামনেটা খোলা এবং স্টোনচিপস, ইট, হরেক সরঞ্জন এলোমেলো রাখা আছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত এলাকা ছাড়িয়ে গেলেন চন্দ্রনাথ।

রিভলভারটা বাঁ পাশে সিটের ওপর ফেলে রেখে চন্দ্রনাথ দেববর্মন ড্রাইভ করছিলেন। সল্টটলেকের রাস্তা গোলকধাঁধা। কিন্তু তাঁর নখদর্পণে। ই সেক্টরের একটুকরো জমি কেনা আছে। সেখানে কোনোদিনই বাড়ি করবেন না আর ভাল দাম পেলে বেচে দেবেন।

এবং ঠিক এই কথাটা মাথায় এলে কেন যেন তাঁর মনে হলো, বেঁচে থাকার দরকার আছে তাঁর। জীবনের অন্য অনেক রকম মানে আছে। কেউ-কেউ বোঝে না। কেউ-কেউ বোঝে না। কেউ-কেউ বোঝে।...

॥ দশ ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার দু'ঘণ্টা ছাদের বাগান পরিচর্যা করে এসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন। হোটেল কন্টিনেন্টাল এবং সানশাইনে দুটো খুনের খবর ছোট্ট করে ছেপেছে। পুলিশ সূত্রের খবর। কাকেও গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা জানিয়েছে, সানশাইনের খুনে সন্দেহক্রমে জনৈক বক্তিকে জেরা করা হচ্ছে। দুটো খুনের খবর আলাদা ছাপা।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন। শুভ্রাংশুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্নেল সরকার! কাল আপনি রিং করেছিলেন শুনলাম। আমাকে দুপুরে ব্যারাকপুর যেতে হয়েছিল। ফিরেছি প্রায় রাত এগারোটায়। অত রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাইনি।

কর্নেল বললেন, একটা কথা জানতে চেয়েছিলাম।

বলুন স্যার!

আচ্ছা, আপনি রঞ্জন রায় নামে কাউকে চেনেন?

রঞ্জন রায়?

হ্যাঁ। ফিল্মমেকার।

কই না তো! এ নামে কোনও ফিল্মমেকারের কথা শুনিনি। তবে ফিল্মসার্কেলে আমার কিছু জানাশোনা লোক আছে। খোঁজ নেব?

নিন। আর 'ভিডিওজোন' কথাটা কি আপনার পরিচিত?

কী বললেন? ভিডিওজোন? নাহ্। কী সেটা?

একটা স্টুডিও। মানে, ভিডিও ক্যাসেট তৈরি হয় সেখানে।

কোথায় সেটা?

পার্ক স্ট্রিট এরিয়ার একটা গলিতে।

তাই বুঝি? তো স্যার, কোনও ক্লু পেলেন?

কর্নেল হাসলেন। ক্লু বলতে রঞ্জন রায় এবং ভিডিওজোন।

আই সি! আচ্ছা স্যার, তাহলে কি রঞ্জন রায়ই মউকে নিয়ে ব্লু ফিল্ম তুলেছিল?

আপনার কী ধারণা?

আমার তা-ই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু মউ বলেছিল, হংকংয়ের এক ব্যবসায়ী ওকে ব্ল্যাকমেল করত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, রঞ্জন রায় এবং সেই ব্যবসায়ীর মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে। তাই না স্যার?

আপনি বুদ্ধিমান মিঃ সোম! আজকের কাগজ দেখেছেন?

এখনও দেখা হয়নি। কেন স্যার?

মধুমিতার খুনের খবরের তলায় আরেকটা খবর আছে দেখবেন। হোটেল কন্টিনেন্টালে হংকংয়ের ব্যবসায়ী রঙ্গনাথন খুন।

বলেন কী! মউ যার কথা বলত—

হ্যাঁ। সেই ব্যবসায়ী। যাই হোক, আপনি আপনার চেনাজানা ফিল্মমহলে রঞ্জন রায় সম্পর্কে খোঁজ নিন। খোঁজ পেলেই আমাকে জানাবেন।

একটা কথা স্যার! রঙ্গনাথন নাকি বললেন, তার কাছে কোনও ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়নি?

নাহ্।

ভেরি মিসটিরিয়াস! ক্যাসেটটা তার কাছে থাকা উচিত ছিল। স্যার! দুটো খুনের মধ্যে লিঙ্ক তো স্পষ্ট।

ঠিক বলেছেন। আপনি বুদ্ধিমান!

রঞ্জন রায় রঙ্গনাথনকে খুন করে ক্যাসেটটা হাতিয়েছে— সিওর।

আমি সিওর নই অবশ্য।

স্যার! সেই ক্যাসেটে মউয়ের মেলপার্টনার যদি রঞ্জন হয়, তাহলে?

বাহ্! আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান মিঃ সোম! আপনি মূল্যবান একটা ক্লু ধরিয়ে দিলেন। আমি এটা ভাবিনি। ধন্যবাদ!

আর একটা কথা স্যার! যাকে হাতে নাতে ধরা হয়েছিল, হ্যাঁ চন্দ্রনাথ দেববর্মন, তার অ্যালিবাই কী?

পুলিশ নিশ্চয় কোনও স্ট্রং অ্যালিবাই পেয়েছে। তাই পুলিশ রঞ্জন রায়কে খুঁজছে! আচ্ছা! রাখছি। আপনি যেন রঞ্জন রায় সম্পর্কে—

banglaboi.blogspot.com

সিওর! কিন্তু স্যার, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

বলুন!

চন্দ্রনাথবাবুর ঘর ভালভাবে সার্চ করা উচিত ছিল পুলিশের।

কেন?

এমন হতে পারে, মউ তারই কাছে যাচ্ছিল।

হুঁ। কেন যাচ্ছিল বলে আপনার ধারণা?

আমি সিওর নই। তবে এমন হতেই পারে, মউ জানতে পেরেছিল তার কাছে ওর ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট আছে। বোঝাপড়া করতে যেতেই পারে। আমি ডিটেকটিভ নই কর্নেল সায়েব! কিন্তু আমার ইনট্যুইশন বলছে, রঙ্গনাথন এবং চন্দ্রানাথের মধ্যে চেনাজানা থাকা সম্ভব। রঙ্গনাথন চন্দ্রনাথের ঘরে গিয়েই মউকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে! মউ বোঝাপড়া করতে যাচ্ছিল। সেইসময় তার স্বামী তাকে ফলো করে গিয়ে খুন করেছে। এটা কি সম্ভব নয়? আপনি একটু ভেবে দেখবেন এটা।

দেখব'খন। রাখছি মিঃ সোম!

ফোন রেখে ঘড়ি দেখলেন কর্নেল। ন'টায় শান্তশীল দাশগুপ্তের কাছে তাঁর যাবার কথা। এখনই বেরুনো উচিত।...

সানশাইনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করা হয়েছে। রণধীর সিংহ সিকিউরিটি অফিসে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে স্যালুট ঠুকলেন। কর্নেল বললেন, বি ব্লকে মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রণধীর।

চলুন স্যার! আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ধন্যবাদ রণধীর! তুমি তোমার ডিউটি করো! কর্নেল হঠাৎ থেমে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, চন্দ্রনাথ দেববর্মন কি ফিরেছেন?

হ্যাঁ স্যার। গত রাতে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরেছেন। পুলিশ ওঁর গতিবিধি সম্পর্কে খবর দিতে বলেছিল। আমি দিয়েছি।

ঠিক আছে।...

শান্তশীল অপেক্ষা করছিল। ড্রয়িংরুমে কর্নেলকে বসিয়ে বলল, এনি ড্রিঙ্ক?

ধন্যবাদ। কফি খেয়ে বেরিয়েছি।

শান্তশীল একটু চুপ করে থাকার পর বলল, আমি বলেছিলাম 'মৃতেরা কথা বলে না'। আপনি বলেছিলেন, তারা আপনার কাছে কথা বলে। আপনি আমার স্ত্রীর কাগজপত্র খুঁজতে বলেছিলেন। খুঁজে কিছুক্ষণ আগে একটা নেমকার্ড পেলাম। কার্ডটা দেখে যেন, মনে হলো, ডেডস সামটাইম রিয়্যালি স্পিক। হ্যাঁ— আপনি রঞ্জন রায় এবং 'ভিডিওজোন' বলেছিলেন। সেই কার্ড। এই নিন।

কর্নেল কার্ডটা দেখে পকেটস্থ করলেন এবং চুরুট ধরালেন।

শান্তশীল বলল, তবে এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনাকে কাল ফোন করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং সেটা আমার

অ্যাপার্টমেন্টেই বলা দরকার। কেন, তার আভাস দিচ্ছি। এই অ্যাপার্টমেন্টে বসলে আমার স্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথা স্মরণ হতে পারে, যা বাইরে কোথাও বসে কথা বললে হবে না। কোনও কোনও ঘটনা তুচ্ছ মনে হয়েছে কত সময়। এখন মনে হচ্ছে, সেগুলোর তাৎপর্য ছিল।

সে চুপ করলে কর্নেল বললেন, যেমন?

কিছুক্ষণ আগে বেডরুমের একটা জানালার নিচে— বাংলায় কি যেন একটা কথা আছে, ওই জায়গাটা— ওই যে বনসাই টবটা আছে—

কর্নেল হাসলেন। হুঁ। পুরনো বাংলা শব্দ। 'গোবরাট'।

হ্যাঁ। গোবরাট। সেখানে একটু ছাই দেখেছিলাম। সিগারেটের ছাই। আমি একসময় বেশি সিগারেট খেতাম। এখন খুবই কম। তাহলে ও সিগারেটের ছাই আমি চিনি। আমি ভুলেও সিগারেটের ছাই বাইরে ফেলি না। বেডরুমে সিগারেট খাই না। খেলে এখানে বসে খাই। যাই হোক, মউকে জিজ্ঞেস করিনি। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে একটুও ডিসটার্বড হওয়া আমার পছন্দ নয়। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হয়।

আপনার স্ত্রী সিগারেট খেতেন না?

নাহ্। শান্তশীল আবার একটু চুপ করে থাকার পর বলল, গত সপ্তাহে অফিস থেকে দুপুরে মউকে ফোন করেছিলাম। রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুলে বলল, তোমার এই জেকিল-হাইড গেমটা— বলেই 'হ্যালো। ও! তুমি?' ইত্যাদি। কর্নেল সরকার 'তোমার এই জেকিল-হাইড গেমটা'— এই কথাটা ফোন তুলেই কেন বলবে? তাই না? অন্য কাউকে বলছিল। ডিবেটিং টোন। উত্তেজনা ছিল।

banglaboi.blogspot.com

আপনি জিজ্ঞেস করেননি কিছু?

নাহ্। তখন গুরুত্বই দিইনি। গত একমাস ধরে লক্ষ্য করছিলাম একটু হিস্টেরিক টাইপ হয়ে যাচ্ছে মউ। সব সময় নয়। যে রাতে ও খুন হয়ে গেল, ভীষণ শান্ত মনে হচ্ছিল আপাতদৃষ্টে। কথা বলছিল আস্তে। কিন্তু চাপা উত্তেজনা ছিল— সেটা পরে মনে হয়েছে।

কর্নেল চোখ বুজে কথা শুনছিলেন। চোখ খুলে বললেন, জেকিল-হাউড গেম?

হ্যাঁ।

'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'! ডুয়াল পার্সোনালিটি!

বইটা পড়েছি। ফিল্মেও দেখেছি। শান্তশীল একটা সিগারেট ধরাল। একটু পরে বলল, আমাদের কাজের মেয়েটি— ললিতার আগামীকাল আসার কথা। গতকাল এবং আজ তাকে ছুটি দিয়েছিল মউ। কারণ বহরমপুর যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। কাল ললিতা এলে পুলিশ ওকে জেরা করলে সব জানা সম্ভব, হু ওয়াজ দ্যাট গাই? ললিতার না জানার কথা নয়। সমস্যা হলো, মেয়েটা কোথায় থাকে জানি না। সানশাইন হাউজিং কমিটির নির্দেশ আছে, কাজের লোকেদের ফটো এবং

ঠিকানা অফিসে জমা রাখতে হবে। আমি এত ব্যস্ত যে ওসব দিকে মন দিতে পারিনি।

আর কিছু?

শান্তশীল সোজা হয়ে বসল। কর্নেল সরকার! মউয়ের ফিল্ম কেরিয়ারের আমি একটুও বাধা সৃষ্টি করতে চাইনি। সে তা ভাল জানত। কিন্তু বোম্বে থেকে কয়েকবার বড় অফার এলা এবং ওরা বারবার এসে ওকে সেধেছিল। অথচ মউ ওদের মুখের ওপর না করে দিত। ফিল্ম সম্পর্কে হঠাৎ একটা যেন প্রচণ্ড অ্যালার্জি। তখন ভাবতাম, সে হাউসওয়াইফ হওয়াটাই প্রেফার করেছে এবং আমার মুখ চেয়েই এটা করেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, দেয়ার ওয়াজ সামথিং রং ইন ইট। কোনও তিক্ত— কুৎসিত অভিজ্ঞতা।

মিঃ দাশগুপ্ত! আপনাকে কাল ব্লু ফিল্মের কথা বলেছিলাম!

হ্যাঁ। আমি তখন বিশ্বাস করিনি আপনার কথা। এখন ঠিক ওই কথাটা আমিই আপনাকে বলছি। ব্লু ফিল্ম অ্যান্ড ব্ল্যাকমেলিং।

আপনাকে একটা ড্রাগের কথাও বলেছিলাম!

শান্তশীল তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, আমি কোম্পানির কেমিস্ট ডিপার্টমেন্টের চিফ ডঃ রণেন্দ্র বোসের সঙ্গে কথা বলেছি। হি ইজ এ ফেমাস মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট। আন্তর্জাতিক সুনাম আছে। উনি বললেন, ওরকম ড্রাগ আছে। তরল পদার্থে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। হ্যালুসিনেটরি পার্সেপশন তৈরি করে ব্রেনের নার্ভে। এক মিনিট! পেটেন্টের ছদ্মনাম বলছি। বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে দিল কর্নেলকে।

কর্নেল পড়ে বললেন, নাইটেক্স থ্রি।

সেডাটিভ ওষুধ লেখা থাকে। কিন্তু অ্যাকচুয়্যালি নিছক ঘুমের ওষুধ নয়। চোরাপথে হংকং থেকে এ দেশে আসে।

কর্নেল হাসলেন। হংকং শব্দটা বলতেই এখন আমার কাছে রঙ্গনাথন।

আমার কাছেও। বাট হু ইজ দিস গাই রঞ্জন রায়?

পুলিশ খুঁজছে তাকে। দেখা যাক। আমি উঠি মিঃ দাশগুপ্ত।

শান্তশীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার যেন আরও কিছু বলার কথা ছিল। মনে পড়ছে না।

মনে পড়লে জানাবেন। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপাতত এই যথেষ্ট।...

কর্নেল নমস্কার বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ই ব্লকের দিকে হাঁটতে থাকলেন। বাড়িটা নির্জন নিঝুম হয়ে আছে। দোতলায় ন'টা ঘরের কর্মীরা এখন কাজে চলে গেছে। অটোমেটিক লিফটে তিনতলায় পৌঁছুলেন। সেই কুকুরটার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। কর্নেল করিডর ঘুরে সোজা এগিয়ে ১৩ নম্বরে নক করলেন।

প্রথমে আইহোলে একটা চোখ। তারপর চেন আটকানো দরজা একটু ফাঁক হলো। মঙ্গলোয়েড চেহারার একটা মুখ। শীতল চাহনি।

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন। চন্দ্রনাথ বাঁ হতে সেটা নিয়ে দেখার পর বললেন, ইয়া?

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন। চন্দ্রনাথ বাঁ হাতে সেটা নিয়ে দেখার পর বললেন, ইয়া?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার ডানহাতে একটা ফায়ার আর্মস আছে মিঃ দেববর্মন! তবে আপনি আমার এই সাদা দাড়ি টেনে দখতে পারেন, এটা রঞ্জন রায়ের ছদ্মবেশ নয়। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমি ব্যস্ত।

প্লিজ মিঃ দেববর্মন! আপনি বরং লালবাজারের ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি কিংবা আপনাদের সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহকে ফোন করে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন।

কী চান আমার কাছে?

রঞ্জন রায় সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

তাকে আমি চিনি না।

ওয়েল মিঃ দেববর্মন, অনেক সময় আমরা জানি না যে আমারা কী জানি। আপনি যে এখনও বিপন্ন, তা ভুলে যাবেন না।

চন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করে দরজা খুলে বললেন, ওকে! কাম ইন!

কর্নেল ভেতরে ঢুকলে চন্দ্রনাথ দরজা লক করলেন। চন্দ্রনাথের হাতে খুদে আগ্নেয়াস্ত্র। ইশারায় সোফায় বসতে বললেন। তারপর একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে বললেন, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল?

হ্যাঁ। তবে রহস্য জিনিসটা আমাকে টানে। রহস্য ভেদ করা আমার একটা হবি। আপনার জীবনে সদ্য যা ঘটেছে, তা কি একটা জটিল রহস্য নয়?

ইয়া।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে একটু হেসে বললেন, রঞ্জন রায় জানে আপনার কাছে একটা ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট আছে। আমার ধারণা, ওটা মিঃ রঙ্গ নাথন আপনাকে দিয়েছিলেন!

ইয়া।

আমার আরও ধারণা, ওই ক্যাসেটে মিসেস দাশগুপ্ত এবং তার মেল পার্টনারের ছবি আছে।

ইয়া।

অ্যান্ড দা মেলপার্টনার ইজ রঞ্জন রায়?

ইয়া।

boiRboi.blogspot.com

আমি রঞ্জন রায়কে একবার দেখতে চাই।

চন্দ্রনাথ কষ্ট করে হাসলেন। আপনি কি কখনও ব্লু ফিল্ম দেখেছেন?

নাহ্। কিন্তু প্রয়োজন আমাকে দেখতে বাধ্য করবে। প্লিজ স্টার্ট!...

॥ এগারো ॥

রঞ্জন-মধুমিতার এপিসোড মাত্র এক মিনিট দেখেই কর্নেল বললেন, স্টপ ইট প্লিজ! দ্যাটস এনাফ।

ক্যাসেট থামিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, এই ছবির রঞ্জন রায়কেই আমি দেখেছিলাম। সিওর।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, স্বীকার করছি আপনি দুঃসাহসী মানুষ মিঃ দেববর্মন! কিন্তু রঞ্জন এখন মরিয়া। আপনি আপনার ফায়ারআর্মসের ওপর বড্ড বেশি নির্ভর করছেন। সে-রাতে রঞ্জন তৈরি হয়েই আসছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার হাতে গুলিভরা পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের ফায়ারআর্মস রেডি ছিল। কিন্তু আপনি দুটো কারণে বেঁচে গেছেন। প্রথম কারণ, সে আপনাকে হঠাৎ ১০ নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে লিফটের মুখোমুখি দেখার আশা করেনি। দ্বিতীয় কারণ, কুকুরের চেঁচামেচি। সে পোশাদার খুনী নয়। তাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তখন তার দিকে আপনার ফায়ারআর্মসের নল। আত্মরক্ষার সহজাত বোধে সে সেই মুহূর্তে সিঁড়ির দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল। আপনি দৈবাৎ বেঁচে গেছেন। হ্যাঁ— এখানে গুলির লড়াই করার হিম্মত রঞ্জনের ছিল না। এটা একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। নিচে সিকিউরিটি গার্ডরা টহল দিয়ে বেড়ায়।

চন্দ্রনাথ শীতল কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনি কী বলতে চান?

রঞ্জন এখন মরিয়া এবং এই ক্যাসেটটাই আপনার পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক। এটা আপনি আমাকে দিতে না চান, এখনই পুলিশকে দিন। আমি পুলিশকে ডাকছি।

পুলিশ আমাকে ফাঁসাবে। আপনি জানেন, এ সব ক্যাসেট বে-আইনি।

কর্নেল হাসলেন। বে-আইনি! কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জঘন্য বে-আইনি কাজ নরহত্যা। আফটার অল, আপনি আসলে পুলিশকে সহযোগিতা করছেন। তাই না? মিঃ দেববর্মন! আপনার গায়ে আঁচড় লাগতে আমি দেব না। সব দায়িত্ব আমার। আমার ওপর নির্ভর করুন।

একটু ভেবে নিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, ও কে। বাট ফার্স্ট লেট মি টক টু সিকিউরিটি অফিসার।

চন্দ্রনাথ সিকিউরিটিতে ফোন করে রণধীরকে এখন আসতে বললেন। কর্নেল বুঝতে পারছিলেন, এই লোকটি পোড়খাওয়া এবং নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। তাই খুব সাবধানী।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় কেউ নক করল। চন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে আইহোলে দেখে নিলেন। তারপর দরজা খুলে রণধীরকে ভেতরে ঢোকালেন। রণধীর উদ্বিগ্নমুখে বললেন, এনিথিং রং স্যার!

চন্দ্রনাথ বললেন, এই ভদ্রলোককে আপনি চেনেন?

রণধীর ঢুকেই কর্নেলকে দেখে স্যালুট ঠুকেছিলেন। বললেন, হ্যাঁ। উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

উনি পুলিশকে ফোন করতে চান।

পুলিশ চিফরা ওঁকে সম্মান করেন স্যার! এমন কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বহু ডিপার্টমেন্টের চিফরাও ওঁর হেল্প নেন।

চন্দ্রনাথ কর্নেলকে বললেন, ও কে! আপনি ফোন করুন। মিঃ সিনহা! আপনি একটু বসুন।

কর্নেল ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির কোয়ার্টারে ফোন করলেন। লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা এগারোটার পর অফিসে যান। ফোনে সাড়া পেয়ে বললেন, অরিজিৎ! আমি সানশাইন থেকে বলছি।

হাই ওল্ড বস! নতুন কিছু বাধালেন নাকি? গতরাতে আবার এক কেলো নিউ আলিপুরে—

রঞ্জন রায়?

হ্যাঁ। সাম ডাক্তার অনির্বাণ মুখার্জিকে তাঁর বসার ঘরে শুইয়ে দিয়ে পালিয়েছে। মাথায় গুলি। ওঁর মেড সারভ্যান্ট প্রত্যক্ষদর্শী। সে রঞ্জনকে চেনে। গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল মেয়েটি। রঞ্জনকে পালিয়ে যেতে দেখেছে। তাকে সে চেনে।

ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জি কি ডেড?

স্পট ডেড।

অরিজিৎ! আমি সানশাইনে মিঃ চন্দ্রনাথ দেববর্মনের ঘরে আছি। একটা ভিডিওক্যাসেট তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই। ওতে রঞ্জনের ছবি আছে। এই ক্যাসেটটা নিতে আমার চেনা কোনও রেসপনসিবল অফিসার পাঠাও। কুইক ডার্লিং! রঞ্জন মরিয়া, মাইন্ড দ্যাট! বিশেষ করে নিউ আলিপুরের ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে, সে চূড়ান্ত ডেসপারেট হয়ে উঠেছে। আর একটা কথা। ক্যাসেট নিতে যাঁকে পাঠাবে, তিনি যেন পুলিশ ড্রেসে আসেন। উইথ আর্মস।

কর্নেল ফোন রাখলে চন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন?

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি।

নিউ আলিপুরের ডাক্তার মুখার্জিকে আমি চিনি। নাইস ম্যান। তাঁকে বাস্টার্ড রঞ্জন খুন করল কেন?

কর্নেল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রণধীরকে বললেন, তুমি এখনই কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড এই ব্লকের সামনে মোতায়েন করো। দু'জন গার্ড নিচে লিফটে

bengalibook.blogspot.com

সামনে থাকে যেন। পুলিশ আসবে উর্দিপরে। সাদা পোশাকের কেউ যেন পুলিশ পরিচয় দিয়ে এই ব্লকে ঢুকতে না পারে।

রণধীর সিকিউরিটি অফিসে ফোন করে বললেন, আমি নিজে বরং লিফটের সামনে থাকছি।

বাট উইথ আর্মস!

ইয়েস স্যার! আই হ্যাভ মাই আর্মস।

স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ। তারপর চন্দ্রনাথ ভি সি পি থেকে ক্যাসেটটা বের করলেন। কর্নেল বললেন, ক্যাসেটটা একটু দেখতে চাই মিঃ দেববর্মন!

চন্দ্রনাথ ক্যাসেটটা দিলেন। কর্নেল সেটা দেখেই বলেন, মাই গুডনেস!

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কী?

ক্যাসেটটার নাম 'ডেডস ডু নট স্পিক!' আশ্চর্য তো!

মোটেও অশ্চর্য নয় কর্নেল সরকার! সব ব্লু ফিল্মের ক্যাসেটের এ রকম অদ্ভুত নাম হয়। হরর ফিল্মের সঙ্গে মানানসই নামই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়। প্রথমে কিছু সেই রকম ঘটনা থাকে। তারপর সেক্স সিন এসে পড়ে। আমি একটা ব্লু ফিল্ম দেখেছিলাম 'দা নেকেড আই' নামে। অর্থহীন নাম। কিন্তু চমক আছে। কিংবা ধরুন, 'দা ফ্লাইং কার্পেট' অর্ধেকটা অব্দি দেখেও বোঝা যায় না সেক্স সিন আছে।

কর্নেল বললেন, আমি একটা ফোন করতে চাই। আর্জেন্ট!

করুন।

কর্নেল শান্তশীলের নম্বার ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন, আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।

বলুন!

আপনি বলেছিলেন আমাকে 'ডেডস ডু নট স্পিক।' তাই না?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

কথাটা আপনি কোথাও পড়েছিলেন, নাকি—

মে বি ইটস আ ফ্রেজ। মনে পড়ছে না।

একটু ভেবে বলুন। দিস ইজ আর্জেন্ট মিঃ দাশগুপ্ত!

সময় লাগবে।

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, কথাটা আপনার স্ত্রীর মুখে শোনেননি তো?

অ্যাঁ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট। এক দিন রাতে আমি কম্পিউটাররুম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। সেই সময় মউ টেলিফোনে কথা বলছিল। ওই কথাটা তারই মুখেই শুনেছিলাম। তবে আপনাকে বলেছি, মউকে আমি—

থ্যাঙ্কস। রাখছি। বলে টেলিফোন রেখে কর্নেল একটা চুরুট ধরালেন। একটু হেসে চন্দ্রনাথ বললেন, এটাই একটা পয়েন্ট মিঃ দেববর্মন! অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। বাই দা বাই, আপনি তো অনেক ভিডিও ক্যাসেট দেখেছেন। এই ক্যাসেটের প্রিন্ট সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

এটা ওরিজিন্যাল প্রিন্ট নয় তবে ভাল প্রিন্ট। প্রথম অংশটা— ইয়াঙ্কি বয় এবং তার গার্লফ্রেন্ডের এপিসোড ওরিজিন্যাল প্রিন্ট নয়। হংকংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা। লোকেশানটা আমার চেনা।

হংকং গিয়েছিলেন নাকি?

ইয়া। চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কজওয়ে বে-র ধারে তোলা ছবি। 'টাইগার বাম গার্ডেনসের' একটা অংশ দেখা যায়। এই গার্ডেনসের মালিক অ বুন হ। মলম বেচে কোটিপতি হওয়া লোক। ওকে ইউরোপীয়ানরা বলে 'টাইগার বাম কিং'। বি এ এল এম বাম। অ্যান্ডারস্ট্যান্ড? ছবিতে উল্টোদিকের 'হ্যাপি ভ্যালি রেসকোর্স' দেখেছি। লোকেশানটা আমার পরিচিত। অবশ্য সেক্স সিন স্টুডিওতে তোলা।

মিঃ রঙ্গনাথনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন?

ইয়া। আপনি শুনে থাকবেন আমার মার্কেটিং রিসার্চের কারবার আছে। একটা কোম্পানির কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। রঙ্গনাথনের বাড়িতে ছিলাম। শেক-ও বিচের ধারে ওর বাড়ি। রঙ্গনাথন ওয়াজ এ বিলিওনেয়ার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আছে ওর।

কর্নেল হাসলেন। কাজেই তিনি কাড়কে দশ হাজার টাকার জন্য ব্ল্যাকমেল করতে কলকাতা আসবেন কেন?

চন্দ্রনাথ তাকালেন। ব্ল্যাকমেল? রঙ্গনাথন ব্ল্যাকমেল করবে কোন দুঃখে? তবে সে ছিল হাড়ে হাড়ে ব্যবসায়ী। আরব দেশগুলোতে ভারতীয় যুবক-যুবতীকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্মের চহিদা আছে। এ কথা সে আমাকে বলেছিল। আপনি জানেন ভারত থেকে আরব কাছে এবং হংকং থেকে দূরে। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে আরব হংকং থেকে খুবই কাছে। নেক্সট্‌ডোর নেবার।

কথা বলে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন কর্নেল। চন্দ্রনাথকে যতটা শীতল দেখায়, তিনি তত শীতল নন। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'গুড টকার' সেই রকম মানুষ। কর্নেলের মনে হচ্ছিল, তবু লোকটির জীবনে কোথাও একটা ক্ষত আছে। সেই ক্ষত তাঁকে নিঃসঙ্গ এবং শীতল করে ফেলে মাঝে মাঝে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ হাজরা এলেন পুলিশের পোশাকে। সঙ্গে দু'জন আর্মড কনস্টেবল। 'ডেডস ডু নট স্পিক' নামের ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে গেলেন।

চন্দ্রনাথকে সাবধানে থাকতে বলে কর্নেল তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলেন ট্যাক্সি চেপে। ড্রয়িংরুমে ফ্যান চালিয়ে ইজিচেয়ারে বসেই বললেন, ষষ্ঠী! কফি!

banglaboi.blogspot.com

টুপি খুলে টাকে হাওয়া খেতে খেতে কর্নেল ভাবলেন, শুভ্রাংশুর কথায় চন্দ্রনাথ দেববর্মনের দিকে আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলেন। ঢিলটা লেগে গেছে। শুভ্রাংশু সত্যিই বুদ্ধিমান। তার হিসেব কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল।

শুভ্রাংশুকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওর বোনকে জানিয়ে রাখা উচিত, সে বাড়ি ফিরলেই যেন কর্নেলকে রিং করে কিংবা সোজা চলে আসে।

কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর সাড়া এল। কর্নেল বললেন, সুস্মিতা?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

দাদার সঙ্গে কথা বলবেন তো? দাদা অফিস থেক একটু আগে ফিরে এসেছিল। ওকে ডিমাপুরে ট্রান্সফার করেছে। সব গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। আপনাকে রিং করেছিল। পায়নি।

ও! আচ্ছা! কীসে গেল? প্লেনে নিশ্চয়?

হুঁ, কোম্পানি ওকে অত টাকা দেবে, তা হলে হয়েছে। ট্রেনে যাবে, কোন ট্রেন আমি জানি না। রাখছি।...

ষষ্ঠী কফি আনল। কর্নেল বললেন, আমাকে কেউ ফোন করেছিল?

ষষ্ঠী নড়ে উঠল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, ওই যাঃ। বলতে ভুলে গেছি। একটা ফোং এয়েছিল বটে। কিন্তু নাম বলল না। আপনি নেই শুনেই ছেড়ে দিল।...

তা হলে শুভ্রাংশু ট্রান্সফার অর্ডার ঠেকাতে পারল না! মউ বেঁচে থাকলে—কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'ডেডস ডু নট স্পিক।' মৃতেরা কথা বলে না।

ষষ্ঠী যেতে যেতে ঘুরে বলল, আজ্ঞে বাবামশাই?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, তোর মুণ্ডু!

ষষ্ঠীচরণ বেজার হয়ে চলে গেল কিচেনের দিকে। কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরালেন। রঞ্জন তার চালে একটা গুরুতর ভুল করল কেন? একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রঙ্গনাথনকে সে ওই ভি ডি ও ক্যাসেটটা আগেই বিক্রি করেছিল। রঙ্গনাথন বিদেশে তার প্রিন্ট বিক্রি করেছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। একটা প্রিন্ট রঞ্জনের প্রাপ্য ছিল। হোটেল কন্টিনেন্টালের ম্যানেজারের বিবরণ অনুসারে রঙ্গনাথন এবার কলকাতা আসেন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়। প্রিন্টটা রঞ্জনের জন্যই এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে রঞ্জন যাওয়ার আগেই রঙ্গনাথন প্রিন্টটা তাঁর বন্ধু চন্দ্রনাথকে দেখার জন্য দেন। চন্দ্রনাথ থাকেন সানশাইনে, যেখানে মউ থাকে। এবার রঙ্গনাথন রঞ্জনকে বলে থাকবেন—নিশ্চয় বলেছিলেন, ওটা একজনকে একদিনের জন্য দেখতে দিয়েছেন। রঞ্জন জানতে চাইতেই পারে, কাকে ওটা দেওয়া হয়েছে। কারণ কলকাতার তার সেক্স সিন দেখানোর ঝুঁকি আছে। দৈবাৎ এমন কারও চোখে পড়তে পারে, যে রঞ্জনেকে চেনে। কাজেই রঞ্জন রঙ্গনাথনের কাছে

কাকে ক্যাসেট দেওয়া হয়েছে, তার নাম জানতে চাইবে এটা স্বাভাবিক। রঙ্গনাথন অত ভাবেননি। চন্দ্রনাথের নাম ঠিকানা দেন! রঞ্জন শোনামাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বি ব্লকের পেছনেই ই ব্লক!

হ্যাঁ। এই ডিডাকশনের যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট। মউকে যখন সে ব্ল্যাকমেল করত, তখন ক্যাসেট তার হাতে ছিল না। এবার ক্যাসেট এসে গেছে। অতএব টাকার অঙ্ক বাড়ানো যায়। রঞ্জন ২৮ মার্চ সন্ধ্যা থেকে শান্তশীল ফিরে না আসা পর্যন্ত মউয়ের কাছে ছিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করতেই গিয়েছিল এবং ক্যাসেট যে পাশের ই ব্লকে চন্দ্রনাথের কাছে আছে, তা-ও বলেছিল। চন্দ্রনাথের জবানবন্দিতে এটা জানা গেছে। মউ বুঝতে পেরেছিল। রঞ্জন তার কাছে টাকা না পেয়ে রুষ্ট এবং চন্দ্রনাথের কাছ থেকে ক্যাসেটটা যে-কোনও ভাবে আদায় করে এবার উল্টে শান্তশীলকেই ব্ল্যাকমেল করবে। শান্তশীল স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হবে রঞ্জনের দাবি মেনে নিতে। কিন্তু মউ নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজেই তৎপর হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রনাথকে ফোনে সাবধান করিয়ে দিয়ে শেষে ঝুঁকি নিয়েই ই ব্লকে ছুটে গিয়েছিল। বেগতিক দেখে মরিয়া রঞ্জন তাকে মেরে মুখ বন্ধ করে দেয়। ডেডস ডু নট স্পিক। এবার তার ব্ল্যাকমেলের শিকার হতো শান্তশীল দাশগুপ্ত।

কর্নেল তাঁর এই তত্ত্বে নিশ্চিত হলেন। কোনও ফাঁক নেই ঘটনার এই ছকে। রঞ্জন জানত না চন্দ্রনাথ কেমন প্রকৃতির লোক এবং তাঁর হাতে ফায়ার আর্মস রেডি! প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর রঞ্জন একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল।

মরিয়া এবং দিশেহারা রঞ্জনের পক্ষে এই ভুল স্বাভাবিক। ভুলটা হলো রঙ্গনাথনকে হত্যা।

bengalibook.org

চন্দ্রনাথ রঞ্জনকে দেখে ফেলেছিলেন। রঞ্জন আশাঙ্কা করেছিল, চন্দ্রনাথ তাঁর হংকংবাসী বন্ধু রঙ্গনাথনকে জানিয়ে থাকবেন, তাঁর দেওয়া ক্যাসেটের পুরুষচরিত্র সশরীরে তাঁকে খুন করার জন্য হানা দিয়েছিল এবং সে তার ফিমেল পার্টনারকে হত্যাও করেছে। কর্নেলের মনে পড়ল, হোটেল কন্টিনেন্টালে রঙ্গনাথনের সুইটে দুটো মদের গ্লাস উল্টে পড়েছিল কার্পেটের ওপর। তার মানে, তর্কাতর্কি থেকে একটু হাতাহাতি, তারপর—

রঙ্গনাথন কি তর্কাতর্কির সময় রঞ্জনকে শাসিয়েছিলেন, তাই রঞ্জন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁকে গুলি করে?

আবার সেই কথাটা এসে পড়ছে, 'মৃতেরা কথা বলে না।'

কিন্তু কার্পেটে পড়ে থাকা দুটো মদের গ্লাস কথা বলছে। বলছে হাতাহাতি হয়েছিল।

কর্নেল টেলিফোন তুলে অরিজিৎ লাহিড়িকে অফিসে ফোন করলেন। অরিজিৎ! একটা কথা জানতে চাইছি।

বলুন বস্! সি পি-র ঘরে কনফারেন্স। একটু তাড়া আছে।

হোটেল কন্টিনেন্টালে রঙ্গনাথনের সুইটে 'নাইটেক্স থ্রি' নামে কোনও ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল পাওয়া গেছে?

রঙ্গনাথনের বডির পাশে ইজিচেয়ারের তলায় দশটা ক্যাপসুলের একটা ফাইল পড়ে ছিল। আমাদের ড্রাগ এক্সপার্টরা বলেছেন ঘুমের ওষুধ।

ফোরেন্সিক ল্যাবে পাঠাও। ওটা ঘুমের ওষুধ নয়। আর—ক্যাসেটটা...

পেয়ে গেছি।

ক্যাসেট থেকে রঞ্জন রায়ের একটা ছবি প্রিন্ট করিয়ে— শুধু মুখের ছবিই যথেষ্ট, ছবিটা সব দৈনিক কাগজে 'ওয়ান্টেড'-এ হেডিং ছাপানোর ব্যবস্থা করো। কালকের কাগজেই যেন বেরোয়।

ও কে বস্।...

ফোন রেখে কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। তা হলে নিশ্চিত হওয়া গেল। 'নাইটেক্স থ্রি' রঞ্জনকে যোগাতেন রঙ্গনাথন। তাঁকে মেরে রঞ্জন তাড়াহুড়োয় যতটা পারে হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

বিকেলে কর্নেল ছাদের বাগান পরিচর্যা করছিলেন। ষষ্ঠীচরণ গিয়ে বলল, বাবামশাই ফোং।

অন্য সময় হলে বিরক্ত হয়ে ভেংচি কাটতেন। এখন একটা ঘটনার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। দ্রুত নেমে এসে সাড়া দিলেন। চন্দ্রনাথ দেববর্মন ইংরেজিতে বললেন, আপনাকে বলার দরকার মনে করিনি। এখন বলতে হচ্ছে। নিউ আলিপুরের ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জির স্ত্রী ঋতুপর্ণা আমার পরিচিত। এইমাত্র সে আমাকে জানাল, সেই জারজসন্তান রঞ্জন টেলিফোনে তাকে হুকুম দিয়েছে। তার মেয়ে টিনার একটা ব্লু ফিল্ম নাকি রঞ্জনের কাছে আছে। এক লাখ টাকা নগদ পেলে সে ক্যাসেটটা ফেরত দেবে। আর নমুনা-স্বরূপ একটা সেক্স সিনের স্টিল ছবি ইতিমধ্যেই লেটার বক্সে রেখে এসেছে। ঋতুপর্ণা আমাকে বলল, লেটার বক্সে সত্যিই খামের ভেতর টিনার ছবি পেয়েছে। তবে মেলপার্টনারের পেছন দিক দেখা যাচ্ছে। তাই তাকে চেনা যাচ্ছে না।

মিসেস মুখার্জি তাঁর মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?

করেছে। টিনা শুধু কাঁদছে। খুলে কিছু বলছে না। কাজেই ব্যাপারটা সত্য।

কখন কোথায় টাকা দিতে হবে রঞ্জন বলেছে?

বলেছে। একটা ঠিকানা দিয়েছে। বেলসুইচ টিপলে একটি মেয়ে দরজা খুলবে। তার পরনে থাকবে জিনস-ব্যাগি শার্ট। ঘরে ঢুকে তাকে টাকা গুনে দিতে হবে। সে ক্যাসেটটা ফেরত দেবে। ইচ্ছে করলে ক্যাসেট চালিয়ে দেখে নিতে পারে ঋতুপর্ণা। কিন্তু মেয়েটিকে পুলিশের হাতে দিয়ে লাভ হবে না। মেয়েটি কলগার্ল। সে-ও জানে না রঞ্জন কোথায় আছে এবং কখন টাকা নিতে আসবে। হ্যাঁ। রঞ্জন

আরও বলেছে, মেয়েটিকে ধরিয়ে দিয়েও লাভ নেই। কারণ ক্যাসেটের আরও প্রিন্ট রঞ্জনের কাছে আছে। সে কথা দিচ্ছে, টাকা পেলে সে সেই প্রিন্টগুলো এদেশে বেচবে না। বিদেশে যাওয়ার জন্যই তার টাকাটা দরকার।

কর্নেল আস্তে বললেন, কখন টাকা নিয়ে যেতে হবে?

রাত ন'টায়।

ঠিকানাটা কী?

ঋতুপর্ণা ফোনে বলেনি। আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছে। তো আমার মনে হলো, ব্যাপারটা আপনাকে জানোনো উচিত। পুলিশ হঠকারী, আমি জানি। তা ছাড়া আজকাল পুলিশের মধ্যে আগের দিনের দক্ষতা দেখি না। মনে রাখবেন আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে। আমার যৌবনে পুলিশের যে দক্ষতা—

মিঃ দেববর্মন! আপনি কি ঋতুপর্ণার সঙ্গে যাবেন, যদি উনি টাকা দিতে রাজি হন?

আমি একটু দূরে গাড়িতে অপেক্ষা করলে অসুবিধে কী?

আপনি যাবেন না প্লিজ। মিসেস মুখার্জির বাড়িতে অপেক্ষা করবেন।

আমি ওই জারজসন্তানের পরোয়া করি না।

প্লিজ মিঃ দেববর্মন! রঞ্জন চূড়ান্ত মরিয়া। আমার কথা শুনুন। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

একটু পরে চন্দ্রনাথ বললেন, ও কে। ঋতুপর্ণার বাড়ি থেকে রিং করে আপনাকে ঠিকানাটা জানিয়ে দেব বরং।

কর্নেল হাসলেন। রঞ্জনের দেওয়া ঠিকানাটা আমি সম্ভবত জানি মিঃ দেববর্মন! রাখছি।

চন্দ্রনাথকে আর কথা বলার সুযোগ দিলেন না কর্নেল। পোশাক বদলে এলেন। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। বেরুনোর আগে ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ীকে রিং করলেন। পেলেন না। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে নরেশ ধরকে পাওয়া গেল। নরেশবাবু কর্নেলের কথা শোনার পর মন্তব্য করলেন, হালা ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ্ দ্যাখে নাই।...

বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পেতে একটু দেরি হয়েছিল। পাঁচটা বেজে গেছে। সারাপথ জ্যাম। পৌঁছোতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। সংকীর্ণ রাস্তায় দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্ট এবং জোট-বাঁধা-উঁচু-নিচু ফ্ল্যাটবাড়ি। সেই বাড়িটার তলায় সারবদ্ধ দোকান। পানের দোকানে নরেশ ধর পানের অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পান মুখে দিয়েই কর্নেলকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে আরও একটু চুন চাইলেন। মিঠাপাতা দিবার কইছিলাম না? তোমাগো কারবার!

কর্নেল দোতলায় উঠে কলিংবেলের সুইচ টিপলেন। ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ বলল, কে?

bengalidownload.com

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

দরজা একটু ফাঁক হলো। ব্যাগি শার্ট-জিনস পরা আঠারো-উনিশ বছরের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে, ঠোঁটে রঙ, নকল ভুরু, চোখের পাপড়ি গোনা যায়, দ্রুত বলল, দাদা তো ডিমাপুরে চলে গেছে।

কর্নেল দরজা ঠেলে ঢুকে রিভলভার বের করলেন। শুভ্রাংশু সোম ওরফে রঞ্জন রায়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। একটু নড়লেই ঠ্যাং ভেঙে দেব। আমার পেছনে পুলিশ আছে।

মেয়েটি দরজা দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নরেশ ধরের গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। ফান্দে পড়ছ খুকি! হাঃ হাঃ হাঃ! খুব যে সেন্ট মাখছ দেখি! এইটুকখানি বডিতে কয় গ্যালন সেন্ট্ ঢালছ? না—না! কান্দে না! অ জগদীশ! মাইয়াডারে লইয়া যাও!

নরেশ ধর ভেতরে ঢুকে আসামির জামার কলার ধরলেন। কর্নেল তার প্যান্টের পকেট হাতড়ে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে বললেন, রঙ্গনাথনের উপহার মনে হচ্ছে!

রিভলভারের বুলেটকেস খুলে কর্নেল দেখলেন তিনটে গুলি আছে। বাকি তিনটে যথাক্রমে মধুমিতা, রঙ্গনাথন এবং ডাঃ মুখার্জির মাথার ভেতর ঢুকেছে।

সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। রঞ্জনের ছবিটা 'ওয়ান্টেড' শিরোনামে আর ছাপার দরকার হয়নি। তাকে গ্রেফতারের খবর ছোট করে ছাপা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর। দৈনিক সত্যসেবক অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে বিখ্যাত রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কৃতিত্ব উল্লেখ করেছে। গত রাতে ওদের রিপোর্টার ফোন করেছিল। কর্নেল বলেছিলেন, 'নো কমেন্ট।' সেই রিপোর্টারের অভিমানী কণ্ঠস্বর কানে লেগে আছে। 'জয়ন্তদা হলে স্যার অনেক কমেন্ট করতেন এবং একটা এক্সক্লুসিভ স্টোরিও আমরা পেতাম।'

জয়ন্ত চৌধুরি ফিরবে জুন মাস। বোকা! বোকা! পুরো গরমটা ইওরোপে কাটিয়ে আসা ওর উচিত।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন।

কর্নেল সরকার! আমি শান্তশীল বলছি।

মিঃ দাশগুপ্ত! কাগজে দেখেছেন কি আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়েছে?

দেখেছি। কিন্তু যেজন্য আপনাকে ফোন করলাম, বলি। আমাদের কাজের মেয়ে ললিতা এসেছে। খুব কান্নাকাটি করল। আমি ওকে পুলিশের ভয় দেখালাম। চুপ করল তখন। তারপর আমার জেরার জবাবে যা বলল, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ২৮ মার্চ বিকেল থেকে আমার কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শুভ্রাংশু সোম এখানে ছিল। ললিতা বাড়ি ফেরে ছ'টায়। ললিতা বলল, দুজনে খুব তর্কবিতর্ক

হচ্ছিল। তাছাড়া শুভ্রাংশু প্রায়ই আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে। ললিতা মউয়ের নিষেধ থাকায় আমাকে বলেনি। আই মাস্ট্ ডু সামথিং!

মিঃ দাশগুপ্ত! রঞ্জন রায় আপনার স্ত্রীর খুনী।

'হ্যাঁ, কাগজে তা তো দেখলাম।

রঞ্জন রায় এবং শুভ্রাংশু সোম একই লোক।

হো-য়া-ট?

'ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' মিঃ দাশগুপ্ত! আপনি মধুমিতা দেবীর মুখে দৈবাৎ শুনেছিলেন, 'তোমার এই জেকিল অ্যান্ড হাইড গেমটা'—যাই হোক, সে আমার হেল্প নিতে গিয়েছিল। আপনার ওপর যাতে সন্দেহ জাগে এবং সে সেফসাইডে থাকে। অনেক কেসে এভাবে অপরাধীরাই সাধু সাজার জন্য আমার দ্বারস্থ হয়।

মাই গড!

ফিল্মমেকার হিসেবে শুভ্রাংশু 'রঞ্জন রায়' ছদ্মনাম নিয়েছিল। দুরকম পেশার জন্য দুটো নাম! বাই দা বাই, ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জির সঙ্গে তার পরিচয় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। শুভ্রাংশু স্বীকার করেছে, তাঁর মেয়ে টিনাকে দেখার পর সে ডাঃ মুখার্জিকে তার ফিল্মি নামটা জানিয়েছিল। টিনাকে ফিল্মে অভিনয়ের সুযোগ দেবে বলেছিল। তাই ডাঃ মুখার্জি শুভ্রাংশুকে রঞ্জন রায় বলেই স্ত্রীর এবং মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। টিনা ইজ এ প্রবলেম-চাইল্ড। টিনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাই ভেবেছিলেন, ফিল্মকেরিয়ার টিনার পক্ষে ভালই হবে।

কিন্তু শুভ্রাংশু ডাঃ মুখার্জিকে মারল কেন?

একমাত্র তিনিই জানতেন শুভ্রাংশুর আর এক নাম রঞ্জন রায়। তাই শুভ্রাংশু যখন জানল, রঞ্জন রায়ই দু-দুটো খুন করেছে বলে পুলিশ তাকে খুঁজছে, তখন ডাঃ মুখার্জির মুখ বন্ধ করতে তাঁকেও মারল। সে ভেবেছিল, ডেডস ডু নট স্পিক।

লাইন কেটে গেল। কর্নেল বুঝলেন, জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের নবীন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শান্তশীল দাশগুপ্ত আবার এতক্ষণে 'ইয়াপ্পি' হয়ে গেল। মৃতদের কথা শুনতে তার আর আগ্রহ থাকার কথা নয়। তার কাছে যারা মৃত, তারা মৃতই এবং মৃতেরা কথা বলে না।...